তাহরীকে দারুল উলূম দেওবন্দ

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান

[প্রশ্নোত্তর সংকলন]

বেফাকুল মাদারিস-কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড-এর বিগত ১৬ বছরের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্বলিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর লাভে সহায়ক ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাস সম্বলিত অনন্য গ্রন্থ

তাহরীকে দারুল উলূম দেওবন্দ

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদান

[প্রশ্নোত্তর সংকলন]

সংযোজিত আরও একটি পুস্তিকা

বিদেশী ও দেশী ফেরাকে বাতেলাহ

সংকলন ও সংগ্রহ

মাওলানা রাশেদুল হক সিরাজী

মুহাদ্দিস নড়াইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা

ডেমরা, ঢাকা.

সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট

১১,বাংলাবাজার ৫০,বাংলাবাজার ঢাকা

মোবা. ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

প্রকাশক
মুহাম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স
বাসা নং : ২১৭, ব্লক : ত
মীরপুর–১২, পল্লবী, ঢাকা।

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
জুন-২০১০ ঈ.
রজব ১৪৩১ হিজরী
দ্বিতীয় প্রকাশ

বর্ণ বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

মূল্য
২৫০ টাকা মাত্র

https://t.me/islaMic_fdf

মুদ্রণ
ধলেশ্বরী প্রিন্টার্স সূত্রাপুর ঢাকা

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
(বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর মাননীয় মহাসচিব

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার জাহানাবাদী সাহেবের মূল্যবান বাণী

নবীন আলেম মুহাম্মদ রাশিদুল হক কর্তৃক সংকলিত তাহরীকে দারুল উলূম দেওবন্দ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান (প্রশ্নোত্তর সংকলন) পুস্তকটির বেশ কিছু জায়গা আমি দেখেছি। প্রয়োজনীয় কিছু স্থানে সংশধোনও করে দিয়েছি। নবীন প্রজন্মের সামনে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার সাথে সাথে কারো কারো বিভ্রান্তি দূর করার জন্য **'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ' এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এ দু'টির সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে** আমার লেখা প্রবন্ধটি বক্ষমান পুস্তকের সাথে (পৃষ্ঠা -১৬৭) ছাপার অনুমতি প্রদান করছি।

ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য পুস্তকটি নবীন-প্রবীণ সকলের কাজে আসবে বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া বইটি বেফাক ভুক্ত ফযীলত জামাআতের ইতিহাস বিষয়ের সহায়ক পুস্তক হিসেবে বেশ কার্যকর হবে বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা পুস্তকটিকে পাঠক সমাজে সমাদৃত করুন এবং সংকলকের এ শ্রম ও খেদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার
মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ
(বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)

সম্পাদকীয়

পূর্বসূরীদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে নিজের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা সহজ হয়। ইতিহাসের উপাদান থেকে জন্ম লাভ করে জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণা এবং এগিয়ে চলার দীপ্ত অঙ্গীকার। অবিকৃত সত্য ইতিহাস পাঠ, উপলব্ধি এবং তাতে অবগাহনের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই বাস্তব যে, দেশীয় ভাষায় মুসলিম ইতিসাহের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ নয়। বিশেষ করে ভারত-উপমহাদেশে মুসলমানদের কর্ম ও অবদানের বিষয়টি তো একেবারেই ডুমুরের ফুল। সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী-বৈষম্য দূরীকরণে আলেম-ওলামা ও সূফী-সাধকদের অবদান, রাষ্ট্রপরিচালনায় মুসলিম শাসকদের দীর্ঘ ইতিহাস, বৃটিশবিরোধী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ওলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা, স্বাধীনতা উত্তর রাষ্ট্রে ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সুশীল সমাজ বিনির্মাণে তাঁদের অবদান ও ইলমী খেদমতসহ আরো অনেক বিষয় যেন তিমিরেই রয়ে গেছে।

কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ বিষয়টি উপলব্ধি করে "তাহরীকে দারুল উলূম দেওবন্দ' শিরোনামে ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়টি ফযীলত শ্রেণীর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে এবং কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় এর পূর্ণমান নির্ধারণ করা হয় একশ।

উক্ত বিষয়ের পাঠদানকারী শিক্ষকগণ আকাবেরে উম্মত কর্তৃক রচিত ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে তা দরসে তালিবুল ইলমদের সামনে পেশ করতেন। বহুদিন পর মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াইয়া **'দারুল উলূম দেওবন্দ, ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান** নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। যা ফযীলত শ্রেণীর **'তাহরীকে দারুল উলূম দেওবন্দ'** বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহিত হয়।

এ বিষয়ে ছাত্রদের দুর্বলতা এবং পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কিছুটা সমস্যা অনুভূত হয়ে আসছিল বেশ পূর্ব থেকেই। তাই সাধারণ ছাত্রদের কথা চিন্তা করে প্রশ্নোত্তর আকারে একটি পুস্তিকা বিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ করি এবং এ কাজটি করার জন্য দায়িত্ব দেই স্নেহাস্পদ মাওলানা রাশেদুল হককে। তিনি বেফাকের প্রশ্নপত্র এবং উক্ত পুস্তকের আলোচনাকে সামনে রেখে প্রশ্নমালা এবং তার উত্তর বিন্যাস করেন।

ফলে কিছু প্রশ্নে হুবহু বেফাকের প্রশ্নের সাথে মিল রয়েছে আর বাকিগুলোর মধ্যে সঙ্গত কারণেই রয়েছে ব্যাপকতা। একজন তালিবুল ইলম এ পুস্তিকাটির প্রশ্নোত্তর উত্তমরূপে আয়ত্ত করলে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার প্রশ্ন যে ধারারই হোক, সে সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি।

কওমী মাদরাসায় পড়ুয়া ছাত্রদের পাশাপাশি সবধরনের পাঠকের জন্য পুস্তিকাটি হতে পারে ভারতবর্ষের সঠিক ইতিহাস তথা দেওবন্দ ও দেওবন্দিয়ত সম্পর্কে জানার অন্যতম মাধ্যম। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই পুস্তিকাটিতে মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া অস্বভাবিক নয়। সুহৃদ পাঠক তা অবগত করলে আগামী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা পুস্তিকাটিকে কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

বিনীত

সম্পাদক

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচার

প্রশ্ন : ১ : সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা কর। ---------------------২৩

হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন ------------------------------------২৪

হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের আগমন -------২৪

হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন ------------------------------------২৪

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে মুসলমানদের আগমন -------২৫

উমাইয়া খলীফাদের শাসনামল ------------------------------------ ২৫

আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামল ------------------------------------২৫

প্রশ্ন : ২ : মুসলমানদের পূর্বে ভারতবর্ষে আগমনকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। --২৬

আর্য হিন্দুদের আগমন --২৬

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আগমন ---২৬

হিন্দু ব্রাহ্মণদের আগমন --২৬

যোগীবাদের আগমন --২৬

এ সকল সম্প্রদায়ের আগমনের ফলে ভারতের অবস্থা ----------------২৭

মুসলমানদের আগমন ---২৭

প্রশ্ন : ৩ : হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর খেলাফতকালে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ------------------------------------২৭

প্রশ্ন : ৪ : সতের বছরের তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ভারতঅভিযান ও তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর। -----------২৮

অভিযানের পটভূমি ---২৮

ভারত অভিমুখে অভিযান ও তার ফলাফল --------------------------২৯

প্রশ্ন : ৫ : গজনি ও ঘোর বংশের ভারত শাসন সম্পর্কে
আলোকপাত কর ---৩০
গজনি বংশের ভারত শাসন -----------------------------------৩০
গজনি বংশের শাসন ---৩০
ঘোর বংশের ভারত শাসন ------------------------------------৩১
প্রশ্ন : ৬ : দাস বংশ ও খিলজী বংশের ভারতবর্ষ শাসন সম্পর্কে
আলোকপাত কর। ---৩২
প্রশ্ন : ৭ : খলজী বংশের ভারতবর্ষ শাসন সম্পর্কে যা জান লিখ। -------৩৪
খিলজী বংশের শাসন --৩৪
প্রশ্ন : ৮ : তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশের ভারত শাসন
সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ---৩৬
তুঘলক বংশের ভারত শাসন ----------------------------------৩৬
সৈয়দ বংশের ভারত শাসন ------------------------------------৩৭
লোদী বংশের ভারত শাসন ------------------------------------৩৮
প্রশ্ন : ৯ : ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল মুসলিম বংশ ভরত
শাসন করে তাদের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ কর। ------৩৯
উমাইয়া বংশের ভারত শাসন (৭১১/১২-৭৫০) খ্রিঃ -----------------৩৯
আব্বাসীয় বংশের ভারত শাসন (৭৫৪-৮৭১ খ্রি.) ------------------৪০
গজনি বংশের ভারত শাসন (৯৬২-১০২৭ খ্রি.) --------------------৪০
ঘোর বংশের ভারত শাসন (১১৭৩-১২০৬ খ্রি.) --------------------৪০
দাস বংশের ভারত শাসন (১২০৬-১২৯০ খ্রি.) --------------------৪১
খিলজী বংশের ভারত শাসন (১২৯০-১৩২০ খ্রি.) ------------------৪১
তুঘলক বংশের ভারত শাসন (১৩২০-১৪১৪ খ্রি.) -----------------৪১
সৈয়দ বংশের ভারত শাসন (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি.) -------------------৪২
লোদী বংশের ভারত শাসন (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.) -------------------৪২
মোঘল বংশের ভারত শাসন (১৫২৬-১৮০৩ খ্রি.) ------------------৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

প্রশ্ন : ১০ : সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস এবং তার
শাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত কর। --------------------------৪৩
সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী -------------------------------৪৩
জন্ম ও পরিচয় ---৪৩
প্রাথমিক জীবন ও অভিভাবকের প্রতি অনিহা ----------------------৪৩
প্রচলিত শিক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞান সল্পতা ও মৃত্যু ------------------------৪৪

আকবরের শাসনব্যবস্থা

(১) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ---------------------------------------৪৪
(২) প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ---------------------------------------৪৪
রাজস্ব নীতি ---------------------------------------৪৪
রাজপুতনীতি ও বৈবাহিক সম্পর্ক ---------------------------------------৪৫
মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন ---------------------------------------৪৫
রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি ও বিদ্রোহ দমন নীতি ---------------------------------------৪৫

প্রশ্ন : ১১ : সম্রাট আকবরের জন্ম ও তার ক্ষমতায় আরোহণ
সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ---------------------------------------৪৬
জন্ম ও পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন ---------------------------------------৪৬
অভিভাবকত্বের প্রতি আকবরের অনীহা ---------------------------------------৪৬

প্রশ্ন : ১২ : সম্রাট আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ও তা পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর। দ্বীনে ইলাহীর রীতিনীতি ও তার
অসারতা প্রমাণ কর। ---------------------------------------৪৬
আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ও তার পরিবর্তন ---------------------------------------৪৭
দ্বীনে ইলাহীর রীতিনীতি ও তার অসারতা ---------------------------------------৪৭
দ্বীনে ইলাহীর অসারতা ---------------------------------------৪৮

প্রশ্ন : ১৩ : সম্রাট আকবরের মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন, বিদ্রোহ দমন ও তার প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস আলোচনা কর। ---------------------------------------৪৮
মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন ---------------------------------------৪৮
সাম্রাজ্য বিস্তার ও বিদ্রোহ দমন ---------------------------------------৪৯
আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ---------------------------------------৪৯

প্রশ্ন : ১৪ : আকবরের ধর্মনীতির পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর। ----৪৯
আকবরের ধর্মনীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট ---------------------------------------৪৯

প্রশ্ন : ১৫ : দ্বীনে ইলাহী সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ। ---------------------------------------৫০

মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর
জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ১৬ : হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে তাঁর পদক্ষেপগুলোর উপর আলোকপাত কর। ---------------------------------------৫১
জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষা জীবন, তাসাউফ চর্চা ---------------------------------------৫১
কর্ম জীবন ও ইন্তেকাল ---------------------------------------৫২
দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে
মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর পদক্ষেপসমূহ ---------------------------------------৫২

প্রশ্ন : ১৭ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর জন্মলগ্নে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ----------------------৫৪
মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর জন্মলগ্নে ভারতের অবস্থা -----------৫৪
প্রশ্ন : ১৮ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-কে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল কেন? তার মুক্তি লাভের ঘটনা এবং মুক্তি লাভের পর ইসলামের কল্যাণে যেসব বিষয় আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনি সম্রাটের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন, সেগুলো উল্লেখ করে তার ফলাফল আলোচনা কর। ---------------৫৫
মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-কে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্তিদানের কারণ ---৫৫
ফলাফল ---৫৬
প্রশ্ন : ১৯ : বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদে এবং সুফিবাদের সংস্কারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর অবদান সম্পর্কে যা জান লিখ। ---৫৭
বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদে হযরতের গৃহিত কর্মসূচি --------------৫৭
সূফীবাদ সংস্করণে হযরতের গৃহিত কর্মসূচিসমূহ --------------------৫৮
১. তরীকতের উপর শরী'আতের গুরুত্বদান -------------------------৫৮
২. "ওয়াহ্দাতুল উজূদ"-এর অপব্যাখ্যার বিপরীতে "ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ"-এর প্রচারণা --------------------------------------৫৯
প্রশ্ন : ২০ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা ও তার ফলাফল বিস্তারিত আলোচনা কর। ---------------৫৯
আধ্যাত্মবাদীদের মতাদর্শ --৫৯
আন্দোলনের রূপরেখা ---৬০
(১) নববী আদর্শের অনুসরণ ছাড়া মা'রিফাত মূল্যহীন ----------------৬০
(২) শরী'অতের প্রতি গুরুত্ব দান ---------------------------------৬০
(৩) মা'রিফতের গুরুত্ব শরী'অতে কতটুকু --------------------------৬০
(৪) মা'রিফাত শরী'অতের একাংশের পরিপূরক ---------------------৬০
(৫) ওয়াহ্দাতুল উজূদের অপব্যাখ্যার বিপরীতে ওয়াহ্দাতুশ শুহূদের প্রচারণা ------------------------------------৬১
সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল -------------------------------------৬১

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ২১ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর পরিচয় কি? তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ধারাগুলো কি ছিল? বিস্তারিত আলোকপাত কর। -----৬১
জন্ম ও বংশ পরিচয় --৬১
শিক্ষা ও কর্মজীবন --৬২

হেজায সফর ও তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি ----------------৬২
রচনাবলী ও ইন্তেকাল --৬৩
শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর সংস্কার আন্দোলনের ধারাসমূহ -----------৬৩
১. কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ------------------৬৩
২. শিক্ষানীতির সংস্কার ---------------------------------------৬৩
৩. মুসলিম জাতির আকীদা সংশোধন ও
কুরআন মাজীদের প্রতি আহ্বান ---------------------------------৬৪
৪. হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার-প্রসার -------------------------৬৪
৫. যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন মজীদের
দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন এবং সুন্নতে নববীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা --------------৬৪
৬. ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ও তার সভ্যতা প্রমাণ
এবং বিরুদ্ধবাদীদের সমুচিত জবাব -----------------------------৬৪
৭. শ্রমজীবিদের উপর থেকে অত্যাধিক চাপ রহিত করা
এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন -------------------------৬৪
৮. উম্মাতে মুহাম্মাদীর সর্বস্তরের জনগণের প্রতি সংশোধনের আহ্বান ---৬৪
৯. শিক্ষা ও তারবিয়তের মাধ্যমে যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করা --------৬৫
১০. সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের
কবল থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা --------------------------৬৫
**প্রশ্ন : ২২ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁর
রাজনীতিতে যোগদানের কারণ বর্ণনা কর।** ------------------------৬৫
রাজনীতিতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর যোগদানের কারণ ----------৬৫
শাহ সাহেবের রাজনীতিতে যোগদানের কারণসমূহ ------------------৬৬
(ক) আমীর-উমারাদের মাঝে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা ----------৬৬
(খ) মুসলমানদের জন্য দুটি ভয়ঙ্কর আন্দোলন ----------------------৬৬
(গ) রাজপুত ও জাঠদের বিদ্রোহ ---------------------------------৬৬
(ঘ) শিখ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ------------------------------------৬৬
(ঙ) শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্ব --৬৭
(চ) ইরানদের লুণ্ঠন ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ ---------------৬৭
(ছ) ইংরেজদের বিহার ও বাংলায় আধিক্য বিস্তার -------------------৬৭
(জ) অর্থনৈতিক দুরবস্থা --৬৭
(ঝ) হিন্দু-মুসলিম আত্মঘাতী সংঘর্ষ -----------------------------৬৭
(ঞ) ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ -----------------৬৮
**প্রশ্ন : ২৩ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর রাজনৈতিক কার্যক্রম
সম্পর্কে যা জান লিখ।** ---------------------------------------৬৮
শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর রাজনৈতিক কার্যক্রম -------------------৬৯

(এক) পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম ----------------৬৯
ক. ইসলামী শরী'আর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান ----------------৬৯
খ. তাসাউফের শিক্ষাদান ----------------৬৯
গ. ওয়াজ-নসীহত ও গ্রন্থ প্রণয়ন ----------------৬৯
(দুই) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম ----------------৬৯
(ক) মোঘল সম্রাটদের নিকট পত্র প্রেরণ ----------------৬৯
খ. আহমদ শাহ আবদালীকে দিল্লীতে আনয়ন ----------------৭০
গ. জিহাদের প্রশিক্ষণ দান ----------------৭০
ঘ. মজবুত সংগঠন ----------------৭০
প্রশ্ন : ২৪ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত কর। ----------------৭১
শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর আন্দোলনের ফলাফল ----------------৭১

ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের আগমন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎপরতা

প্রশ্ন : ২৫ : ভারতবর্ষে আরবদের আগমন ও ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে জান লিখ। ----------------৭১
ভারতবর্ষে আরবদের আগমন ----------------৭১
আরবদের আগমনে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রভাব ----------------৭২
আরবদের সম্পর্কে কয়েক জনের অভিমত ----------------৭২
প্রশ্ন : ২৬ : ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের আগমন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক তৎপরতার বিবরণ দাও। ----------------৭২
আরবদের আগমন ----------------৭২
তুর্কীদের আগমন ----------------৭৩
পর্তুগীজদের আগমন ----------------৭৩
ওলন্দাজদের আগমন ----------------৭৩
দিনেমারদের আগমন ----------------৭৩
ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ----------------৭৩
বৃটেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ----------------৭৪
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়িক তৎপরতা ----------------৭৪
বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন ও সরকারের অনুমোদন লাভ ----------------৭৪
প্রশ্ন : ২৭ : ভারতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসি বণিকদের আগমন ও তাদের তৎপরতার বিবরণ দাও। ----------------৭৫
পর্তুগীজদের আগমন ও তৎপরতা ----------------৭৫
ওলন্দাজদের আগমন ও তৎপরতা ----------------৭৫

দিনেমারদের আগমন ও তৎপরতা ----------------------------------৭৫
ফরাসি বণিকদের আগমন ও তৎপরতা ----------------------------৭৬
প্রশ্ন : ২৮ : ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও তার ফলাফল সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ। ------------------------৭৬
ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি --------------------------------------৭৬
রাজনৈতিক তৎপরতার বিবরণ -------------------------------------৭৭
এক. পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার ক্ষমতা দখল -------------------------৭৭
দুই. সাম্রাজ্য বিস্তার --৭৭
ক. পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার নীতি ------------------------৭৭
খ. অধীনতামুক্ত মিত্রতা নীতি --------------------------------------৭৭
গ. পররাজ্য দখল নীতি ---৭৮
তিন. শাসন-শোষণ সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা --------------------------৭৮
ফলাফল --৭৮

শাহ্ আব্দুল আযীয রহ.-এর জীবন-কর্ম ও অবদান

প্রশ্ন : ২৯ : শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-কর্ম, তাঁর ঐতিহাসিক 'দারুল হরব' ফাতওয়া প্রদান ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা দাও। --৭৯
শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ------------------------৭৯
জন্ম, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন ------------------------------------৭৯
রচনাবলী ও ইন্তেকাল --৮০
ঐতিহাসিক দারুল হরব ফাতওয়া ----------------------------------৮০
ফাতওয়ার প্রতিক্রিয়া --৮০
প্রশ্ন : ৩০ : কে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন? 'দারুল হরব ঘোষণার প্রেক্ষাপট বিস্তারিত আলোচনা কর! --------------------৮১
দারুল হরবের ঘোষক ---৮১
দারুল হরব ঘোষণার প্রেক্ষাপট ------------------------------------৮১
(১) ইংরেজদের এ দেশে আগমন ----------------------------------৮১
(২) ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ------------------------------৮১
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখল -------------------------------------৮১
মীর কাশিমের বিদ্রোহ ঘোষণা -------------------------------------৮২
ফতেহ আলী টিপুর শাহাদত ---------------------------------------৮২
দিল্লীর ক্ষমতা দখল --৮২
ইংরেজদের অমানবিক নির্যাতন -----------------------------------৮২
ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা ------------------------------------৮২

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩১ : সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-কে ছিলেন? তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যা জান লিখ। ---------------------------৮৩
জন্ম ও পরিচয়, শিক্ষাজীবন ও সামরিক প্রশিক্ষণ ---------------------৮৩
ইন্তেকাল ---৮৪
তাঁর কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ---------------------------------৮৪
(১) দাওয়াত ও ইসলাহী তৎপরতা ----------------------------------৮৪
(২) জিহাদী চেতনা সৃষ্টি ও মুজাহিদ সংগ্রহ ---------------------------৮৪
(৩) সংস্কারমূলক কার্যক্রম ---৮৫
(৪) জিহাদের ময়দানে সশস্ত্র তৎপরতা -------------------------------৮৫
ফলাফল --৮৬

প্রশ্ন : ৩২ : সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর পেশোয়ার আক্রমণ এবং সুলতান মুহাম্মদ খানের আত্মসমর্পণ ও তার হাতে পেশোয়ার সমর্পণের বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। ---------------------৮৬
পেশোয়ার আক্রমণ ---৮৬
সুলতান মুহাম্মদ খানের আত্মসমর্পণ ও তার হাতে পেশোয়ার সমর্পণ ---------------------------------------৮৭

প্রশ্ন : ৩৩ : সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর পরিচয় কি? তাঁর কর্মতৎপরতা আলোকপাত কর। ---------------------------------৮৮
জন্ম ও পরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা ও সমরবিদ্যা ---------------------------৮৮
সংস্কারমূলক কার্যক্রম --৮৮
বিদ'আতীদের অপবাদ ও তার খণ্ডন ---------------------------------৮৮
পাঞ্জাব সফর ---৮৯
বালাকোট ও মুজাফফরাবাদে শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহ. ----------------৮৯
শাহাদাত --৮৯

প্রশ্ন : ৩৪ : বালাকোট ময়দানে মাওলানা ইসমাঈলের অবস্থা ও মুজাফফরাবাদ অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা দাও! -------------------------৯০
এক গ্রামের অধিবাসীদের পরামর্শ দান -------------------------------৯০
বালাকোট ময়দানে যেভাবে পৌঁছলেন --------------------------------৯০
যবরদস্ত খানের আবদার --৯০
মুজাফফরাবাদ অভিযানে মাওলানা খায়রুদ্দীনের দ্বিমত -----------------৯০
মুজাফফরাবাদের দিকে রওনা -------------------------------------৯১
যবরদস্ত খানের বিশ্বাসঘাতকতা ------------------------------------৯১
অঙ্গীকার পূরণে যবরদস্ত খানের গড়িমশি -----------------------------৯১

শের সিং-এর আগমন ও যবরদস্ত খানের হা-হুতাশ ------------------৯১
মাওলানা খায়রুদ্দীনের প্রস্তাব ও যবরদস্ত খানের ভিন্নপথে গমন ------৯১

হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩৫ : হাজী শরী'অতুল্লাহ কে ছিলেন? তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ------------------------------৯২
জন্ম ও বংশ পরিচয় ও শিক্ষাজীবন ------------------------------৯২
কর্মজীবন ও ইন্তেকাল ------------------------------৯৩
হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ.-এর আন্দোলনের বিবরণ ------------------৯৩
ফরায়েজী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ------------------------৯৩
১. ইসলামী ধারায় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা ------------------৯৩
২. পরধীনতার অক্টোপাস ছিন্ন করে স্বাধীনতার মন্ত্রে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করা ------------------------------৯৪
ফলাফল --৯৪

পীর দুদু মিয়া রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩৬ : দুদু মিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা কর। ------------------------------৯৫
জন্ম ও পরিচয় ও শিক্ষাজীবন ------------------------------৯৫
জীহাদী চেতনা ও ইন্তেকাল ------------------------------৯৫
দুদু মিয়ার কর্মতৎপরতা ------------------------------৯৫
১. অর্থনৈতিক তৎপরতা ------------------------------৯৬
২. রাজনৈতিক তৎপরতা ------------------------------৯৬
ফলাফল --৯৬

নিসার আলী ওরফে তিতুমীর রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩৭ : নিসার আলী কে ছিলেন? তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। ------------------------------৯৭
নাম ও বংশ পরিচয় ------------------------------৯৭
হজ্জ সফর ও ধর্মীয় শিক্ষা ------------------------------৯৭
জিহাদের দীক্ষা লাভ ------------------------------৯৭
তিতুমীরের আন্দোলনের কর্মসূচি ------------------------------৯৭
এক. মুসলিম সমাজ থেকে হিন্দুয়ানী প্রথার বিলুপ্ত সাধন এবং মুসলমানদেরকে দ্বীন পালনের প্রতি আহ্বান ------------------৯৮

দুই. জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করণ ---৯৮
তিন. ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ --৯৮

সিপাহী বিপ্লব, তার ফলাফল ও বিপ্লবোত্তর মুসলমানদের অবস্থা

প্রশ্ন : ৩৮ : সিপাহী বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর উপমাহদেশের মুসলিম সমাজ ও উলামায়ে কিরামের অবস্থা আলোচনা কর। --------------৯৯
সিপাহী বিপ্লবের কারণসমূহ ---৯৯
রাজনৈতিক কারণ ও অর্থনৈতিক কারণ ---------------------------------৯৯
ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক কারণ ---------------------------------১০০
সামরিক কারণ ---১০০
বিপ্লব সৃষ্টিতে উলামায়ে কিরামের অবদান ----------------------------১০০
ফলাফল --১০০
বিপ্লবোত্তর উপমহাদেশে মুসলিম সমাজ ও
উলামায়ে কিরামের অবস্থা ---১০০
ক. মুসলিম সমাজের অবস্থা ---১০১
খ. উলামা কিরামের অবস্থা ---১০১
প্রশ্ন : ৩৯ : সিপাহী বিপ্লব ও তার ফলাফল বর্ণনা কর -------------------১০২
সিপাহী বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ---১০২
ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লব ও ফলাফল --------------------------------১০৩

ইংরেজদের আগ্রাসনের ফলে মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতি ও সমস্যার বিবরণ

প্রশ্ন : ৪০ : ইংরেজদের আগ্রাসনের ফলে মুসলমানরা যে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ। -----------------১০৪
১. রাজনৈতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন ----------------------------------১০৪
ক. আলেম সমাজের উপর নির্যাতন নিম্নরূপ --------------------------১০৫
খ. সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন -----------------------------১০৫
২. অর্থনৈতিক আগ্রাসন ---১০৬
৩. শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আগ্রাসন -------------------------------১০৬
৪. সামাজিক আগ্রাসন --১০৭
প্রশ্ন : ৪১ : ভারতে বৃটিশ সরকার ও ইংরেজদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে আলোচনা কর। ------------------------------১০৮
(১) ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন ------------------------------------১০৮
(২) ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা ------------------------------------১০৯
(৩) মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা ---------------------১০৯

(৪) পারস্পরিক আত্মকলহ সৃষ্টি এবং হকপন্থীদের
অবদমিত করার পায়তারা ----------------------------১০৯

তৃতীয় অধ্যায়
দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

প্রশ্ন : ৪২ : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। --১১০
(ক) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ----------------------------১১০
(খ) অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ----------------------------১১১
(গ) সামজিক প্রেক্ষাপট ----------------------------১১২
(ঘ) ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ----------------------------১১২

প্রশ্ন : ৪৩ : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সূচনা কিভাবে হয় এবং কখন কোথায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রতিষ্ঠাতা ছয় মহাপুরুষগণ কারা? বিস্তারিত আলোচনা কর। ----------------------------১১৩
যেভাবে শুরু হয় দারুল উলূম দেওবন্দের পদযাত্রা ----------------------------১১৩
কখন কোথায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় ----------------------------১১৪
আকাবিরে সিত্তাহ তথা ছয় মহাপুরুষ ----------------------------১১৫

প্রশ্ন : ৪৪ : দারুল উলূম দেওবন্দ কখন কোথায় ও কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ----------------------------১১৫
দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ----------------------------১১৫

প্রশ্ন : ৪৫ : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত কর। ------১১৮
দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ----------------------------১১৯
(এক) মারকাযিয়্যাত ----------------------------১১৯
(দুই) মাসলাকে ই'তিদাল ----------------------------১১৯

প্রশ্ন : ৪৬ : নেজামে তা'লীম ও নেসাবে তা'লীমের ইতিহাস সম্পর্কে লিখ। ----------------------------১২০
সাহাবা কিরামের যুগ ----------------------------১২০
পাঠ্যসূচি ----------------------------১২০
শিক্ষাব্যবস্থা ----------------------------১২১
(ক) মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ----------------------------১২১
(খ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ----------------------------১২১
উমাইয়া খেলাফত যুগ ----------------------------১২১
নেসাবে তা'লীম ----------------------------১২১
নেজামে তা'লীম ----------------------------১২১
আব্বাসীয় যুগ ----------------------------১২২

নেসাবে তা'লীম --১২২
নেযামে তা'লীম --১২২
মোঘল শাসন-পূর্ব ভারত উপমহাদেশের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা ------১২২
পাঠ্যসূচি --১২২
নেযামে তা'লীম --১২২
শিক্ষা ব্যবস্থা --১২৩
দারুল দেওবন্দের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ ------------১২৩

প্রশ্ন : ৪৭ : দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত কর। ----------------------------------১২৩
পাঠ্যসূচি --১২৪
(১) পাঠ্যসূচিতে ব্যাপকতা সাধন ----------------------------------১২৪
(২) দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি -------------------------------১২৪
(৩) হকপন্থী মতাদর্শগুলোর সমন্বয়সাধন ও স্বীকৃতিদান ---------------১২৫
পাঠ্যসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য --১২৫
শিক্ষাব্যবস্থা --১২৫

প্রশ্ন : ৪৮ : উসূলে হাশতেগানা বলতে কি বুঝ? এর রচরিতা কে? দারুল উলূম দেওবন্দ পরিচালনার মূলনীতিগুলো কি কি বর্ণনা কর। ---১২৬
উসূলে হাশতেগানাহ বা আটটি মূলনীতি ------------------------------১২৬
উসূলে হাশতেগানাহ-র রচয়িতা -------------------------------------১২৬
উসূলে হাশতেগানাহ বা মূলনীতি অষ্টক ----------------------------১২৭

চতুর্থ অধ্যায়
উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

প্রশ্ন : ৪৯ : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান কি ছিল? বর্ণনা কর। ----------------------------------১২৮
অভিনব শিক্ষাধারা প্রবর্তন ---১২৮
যুগসম্মত সিলেবাস প্রবর্তন ---১২৯
শিক্ষা সম্প্রসারণ --১২৯
সংস্কৃতি বিকাশ এবং তার লালন ----------------------------------১২৯

প্রশ্ন : ৫০ : ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান কি? ---১৩০
ক. হাদীস শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ------------------------১৩০
তাঁদের রচিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ ---------------------------------১৩০
টীকা ও তথ্য গ্রন্থ --১৩১
খ. তাফসীর শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ---------------------১৩১

গ. ফিক্‌হ শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান --------------------১৩১
ফিকহ ও ফাতওয়া --১৩২
ঘ. দর্শন ও আকাইদ শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ------------১৩২
ঙ. সীরাত ও ইতিহাস শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান -----------১৩২
চ. তাসাউফ ও মনোস্তত্বে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান -------------১৩৩
ছ. ভাষা ও সাহিত্যে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান
আরবী ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান -----------------------১৩৩
ফার্সি ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান -----------------------১৩৪
উর্দূ ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান -------------------------১৩৪
বাংলা ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান -----------------------১৩৪

প্রশ্ন : ৫১ : উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে লিখ। ---১৩৪

উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক অবদান --------------------------১৩৪
উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন
রাজনীতিবিদ আলেমের রাজনৈতিক অবদান -----------------------১৩৫
হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.
এর রাজনৈতিক অবদান --১৩৫
(১) সাংগঠনিক তৎপরতা ---------------------------------------১৩৫
(২) আন্দোলনের কেন্দ্র নির্ধারণ -----------------------------------১৩৬
(৩) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও আযাদ হিন্দ মিশন গঠন ------------১৩৬
(৪) রেশমী রুমাল আন্দোলন ------------------------------------১৩৬
হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক অবদান -----------------------১৩৬
রাজনীতিতে হযরত মাদানী রহ.-এর পদার্পণ ---------------------১৩৬
করাচীর খিলাফত কনফারেন্স ও কারাবন্দি হযরত মাদানী রহ. -------১৩৭
কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন ------------১৩৭
মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী ঐক্য -----------------------------১৩৭
দিল্লীতে হযরত মাদানী রহ.-এর বক্তৃতা ও বিভ্রান্তি ------------------১৩৭
হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও পাকিস্তানের প্রস্তাব -------------------------১৩৭
বৃটিশদের নমনীয়তা ও পাকিস্তানের ঘোষণা -----------------------১৩৮
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হযরত মাদানী রহ. এর কর্ম তৎপরতা -------১৩৮
কাদীয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন -------------১৩৮
মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে
উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলন ---------------------------------১৩৯
নেজামে ইসলাম পার্টির আত্মপ্রকাশ -----------------------------১৩৯

প্রশ্ন : ৫২ : শাইখুল হিন্দ রহ.-এর পরিচয় কি? তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ। ---১৩৯
শাইখুল হিন্দের পরিচয়, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন ---১৩৯
ইন্তেকাল ---১৪০
হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর রাজনৈতিক তৎপরতা ---১৪০
রাজনৈতিক ময়দানে শাইখুল হিন্দ রহ. এর আগমন ---১৪০
দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্র এবং আমজনতাকে সংগঠিত করা ---১৪০
সীমান্ত অঞ্চলে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা ---১৪১
বিপ্লবী পরিষদ "আযাদ হিন্দ" গঠন ---১৪১
রেশমী রুমাল আন্দোলন, তুর্কি ও আফগান সরকারের ঐকমত্য ---১৪১
উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ ---১৪১
হিজাযের পথে শাইখুল হিন্দ রহ. ---১৪২
রেশমী রুমাল আন্দোলনের ইতি ---১৪২
হিজাযে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী ও কারামুক্তি ---১৪২
খিলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা ---১৪৩
প্রশ্ন : ৫৩ : শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর "রেশমী রুমাল আন্দোলন"-এর বর্ণনা দাও। ---১৪৩
শায়খুল হিন্দের পরিচয় ---১৪৩
শিক্ষাজীবন ---১৪৩
কর্মজীবন ---১৪৩
ইন্তেকাল ---১৪৩
রেশমী রুমাল আন্দোলন ---১৪৪
প্রশ্ন : ৫৪ : হিজাজে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী এবং তাঁর কারাজীবন ও মুক্তি লাভের পর স্বদেশে প্রত্যবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর। ---১৪৫
হিজাজে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী ---১৪৫
শাইখুল হিন্দ রহ.-এর কারাজীবন ---১৪৫
(ক) শাইখুল হিন্দ রহ.-কে জিজ্ঞাসাবাদ ---১৪৬
(খ) মাল্টায় নির্বাসন ---১৪৬
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শায়খুল হিন্দ খেতাবে ভূষিত করণ ---১৪৬
ইহধাম ত্যগ ---১৪৭
প্রশ্ন : ৫৫ : শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ.-এর পরিচয় কি? তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার বিবরণ দাও। ---১৪৭
জন্ম ও পরিচয় ---১৪৭
শিক্ষাজীবন ---১৪৭

পরিবারের সাথে মদীনা শরীফে হিজরত ও আধ্যাত্মিক সাধনা --------১৪৭
মসজিদে নববীতে দরসে হাদীসের খেদমত ও ভারত প্রত্যাবর্তন ------১৪৮
ইন্তেকাল --১৪৮
হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক তৎপরতা ---------------------১৪৮
হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনীতিতে পদার্পণ ---------------------১৪৮
করাচীর কনফারেন্সের ঘোষণা ও কারাবন্দি মাদানী রহ. ------------১৪৯
কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও অসহযোগ আন্দোলন ------------১৪৯
মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী ঐক্য ---------------------------১৪৯
দিল্লীতে হযরত মাদানী রহ.-এর বক্তৃতা
ও জাতীয়তার প্রশ্নে বিভ্রান্তি ------------------------------------১৫০
হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও পাকিস্তান প্রস্তাব ---------------------------১৫০
বৃটিশদের নমনীয়তা এবং পাকিস্তানের ঘোষণা ----------------------১৫০
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হযরত মাদানী রহ. এর কর্মতৎপরতা --------১৫১

প্রশ্ন : ৫৬ : করাচী খিলাফত কনফারেন্সে হযরত মাদানী রহ.
এর ঘোষণা আলোচনা কর। ----------------------------------১৫১
করাচীর খিলাফত কনফারেন্সে হযরত মাদানী রহ. এর ঘোষণা -------১৫১
মাদানী রহ.-কে বন্দি করণ ------------------------------------১৫১
বন্দিকালীন সময়ে জনগণের অবস্থা ----------------------------১৫২
উকীল বেশে মাদানী রহ. --------------------------------------১৫২
বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে -------------------------------------১৫২
জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ ---------------------------------------১৫২

প্রশ্ন : ৫৭ : জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতার একটি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ কর। ---------------------------------১৫৩
জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট -----------১৫৩
(১) লাহোরে মুচী দরওয়াজায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্স -----------------১৫৩
(২) ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯ সালের নির্বাচন -------------------------১৫৩
(৩) ১৯৭০ সালের নির্বাচন ------------------------------------১৫৩
(৪) ১৯৭৪ সালের নির্বাচন ------------------------------------১৫৪
(৫) কওমী মাদরাসার শিক্ষাবোর্ড গঠন ---------------------------১৫৪

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থেকে
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া --------------------------------১৫৪
বেফাক প্রতিষ্ঠা ---১৫৬
(৬) ১৯৮১ সালের নির্বাচন ------------------------------------১৫৮
(৭) ১৯৯১ সালের নির্বাচন ------------------------------------১৫৮
(৮) জমিয়তের কার্যক্রম ---------------------------------------১৫৮

প্রশ্ন : ৫৮ : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ---------- ১৫৯
ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ---------- ১৫৯
কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন ---------- ১৬০
মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলন - ১৬০
নেযামে ইসলাম পার্টির আত্মপ্রকাশ ---------- ১৬০
জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতা ---------- ১৬১
নেযামে ইসলাম পার্টির তৎপরতার রিপোর্ট ---------- ১৬১
হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন ---------- ১৬১

প্রশ্ন : ৫৯ : উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান সম্পর্কে আলোকপাত কর। ---------- ১৬১
উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক অবদান ---------- ১৬২
উলামায়ে দেওবন্দের অর্থনৈতিক অবদান ---------- ১৬৩

প্রশ্ন : ৬০ : দাওয়াত ও তাবলীগ তথা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের উপর আলোকপাত কর। ---------- ১৬৫
ক. সহীহ তা'লীম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা ---------- ১৬৬
খ. ওয়াজ-নসীহত ও ধর্মীয় সভার আয়োজন ---------- ১৬৭
গ. ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ ---------- ১৬৭
ঘ. দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার ---------- ১৬৭
ঙ. পীর-মুরীদীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ---------- ১৬৭

প্রশ্ন : ৬১ : বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের বর্ণনা দাও। ---------- ১৬৮
ক. শী'আদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ ---------- ১৬৮
খ. খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা ও তার প্রতিরোধ ---------- ১৬৯
গ. হিন্দু আর্য সমাজীদের ফিতনা ---------- ১৭০
ঘ. ইনকারে হাদীসের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ ---------- ১৭০
ঙ. কাদিয়ানী ফিতনা ও তার প্রতিরোধ ---------- ১৭১
চ. বিদ'আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিকার ---------- ১৭২
ছ. পাশ্চাত্যের চিন্তা ধারায় প্রভাবিতদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ও তার মুকাবেলা ---------- ১৭৩

প্রশ্ন : ৬২ : বাংলাদেশে দেওবন্দের অনুসারী উলামায়ে কিরামের অবদানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত কর। ---------- ১৭৫
ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান ---------- ১৭৫
ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদান ---------- ১৭৫

রাজনৈতিক ময়দানে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান ----------১৭৬
বাংলাদেশী উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান -----১৭৭
অর্থনৈতিক অবদান --১৭৭
ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাদের অবদান -----------------------------১৭৮
বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাদের অবদান ----------------------১৭৮

প্রশ্ন : ৬৩ : শী'আ কারা? শী'আ ফিতনা মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের বর্ণনা দাও। ------------------------১৭৮
শী'আদের পরিচয় --১৭৮
শী'আদের বিভ্রান্তিকর আকীদাসমূহ ----------------------------১৭৯
(১) আকীদায়ে ইমামতে ইছনা আশারিয়্যাহ ---------------------১৭৯
(২) আকীদায়ে তাহরীফে কুরআন -----------------------------১৭৯
(৩) আকীদায়ে রুজ'আত -----------------------------------১৮০
(৪) আকীদায়ে ইরতেদাদে শাইখাইন --------------------------১৮০
ভারতবর্ষে শী'আদের প্রভাব --------------------------------১৮২
শী'আদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতা ---------------১৮২

প্রশ্ন : ৬৪ : খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান সম্পর্কে যা জান লিখ। -----------------১৮৩
খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের কৌশল -----১৮৪
ক. মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা ---------------------------------১৮৪
খ. ধর্মীয় পুস্তক পুস্তিকা রচনা ------------------------------১৮৪
গ. বিতর্ক অনুষ্ঠান --১৮৪

প্রশ্ন : ৬৫ : হিন্দু আর্যসমাজীদের ফিতনা ও তার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান বর্ণনা কর। -----------------------১৮৫
হিন্দু আর্যসম্প্রদায়ের তৎপরতা ------------------------------১৮৬
ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ---------------------১৮৬

প্রশ্ন : ৬৬ : ইনকারে হাদীসের ফিতনা ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের উপর আলোকপাত কর। ------------------১৮৭
ইনকারে হাদীসের সূচনা -----------------------------------১৮৭
হাদীস অস্বীকার করার কারণ ------------------------------১৮৭
ভারত উপমহাদেশে ইনকারে হাদীসের সূচনা ----------------------১৮৮
ইনকারে হাদীসের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ -------------------১৮৯

প্রশ্ন : ৬৭ : কাদিয়ানী ফিতনা ও তার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ----------------------------১৯০
কাদিয়ানী ফিতনার উৎপত্তি ---------------------------------১৯০
গোলাম আহমদের অপতৎপরতা ------------------------------১৯১

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা ----------------১৯১
১. মজলিশে আনসারুল্লাহ ----------------------------------১৯২
২. মজলিসে খুদ্দামে আহমদী ------------------------------১৯২
৩. মজলিসে আতফালে আহমদী ----------------------------১৯২
৪. লাজনাতু আমাইল্লাহ -----------------------------------১৯২
৫. নাসেরাত --১৯২
কাদিয়ানী ফিতনার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ ---------------১৯২
কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে দু'টি চ্যালেঞ্জ ও
তার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দ ---------------------------১৯৪
পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কাদিয়ানী ফিতনার বিরুদ্ধে
উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতা ------------------------------১৯৫

প্রশ্ন : ৬৮ : বিদ'আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের উপর আলোকপাত কর। --------------------১৯৬
বিদ'আতের সংজ্ঞা ---১৯৬
বিদ'আত যে কারণে ও যেভাবে সৃষ্টি হয় ------------------------১৯৬
ভারত উপমহাদেশে বিদ'আতীদের ফিতনা -----------------------১৯৭
আহমদ রেজা খানের অপতৎপরতা -----------------------------১৯৭
ওয়াহাবী অপবাদের নেপথ্য কাহিনী ----------------------------১৯৮
বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দ ----------------------১৯৮

প্রশ্ন : ৬৯ : পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় প্রভাবিতদের বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা ও তার প্রতেরোধে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা আলোচনা কর। ------২০০
কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও শরী'অত সম্পর্কে
পাশ্চাত্যবাদীদের বিভিন্ন বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা -------------------২০০
পাশ্চাত্যবাদীদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার প্রতিরোধে
উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা ---------------------------------২০১
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর --২০৩

দেশী ও বিদেশী ফিরাতে বাতেলা

বিদেশী ফেরাকে বাতেলাহ-----------------------------------২১১
বিদআত---২১১
মওদূদী মতবাদ---২১৫
এনজিও (N.G.0)--২২০
কাদিয়ানী ধর্মমত --২২২
শী'আ মতবাদ--২২৭
স্বদেশী ফেরাকে বাতেলাহ-----------------------------------২৩৩

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচার

প্রশ্ন : ১ : সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যের পথ ধরেই মুসলমানরা সর্বপ্রথম ভারবর্ষে আগমন করে। ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে তারা শাসকরূপে উপমহাদেশে আগমন করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

আয়তনে প্রায় ইউরোপ মহাদেশের সমান, নানাদিক থেকে আকর্ষণীয় বিচিত্র এই ভারত উপমহাদেশ। স্মরণাতীত কাল থেকে উর্বরভূমি, অসংখ্য পর্বত, প্রাকৃতিক বৈচিত্র এবং অসংখ্য মূল্যবান খনিজ ও ধাতব পদার্থ, নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য ও বহু ধরনের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে এ উপমহাদেশের প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হত। সুপ্রাচীন কাল থেকেই আরবদের সাথে এদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন ধরনের মসলা, উৎকৃষ্ট মানের কাপড়, সুগন্ধি ও কাঁচামাল আমদানীর জন্য তারা এদেশে প্রায়ই আগমন করত। বাণিজ্যের এ পথ ধরেই মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও সুফী-সাধকগণ এ দেশের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন।

হযরত উমর রাযি. কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পর উপমহাদেশীয় অঞ্চলের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় বলে ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন থেকেই মুসলমানরা ভারত অভিযানের চিন্তা শুরু করে। অবশ্য শাসকরূপে মুসলমানদের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগ থেকেই সুফী-দরবেশ ও অলিগণের বদৌলতে এদেশের মানুষের সাথে শান্তির ধর্ম ইসলামের পরিচয় ঘটে। দরবেশগণের সুমহান চরিত্র মাধুর্য, মানবতাবাদী কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে উপমহাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। একারণেই দেখা যায়, ধর্মপ্রচারকগণ শাসন-ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করত মানুষকে ইসলামের সুশিতল ছায়ায় সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে

তাঁদের আগমন ঘটে সর্বাগ্রে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকার উপকূলীয় অঞ্চল, রংপুর ও ভারতের দক্ষিণাত্যের এলাকাসমূহে এবং সিন্ধু ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের বসতি গড়ে উঠেছিল ব্যাপকহারে। নবদীক্ষিত মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁরা স্থায়ীভাবে এসব এলাকায় বসবাস শুরু করেন। সাথে সাথে তাদের বদৌলতে এসব এলাকায় মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা গড়ে উঠে।

হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন

হযরত উমর রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী রাযি. তাঁর ভ্রাতা হাকামকে সিন্ধুর বরুচ অঞ্চলে এবং অপর ভ্রাতা মুগীরা ইবনে আবুল আসকে দেবল অভিযানে প্রেরণ করেন। তারা সেখানকার ক্ষমতাসীনদেরকে পরাজিত করে ভারতের সীমানায় সর্বপ্রথম ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ উতবান, আশইয়াম ইবনে আমর তামীমী, সুহাইল ইবনে আদী রাযি. প্রমুখ ছিলেন এ সময়ে ভারতে আগত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের আগমন

হযরত উসমান রাযি.-এর শাসন আমলে তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত মাকরানের শাসক উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মার তামীমী সিন্ধু নদ পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ নিজ শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু ভারতের আবহাওয়া সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে হচ্ছে না জানতে পেরে খলীফা তাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। এ সময়ে ভারতে আগত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাযি.-এর নাম ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। তিনি ৩১ হিজরীতে সিস্তানের শাসকরূপে সিন্ধু অঞ্চলের বহু এলাকা নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হন।

হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন

হযরত আলী রাযি.-এর খিলাফতকালে তাঁর অনুমতিক্রমে হারিস ইবনে মুররাহ আবদী নামক একজন জানবাজ মুজাহিদ একদল সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধুর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল উসমানী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ৪২ হিজরীতে সিন্ধুর কিকান নামক স্থানে প্রতিপক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সদলবলে নিহত হন।

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে মুসলমানদের আগমন

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর যুগে প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়ার আবদী পরে সিনান ইবনে সালামাহ হুযাইলী ভারত সীমান্তে আক্রমণ করেন। এরপর ৪৪ হিজরী সনে প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে আবু সুফরাহ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে পাঞ্জাব, লাহোর ও বান্না এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।

উমাইয়া খলীফাদের শাসনামল

উমাইয়া বংশের খলীফা ওয়ালীদের শাসনামলে তার প্রখ্যাত সেনাপতিদের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া এবং শেষ পর্যন্ত ভারত বর্ষেও ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামল

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খেলাফতের পতন ঘটে এবং আব্বাসীয়রা খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলাফতের খলীফাগণ ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সিন্ধু অঞ্চলে শাসক নিযুক্ত করতেন।

তা ছাড়া পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশ অঞ্চলে মুসলমানদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় কুতুবুদ্দীন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে। রংপুরে ২০০ হিজরী সালের দিকের মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

রাজশাহীতে ৭৮৬-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি মুসলিম আমলের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া বহু প্রাচীন আউলিয়া কিরামের খানকাহ ও মাজারের নিদর্শনাবলী সেকালে এ দেশের মুসলিম তৎপরতার বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করেছে। সে যুগে মুসলমানরা সুদূর সিংহলেও তাদের কর্মতৎপরতা এগিয়ে নিয়ে যায়। মূলত মুসলিম শাসকগণের আগমনের পূর্বেই সুফীসাধক-ও ধর্মপ্রচারকগণের তৎপরতায় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল।

উপসংহার

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের অনুসারীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে শ্রেণীবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক আত্মকলহ ছড়িয়ে পড়েছিল মুসলমানদের আগমন পূর্ব ভারতবর্ষে। ফলে তা বিভক্ত হয়ে পড়ে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে। উপমহাদেশের মানুষের আদর্শিক জীবনে নেমে এসেছিল চরম হতাশা ও অস্থিরতা। ঠিক এ হেন বৈষম্য ও বর্ণভেদ পীড়িত সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম নিয়ে তাওহীদী আদর্শের কেতন উড়িয়ে এ ভূখণ্ডে এসেছিল ইসলাম ।

প্রশ্ন : ২ : মুসলমানদের পূর্বে ভারতবর্ষে আগমনকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও যোগীবাদের অনুসারীদের পরস্পর বিরোধিতার ফলে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রেণীবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক আত্মকলহ। ফলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং এখানকার অধিবাসীরা চরম হতাশাগ্রস্ত ও অস্থির হয়ে উঠে। এ হেন মুহূর্তে উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে। নিম্নে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হল।

আর্য হিন্দুদের আগমন

সুমেটিক আর্য হিন্দুরা ইরান থেকে এসে এ এলাকায় বসতী গড়ে তোলে এবং তাদের সভ্যতা এদেশের অধিবাসীদের সভ্যতায় পরিণত হয়। কিন্তু যে আদর্শের উপর হিন্দু ধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছিল, তা অবলুপ্ত হলে শ্রেণীবৈষম্যের নির্মম যাতাকলে পিষ্ট জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে তাদের ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আগমন

জনগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেণীবৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে গৌতম বৌদ্ধের সাম্যের বাণী তাদেরকে আকৃষ্ট করে। ফলে ধীরে ধীরে তারা রাজ ক্ষমতায় সমাসীন হয়। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ অনুসারীরা পরস্পর বিরোধিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। ফলে তাদের ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

হিন্দু ব্রাহ্মণদের আগমন

বৌদ্ধদের পতনের পর ব্রাহ্মণরা রাজক্ষমতা দখল করে নেয়। কিন্তু তাদের আদর্শবাদীতা বিলুপ্ত হলে জনগণ তাদের শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। কেউ প্রতিবাদ করলে অভিশাপে স্ববংশ নির্মূল করার ভয় দেখিয়ে তারা মানুষের সর্বস্ব লুট করে নিতে থাকে। ফলে জনমনে তাদের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হতে থাকে। পরিণামে তাদের ক্ষমতারও পরিসমাপ্তি ঘটে।

যোগীবাদের আগমন

কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করে সুখময় সমাজ গড়ার শ্রুতিমধুর শ্লোগান নিয়ে এরপর ভারতবর্ষে এল যোগীবাদ। আত্মপীড়ন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ছিল যার মূল দীক্ষা। নারী স্পর্শ মহা পাপ বলে তারা নারীদেরকে দূরে রাখত। প্রথম দিকে জনমনে তা প্রভাব ফেলল এবং ধীরে ধীরে তারা রাজক্ষমতায় আরোহণ করল। কিন্তু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এ কৃচ্ছতা বেশি দিন টিকল না। ফলে স্বভাবের তাড়নায় তারা এ কৃচ্ছতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হল এবং হারাল রাজ ক্ষমতা।

এ সকল সম্প্রদায়ের আগমনের ফলে ভারতের অবস্থা

হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও যোগীবাদের অনুসারীদের পরস্পর বিরোধিতার ফলে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রেণীবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক আত্মকলহ। ফলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের মানুষের আদর্শিক জীবনে নেমে আসে এক চরম হতাশা ও অস্থিরতা।

মুসলমানদের আগমন

উপমহাদেশের এ হেন ক্রান্তিলগ্নে ভাগ্যহারা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম নিয়ে তাওহিদী আদর্শের কেতন উড়িয়ে এ দেশে আসে ইসলাম। টি, এইচ, অর্নাল্ড বলেন : ইসলাম এ দেশে এসেছিল যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত, মূক জনগণের মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

উপসংহার

ইসলাম আগমনের পূর্বে এদেশের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক ও দুর্দশাগ্রস্ত। ফলে ইসলাম তাদের মুক্তি ও শান্তির পথ দেখায়।

প্রশ্ন : ৩ : হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর খেলাফতকালে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর : হযরত উমর রাযি. কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী রাযি. আপন ভ্রাতা আল-হাকামকে সিন্ধুর বরুচ অঞ্চলে এবং অপর ভ্রাতা মুগীরাহ ইবনে আবুল আসকে দেবল অভিযানে প্রেরণ করলে তারা সেখানকার ক্ষমতাসীনদেরকে পরাস্ত করে ভারতের সীমানায় প্রথম ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেছিলেন। এ সময়ে আগত সাহাবীদের মাঝে যাদের নাম জানা যায়, তারা হলেন– আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ওত্‌বান, আশ-ইয়াম ইবনে আমর তামীমী, সোহার ইবনে আল আবদী, সুহাইল ইবনে আদী প্রমুখ।

হযরত উসমান রাযি.-এর শাসনামলে তাঁরই নিযুক্ত মাকরানের শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার সিন্ধুনদ পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ নিজের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের আবহাওয়া সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে হচ্ছে না জানতে পেরে খলিফা সৈন্যদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। এ-সময় আগত সাহাবীদের মাঝে হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাযি.-এর নাম ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। তিনি ৩১ হিজরী সনে সীস্তানের শাসকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সিন্ধু অঞ্চলের বহু এলাকা নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হন।

হযরত আলী রাযি.-এর খিলাফতকালে তাঁর অনুমতিক্রমে ৩৯ হিজরীর প্রথম দিকে হারিস ইবনে মুররাহ্ আবদী নামে একজন বীর মুজাহিদ একদল স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধুর উত্তর পশ্চিম অঞ্চল উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ৪২ হিজরীতে তিনি সিন্ধুর কিকান নামক স্থানে প্রতিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সদলবলে নিহত হন।

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর যুগে প্রথম আবদুল্লাহ ইবনে সাওবান আবদী এরপর সিনান ইবনে সালামাহ্ হুযাইলী ভারত সীমান্তে আক্রমণ করেন। পরে ৪৪ হিজরীতে প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে আবু সুফরাহ ১২ হাজার সৈন্যসহ পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।

হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর পরবর্তীকালে মুসলমানদের ঘরোয়া সমস্যার কারণে ভারতবর্ষের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে পরবর্তী সময়ে তারেক বিন যিয়াদ স্পেন জয় করার পর একসময় ভারতেও মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন : ৪ : সতের বছরের তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ভারতঅভিযান ও তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : যে সকল মুসলিম বীরদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে মুহাম্মদ বিন ক়াসিম তাঁদের অন্যতম। সিন্ধুর রাজা দাহিরের সমর্থনপুষ্ট জলদস্যু কর্তৃক নির্যাতিত ও বন্দি মুসলিম নারীদের মুক্ত করা এবং রাজা দাহিরকে উচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য উমাইয়া খেলাফতের পক্ষ থেকে তাঁকে ভারত অভিযানে প্রেরণ করা হয়। নিম্নে তার অভিযানের উপর আলোকপাত করা হল।

অভিযানের পটভূমি

উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদের শাসনামলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর ছিলেন। তার শাসনাধীন এলাকার কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী আরব সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের শাসক রাজা দাহিরের আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজ্জাজ বিদ্রোহীদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজা দাহিরের কাছে পত্র প্রেরণ করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে যে আরব বনিক সিংহলে বাণিজ্যরত অবস্থায় মারা যায়, তাদের পরিবার-পরিজনকে দেশে পাঠানোর জন্য সিংহলের রাজা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং হাজ্জাজের জন্য বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রীসহ আটটি জাহাজ প্রেরণ করে।

সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দর দাইবুলের নিকট সেখানকার জলদস্যুদের দ্বারা মুসলমানদের আটটি জাহাজ লুণ্ঠিত হয় এবং যাত্রীদের উপর অকথ্য নির্যাতন

চালিয়ে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। অনন্তর বন্দিদের মুক্তি, লুণ্ঠিত সম্পদ উদ্ধার এবং জলদস্যুদের শায়েস্তা করার আবেদন জানিয়ে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা দাহির এ ব্যাপারে অসম্মতি জানায়। ফলে হাজ্জাজ রাজা দাহিরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পরপর দুটি অভিযান পরিচালনা করেন। সে অভিযানে ব্যর্থ হলে আপন ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা সতরে বছরের তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের নেতৃত্বে চালান তৃতীয় অভিযান।

ভারত অভিমুখে অভিযান ও তার ফলাফল

ছয় হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উষ্ট্রবাহিনী নিয়ে মুহাম্মাদ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে মারাকানের অধিপতির পক্ষ থেকেও সাহায্য হিসেবে পান আরো একটি সৈন্য দল। ৭১১-১২ খ্রিষ্টাব্দের কোনো একসময়ে তারা দুবাইল বন্দরে এসে পৌঁছেন। তুমুল লড়াইয়ের পরে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।

এরপর মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ক্রমান্বয়ে বর্তমান হায়দারাবাদের নিকটস্থ নিরুন নগরী, সিওয়ান ও সিসাম এলাকাসমূহ দখল করে নেন। যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হয়। তার স্ত্রী ও পুত্ররা রাওয়ার নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশেষে মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আগুনে আত্মহুতি দেয়। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ ও মুলতান অভিমুখেও অভিযান পরিচালনা করে বিজয় নিয়ে ফিরতে সক্ষম হয়। এভাবে রাজা দাহিরের সমগ্র রাজ্য মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

উপসংহার

আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও আস্থা, সুষ্ঠু পরিচালনা, আনুগত্য, কৌশল এবং ক্ষমতাসীনদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ ও ইসলামের সুমহান আদর্শে আদর্শবান মুহাম্মাদের আদর্শে বিমুগ্ধ জনতার সহযোগিতাই মুসলমানদের বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। মুলতান বিজয়ের পর মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম কৌনজ দখলের মনস্থ করেন। যখন সেনাপতি আবু হাকীমের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণের প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক তখনই দামেস্কের শাসনক্ষমতায় রদবদল হয়। নির্বাচিত খলীফা সোলাইমান ক্ষমতায় আরোহণ করেই গোত্রীয় প্রতিহিংসায় মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমকে দামেস্কে তলব করে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

প্রশ্ন : ৫ : গজনি ও ঘোর বংশের ভারত শাসন সম্পর্কে আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : আব্বাসীয় খেলাফতের পক্ষ থেকে ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধু অঞ্চলে শাসক নিয়ুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সাতটি মুসলিম রাজবংশ ভারতবর্ষ শাসন করে। তন্মোধ্যে গজনি ও ঘোর বংশ অন্যতম। নিম্নে বংশ দুটির ভারত শাসনের উপর আলোকপাত করা হল :

গজনি বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল
গজনি বংশের ভারত শাসন

একনজরে গজনি বংশের শাসকদের নাম এবং তাদের শাসনকাল :

নাম	শাসনকা
(১) আলাপতিগীন	: ৯৬২-------------৯৭৫ খ্রি.
(২) আবূ ইসহাক	: ৯৭৫-------------৯৭৫ সালের অল্প কিছু দিন।
(৩) পীরাই	: ৯৭৫-------------৯৭৭ খ্রি.
(৪) সবুক্তগীন	: ৯৭৭-------------১০০০ খ্রি.
(৫) সুলতান মাহমূদ গজনি	: ১০০০-----------১০২৭ খ্রি.

গজনি বংশের শাসন

আব্বাসীয় খলীফাগণ তাদের খেলাফতের প্রাথমিক পর্যায়ে দাপটে থাকলেও পরবর্তীকালে তারা খানিকটা আরামপ্রিয় হয়ে উঠেন। ফলে খেলাফতের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সময় খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাসানীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সাসানী বংশের পঞ্চম রাজা আবদুল মালিকের একজন বিশ্বস্ত কৃতদাস ছিল। ইতিহাসে তিনি 'আলাপতিগীন' নামে পরিচিত। মনিবের আনুগত্যের মাধ্যমে তিনি খোরাসানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন।

মুনিবের মৃত্যুর পর তিনি গজনিতে উপস্থিত হয়ে সেখানকার শাসক আবূ বকর লাইককে পরাজিত করে ৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। সেখান থেকেই ভারতবর্ষে গজনি বংশের শাসন শুরু হয়। দীর্ঘ ১৪ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করার পর আলপতিগীন নিজ পুত্র আবু ইসহাকের হাতে রাজত্ব অর্পণ করে ইন্তিকাল করেন। এর অল্প কিছুদিন পর (৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) পীরাই শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তার শাসনকার্য জনগণের মনঃপূত না হওয়ায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে আলপতিগীনের কৃতদাস

সবুক্তগীনকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি উত্তর-পশ্চিম এলাকার হিন্দু রাজা জয়পালের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ৯৭৯ সালে অগ্রসর হন।

ঘুযাত নামক স্থানে দুই বাহিনী মুখোমুখী হয়। রাজা জয়পাল পরাজিত হয়ে মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য আশেপাশের হিন্দু রাজাদের সহায়তায় একটি সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলে। ৯৯১ সালে এ বাহিনী সবুক্তগীনের হাতে পরাস্ত হয়। ফলে লাঘমান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী স্থানের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোও গজনি সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

পরে সুবুক্তগীনের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মাহমূদ গজনবী ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। বারবার ভারত অভিযানে অনেকগুলো খণ্ড রাজ্য গজনি সাম্রাজ্যের অধীনে এলেও একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া অন্যসব এলাকা পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মাহমূদের পর দীর্ঘ ১৫০ বছর ধরে তার উত্তরাধিকারগণ গজনিতে রাজত্ব করলেও তাদের মধ্যে কেউ উল্লেখযোগ্য ছিলেন না। তারা পরস্পরে ক্ষমতা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন।

ঘোর বংশের ভারত শাসন

১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘোর বংশের দু'জন শাসক যথাক্রমে সুলতান ঘোরী এবং সিয়াসুদ্দীন মাহমূদ ভারত শাসন করেন। সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী শেষ গজনি সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গজনির ক্ষমতা অধিকার করেন। এরপরই তিনি ভারত অভিযানে মনোনিবেশ করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে একে একে দিল্লি, আজমীর, সিন্ধু, কৌনজ, গুজরাট, বিহার ও বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

এ অভিযানে তার ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেকের সাহসিকতাই অনেকটা মুখ্য ভূমিকা রাখে। তবে এ বিজয়ের সুফল তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারেন নি। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘোর বংশীয় জনৈক ব্যক্তির হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন মাহমূদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের মাঝে ক্ষমতা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হলে খাওয়ারিজম শাহ ঘোর রাজ্যে অভিযান চালিয়ে এর ক্ষমতা দখল করেন। ফলে ঘোর বংশের শাসনের পতন ঘটে।

প্রশ্ন : ৬ : দাস বংশ ও খিলজী বংশের ভারতবর্ষ শাসন সম্পর্কে আলোকপাত কর।

উত্তর : ভূমিকা : ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দাস বংশের শাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতবর্ষে তাদের শাসনক্ষমতা দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিম্নে তাদের ভারত শাসনের উপর আলোকপাত করা হল :

সংক্ষেপে দাস বংশের শাসক ও শাসনকাল।

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) কুতুবুদ্দীন আইবেক	: ১২০৬-----------------১২১০ খ্রি.
(২) আরাম শাহ	: ১২১০-----------------১২১১ খ্রি.
(৩) ইলতুৎমিশ	: ১২১১-----------------১২৩৬ খ্রি.
(৪) রুকনুদ্দীন ফিরোজ	: ১২৩৬-----------------১২৩৭ খ্রি.
(৫) রাজিয়া	: ১২৩৭-----------------১২৪০ খ্রি.
(৬) বাহরাম শাহ	: ১২৪০-----------------১২৪২ খ্রি.
(৭) মাসুদ	: ১২৪২-----------------১২৪৬ খ্রি.
(৮) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ	: ১২৪৬-----------------১২৬৬ খ্রি.
(৯) গিয়াসুদ্দীন বলবন	: ১২৬৬ ----------------১২৮৭ খ্রি.
(১০) কায়কোবাদ	: ১২৮৭ ----------------১২৮৯ খ্রি.
(১১) কাইমুর্স	: ১২৮৯-----------------১২৯০ খ্রি.

মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর বছর তার সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আইবেক যেহেতু হাম্মাদ ঘোরীর ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করেছিলেন, তাই তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে ঐতিহাসিক সূত্রে "দাস বংশ" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুতুবুদ্দীন আইবেক চার বৎসর দিল্লীর শাসন করে ১২১০ সালে পলো খেলতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেন। এ সুযোগে কুতুবুদ্দীনের জামাতা ও বাদারুনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিশ ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটে এক যুদ্ধে আরাম শাহ-কে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ প্রায় ২৫ বছর দিল্লীর সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। এ সময়ে তিনি অনেক এলাকা অধিকার করেন। তিনি জনমনে সৎ শাসক হিসেবে স্থান করে নিতে সক্ষম হন।

১২৩৫ খ্রিষ্টাব্দে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজ কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু

সম্রাটের মনোনয়ন আমীর-উমারাদের মনঃপূত হয় নি। তাই তার পুত্র রুকনুদ্দীন ফিরোজকে মসনদে বসানো হয়। কিন্তু তার অদক্ষতার কারণে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রাজিয়া এ সুবর্ণ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে নিজের পক্ষে জনমত তৈরি করে ফিরোজের অনুপস্থিতিতে দিল্লীর মসনদ দখল করে নেন। পরে ফিরোজ দিল্লী ফিরলে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। নারী হয়েও তিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শীতার মাধ্যমে ১২৩৭ সাল থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এরপর ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানা রাজিয়া ও তার স্বামী ইখতিয়ার উদ্দীন আলতুনিয়া এক হিন্দু আততায়ীর হাতে নিহত হয়।

সুলতানা রাজিয়া মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা বাহরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজের আযোগ্যতার কারণে ক্ষমতায় আরোহণের তৃতীয় বছর সংঘবদ্ধ আমীরদল কর্তৃক দিল্লীর "শ্বেত দুর্গে" অবরুদ্ধ হয়ে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের পৌত্র মাসুদ মসনদে আরোহণ করেন। দুঃশাসন ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে তিনি সুলতান হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

ফলে রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ মাসুদকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার পিতৃব্য নাসিরুদ্দীন মাহমূদকে সিংহাসনে বসান। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদ ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু শাসক। প্রায় বিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে নিজ প্রধানমন্ত্রী ও শ্বশুর গিয়াসুদ্দীন বলবনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান এবং রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার আমলে শরী'অতের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ও পাপাচার নিবারণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। সুদীর্ঘ ২২ বছর তার রাজত্ব স্থায়িত্ব লাভ করে। নিজ পুত্র বুগরা খানকে উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতানের মৃত্যুকালে বুগরা খাঁন ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা। সুলতানাতের এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি তার নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসেন। ফলে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ বুগরা খানের ১৮ বছরের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু তার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সাম্রাজ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। দরবারীদের মধ্যে তুর্কী অভিজাত ব্যক্তিবর্গ আর খলজী আমীরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। খলজীরা তখন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেন।

অন্যদিকে বিভিন্ন অনাচার ও অনিয়মের ফলে কায়কোবাদ ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়েন। এরূপ জটিল পরিস্থিতিতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তুর্কীগণ ১২৮২ খ্রিষ্টাব্দে কায়কোবাদের তিন বছরের সন্তান কাইমুর্সকে শাসক নিযুক্ত করেন। ফলে রাজনৈতিক অবস্থা দিনদিন ঘোলাটে হতে থাকে। এ বিশৃঙ্খলার সুযোগে খলজী সম্প্রদায়ের নেতা ফিরোজ খলজী দিল্লীতে প্রবেশ করেন এবং শিশু সুলতানকে অবরোধ করে ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে দিল্লীর সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ উপাধী গ্রহণ করেন। এভাবেই দাস বংশের পতন ঘটে।

উপসংহার

দীর্ঘ প্রায় পঁচাশি বছর ভারতের মসনদে থাকা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দাস বংশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনে সক্ষম হয় নি।

প্রশ্ন : ৭ : খলজী বংশের ভারতবর্ষ শাসন সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে খলজী বংশের শাসন একটি অধ্যায় বলে বিবেচিত। নিম্নে তাদের ভারত শাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

খিলজী বংশের শাসন

সুলতান জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করায় দিল্লীর সাম্রাজ্যে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে এবং খিলজী শাসনের সূচনা হয়। ১২৯০ সাল থেকে ১৩২০ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচজন খিলজী শাসক ভারত শাসন করে।

সংক্ষেপে খলজী বংশের শাসক ও শাসনকাল

খিলজী বংশের ভারত শাসন

একনজরে খিলজী বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) জালালুদ্দীন খিলজী	: ১২৯০------------------১২৯৬ খ্রি.
(২) আলাউদ্দীন খিলজী	: ১২৯৬------------------১৩১৬ খ্রি.
(৩) মালিক কাফূর	: ১৩১৬------------------১৩১৬ খ্রি.
(৪) মুবারক খান	: ১৩১৬------------------১৩২০ খ্রি.
(৫) খসরু খান	: ১৩২০------------------১৩২০ খ্রি.

সুলতান জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ প্রায় ছয় বছর শাসন পরিচালনা করেন। ১২৯৬ সালে অযোধ্যার শাসক নিজ ভাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দাক্ষিণাত্যের কারামানিকপুরে পৌঁছুলে আলাউদ্দীনের চক্রান্তে তিনি নিহত হন। এরপর আলাউদ্দীন খিলজী নিজেকে দিল্লীর শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর বিদ্রোহদমন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজ্য সম্প্রসারণের প্রতিও তিনি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি সুদীর্ঘ বিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলাউদ্দিনের অন্তিমকালে তার মন্ত্রী মালিক কাফুর ক্ষমতা লাভের হীন লালসায় সুলতানকে তার দুই সন্তান খিজির খান ও সাহ্‌দী খানকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে কারাগারে বন্দি করতে এবং শিশু সন্তান শিহাবউদ্দীনকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। সুলতানের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিবাহ করে মালিক কাফুর নিজেই শাসনকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রাসাদের জনৈক দেহরক্ষী তাকে হত্যা করে। মালিক কাফুরের পর শিহাবুদ্দীনের বড় ভাই মুবারক খান তার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এর কিছুদিন পর তিনি আপন ভ্রাতা শিহাবুদ্দীনের চোখ উপড়ে ফেলেন এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৩১৬ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসন লাভের পর তিনি আমোদ-প্রমোদে ডুবে যান। এ সুযোগে দাক্ষিণাত্যের শাসক খসরু খান ১৩২০ সালে মুবারক খানকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেন। ফলে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ক্রমেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ইত্যবসরে পাঞ্জাবের শাসক গাজী মালিক ১৩২০ সালে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লীতে হামলা করে সুলতান খসরু খানকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উপসংহার

খিলজী বংশ উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ ইতহাস রচনা করলেও বিভিন্ন অনাচার ও বিশৃঙ্খলার কারণে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

প্রশ্ন : ৮ : তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশের ভারত শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : সুলতান মাহমূদ গজনি কর্তৃক ভারত বিজয় থেকে শুরু করে মোঘল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ৭টি মুসলিম রাজবংশ ভারত শাসন করে। তুঘলক বংশ সৈয়দ বংশ এবং লোদী বংশ হল তন্মধ্যে সর্বশেষ তিনটি। নিম্নে এ তিনটি রাজবংশের ভারত শাসনের উপর আলোকপাত করা হল।

সংক্ষেপে তুঘলক বংশের শাসক ও শাসনকাল।

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) গাজী মালিক গিয়াসুদ্দীন তুঘলক	: ১৩২০-----১৩২৫ খ্রি.
(২) জুনা খাঁন উরফে উলুঘ খাঁন	: ১৩২৫-----১৩৫১ খ্রি.
(৩) ফিরোজ শাহ তুঘলক	: ১৩৫১-----১৩৮৮ খ্রি.
(৪) সুলতান তুঘলক শাহ দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন	: ১৩৮৮-----১৩৮৯ খ্রি.
(৫) সুলতান আবু বকর তুঘলক	: ১৩৮৯-----১৩৯০ খ্রি.
(৬) সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ তুঘলক	: ১৩৯০-----১৩৯৪ খ্রি.
(৭) সুলতান হুমায়ূন তুঘলক	: ১৩৯৪-----১৩৯৪ খ্রি.
(৮) সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ তুঘলক	: ১৩৯৪-----১৪১১ খ্রি.

তুঘলক বংশের ভারত শাসন

১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে খসরু খানকে হত্যা করে গাজী মালিক খান দিল্লীর ক্ষমতায় সমাসীন করার সাথে সাথেই ভারতের সিংহাসনে খলজী বংশের পতন ঘটে। গাজী মালিক ক্ষমতা গ্রহণের সময় "গিয়াসুদ্দীন তুঘলক" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি তার পাঁচ বছর শাসন আমলে অনেক এলাকা দিল্লীর শাসনভুক্ত করেন। এ বিজয়ের সূত্র ধরে বঙ্গদেশ জয় করে তার সন্তান জুনা খাঁন ওরফে উলুঘ খাঁন পিতার সংবর্ধনার জন্য একটি সুবিশাল কাষ্ঠগৃহ নির্মাণ করেন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক দেশে ফিরলে উক্ত গৃহের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুর পর পুত্র উলুঘ খাঁন মুহাম্মদ ইবনে তুঘলক উপাধী ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ ২৬ বছর শাসনকার্য চালিয়ে যান। ১৩৫১ সালে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে গমন করলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তিনি কোনো উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন নি; তার কোনো পুত্র সন্তানও ছিল না। বিধায় বিশেষজ্ঞ মহলের অনুরোধে তার চাচাত ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলককে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ফিরোজ শাহ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ শাসক ছিলেন। তার আমলে বিচার বিভাগকে ইসলামী শরী'অতের ছাচে গড়ে তোলা হয়। তিনি ১৩৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় ৩৭ বছর শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তার পৌত্র তুঘলক শাহ দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্প কিছুদিন পরে ১৩৮৯ সালে তার চাচাত ভাই আবু বকর তাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কিন্তু আমীর উমারাদের চক্রান্তের ফলে আবূ বকরও অল্প কিছুদিনের মধ্যে সিংহাসনচ্যুত হন। এ সুযোগে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র "মুহাম্মাদ" নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ নাম ধারণ করে ১৩৯০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র চার বছর পর মৃত্যুবরণ করলে তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র "মাহমূদ" নাসিরুদ্দীন মাহমূদ তুঘলক নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মাহমূদের শাসনামলে রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং দূর-দূরান্তের প্রদেশের শাসকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফিরোজ শাহের বংশধরদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে তুর্কী চোঘতাই বংশের তুরঘাই এর পুত্র তৈমুর লং ১৩৯৯ সালে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতে হামলা করে দিল্লী দখল করে নেয়। মাহমূদ দিল্লী থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু তৈমুর লং ভারত বিজয়ের মাত্র ২৫ দিনের মাথায় বিপুল সংখ্যক দাস-দাসীসহ লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেন। ফেরার পথে তিনি খিজির খানকে মুলতান, লাহোর ও আশে-পাশের এলাকার শাসক নিযুক্ত করে যান। তৈমুর লং ভারত ত্যাগ করার পর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদ তুঘলক পুনরায় দিল্লী ফিরে এসে নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।

এরপর ১৪১১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করলে আমীর উমারাগণ তার মন্ত্রী দৌলত খান লোদীকে সিংহাসনে বসান। এর মাত্র দু'বছর পর ১৪১৪ সালে তৈমুল লং এর নিয়োগকৃত মুলতানের শাসক খিজির খান তাকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে স্ববংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সৈয়দ বংশের ভারত শাসন

সংক্ষেপে সৈয়দ বংশের শাসকগণ এবং শাসনকাল

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) খিজির খাঁন	: ১৪১৪------------১৪২১ খ্রি.
(২) মুবারক শাহ	: ১৪২১------------১৪৩৪ খ্রি.
(৩) মুহাম্মদ শাহ	: ১৪৩৪------------১৪৪৪ খ্রি.
(৪) আলাউদ্দীন আলম শাহ	: ১৪৪৪------------১৪৫১ খ্রি.

খিজির খানের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ভারতে তুঘলক বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। খিজির খান আরব বংশদ্ভুত হওয়ার ফলে তিনি নিজেকে সৈয়দ বংশীয় বলে দাবি করতেন। এ কারণে তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে সৈয়দ বংশ বলা হত। তিনি প্রায় ৮ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৪২১ সালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

এরপর তার পুত্র মুবারক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় ১৪ বছর পর ১৪৩৪ সালে তিনি জনৈক ব্যক্তির হাতে নিহত হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪৪৪ সালে নিহত হন। এর পরে তার পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ সিংহাসনে বসেন। রাজ্য শাসনে তার প্রয়োজনীয় পারদর্শীতা না থাকায় ১৪৫১ সালে তিনি স্বেচ্ছায় বাহলুল লোদীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

লোদী বংশের ভারত শাসন :

লোদী বংশের ভারত শাসন

একনজরে লোদী বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) বাহলূল লোদী	: ১৪৫১------------১৪৮৯ খ্রি.
(২) নিজাম খাঁন	: ১৪৮৯------------১৫১৭ খ্রি.
(৩) ইবরাহীম লোদী	: ১৫১৭------------১৫২৬ খ্রি.

আলাউদ্দীন আলম শাহের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সৈয়দ বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর এরই সাথে লোদী বংশে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাহলূল লোদী একজন বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। তিনি প্রায় ৩৭ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৪৮৯ সালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর তার দ্বিতীয় পুত্র নিজাম খান "সিকান্দর লোদী" নাম ধারণ করে মসনদে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ২৮ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৪৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর তার পুত্র ইবরাহীম লোদী মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি সুলতান হওয়ার পর পরই সাম্রাজ্যের মাঝে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য দরবারের একটি দল তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারই ছোট ভাই জালল খান লোদীকে মসনদে বসানোর চেষ্টা চালায়। ইবরাহীম এ খবর পেয়ে ভাইকে হত্যা করেন। দরবারীদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে দরবারীগণ ক্রমেই তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। বিশেষ করে দৌলত খান তার কঠোর রীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে কাবুলের আমীর মোঘল বংশদ্ভুত বাবরকে ভারত আক্রমণ করে ইবরাহীমকে সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানান। বাবর পূর্ব থেকে দিল্লীর সিংহাসন

অধিকারের প্রতি লালায়িত ছিলেন। এ আহ্বানকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ১৫২৬ সালে ২১শে এপ্রিল ভারত হামলা করে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহীম লোদীকে পরাস্ত করে দিল্লী দখল করেন।

উপসংহার

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের মোঘল সম্রাট বাবরের ভারত অধিকারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসা সুলতানী শাসনব্যবস্থার অবসান হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে মোঘলরা অধিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন : ৯ : ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল মুসলিম বংশ ভরত শাসন করে তাদের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ কর।

উত্তর :

ভূমিকা : সাহাবায়ে কিরাম এর যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। ৭১১/১২ খ্রি. মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর শতাব্দীকালেরও কম সময় বাদ দিয়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অন্তত ১০টি মুসলিম রাজবংশ প্রায় এক হাজার বছর ভারত শাসন করে। নিম্নে সে সকল বংশের নাম এবং তাদের শাসনকালের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল।

বংশের নাম	শাসনকাল
(১) উমাইয়া বংশ	: ৭১১/১২ ---------------- ৭৫০ খ্রি.
(২) আব্বাসীয় বংশ	: ৭৫৪ ------------------- ৮৭১ খ্রি.
(৩) গজনী বংশ	: ৯৬২ ------------------- ১০২৭ খ্রি.
(৪) ঘুর বংশ	: ১১৭৩ ------------------ ১২০৬ খ্রি.
(৫) দাস বংশ	: ১২০৬ ------------------ ১২৯০ খ্রি.
(৬) খিলজী বংশ	: ১২৯০ ------------------ ১৩২০ খ্রি.
(৭) তুঘলক বংশ	: ১৩২০ ---------------- ১৪১১ খ্রি.
(৮) সৈয়দ বংশ	: ১৪১৪ ------------------ ১৪৫১ খ্রি.
(৯) লোদী বংশ	: ১৪৫১ ------------------ ১৫২৬ খ্রি.
(১০) মোঘল বংশ	: ১৫২৬ ------------------ ১৮০৩ খ্রি.

উমাইয়া বংশের ভারত শাসন (৭১১/১২-৭৫০) খ্রিঃ

৭১১/১২ খ্রিঃ মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে উমাইয়া শাসনের সূচনা হয়। ৭৫০ খ্রিঃ উমাইয়া শাসনের পতন পর্যন্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ সিন্ধু ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো শাসন করেন।

একনজরে উমাইয়া বংশের শাসককের নাম

(১) মুহাম্মদ বিন কাসিম।

(২) ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব।

(৩) হাবীব বিন মুহাল্লাব।

(৪) জুনাইদ।

(৫) তামিন।

আব্বাসীয় বংশের ভারত শাসন (৭৫৪-৮৭১ খ্রি.)

৭৫৪-৮৭১ খ্রি. পর্যন্ত আব্বাসী খেলাফতের পক্ষ থেকে সিন্ধু অঞ্চলে শাসনকর্তা নিয়োগ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৮৭১ খ্রি. এদেশের মুসলমানগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তারা মুলতান ও মনসুরায় পৃথক পৃথক দুটি রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

গজনি বংশের ভারত শাসন (৯৬২-১০২৭ খ্রি.)

এক নজরে গজনি বংশের শাসকদের নাম এবং তাদের শাসনকাল :

নাম	শাসনকাল
(১) আলাপতিগীন	: ৯৬২------------৯৭৫ খ্রি.
(২) আবূ ইসহাক	: ৯৭৫------------৯৭৫ সালের অল্প কিছু দিন।
(৩) পীরাই	: ৯৭৫------------৯৭৭ খ্রি.
(৪) সবুক্তগীন	: ৯৭৭------------১০০০ খ্রি.
(৫) সুলতান মাহমূদ গজনি	: ১০০০------------১০২৭ খ্রি.

সুলতান মাহমূদের পর দীর্ঘ ১৫০ বছর ধরে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ গজনিতে রাজত্ব করলেও তাদের কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ঘোর বংশের ভারত শাসন (১১৭৩-১২০৬ খ্রি.)

একনজরে ঘোর বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

নাম	সময়কাল
(১) সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী	: ১১৭৩------------১২০৬ খ্রি.
(২) গিয়াস উদ্দীন মাহমূদ	: ১২০৬------------ খ্রি.

দাস বংশের ভারত শাসন (১২০৬-১২৯০ খ্রি.)

একনজরে দাস বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) কুতুবুদ্দীন আইবেক	: ১২০৬------------------১২১০ খ্রি.
(২) আরাম শাহ	: ১২১০------------------১২১১ খ্রি.
(৩) ইলতুৎমিশ	: ১২১১------------------১২৩৬ খ্রি.
(৪) রুকুদ্দীন ফিরোজ	: ১২৩৬------------------১২৩৭ খ্রি.
(৫) রাজিয়া	: ১২৩৭------------------১২৪০ খ্রি.
(৬) বাহরাম শাহ	: ১২৪০------------------১২৪২ খ্রি.
(৭) মাসঊদ	: ১২৪২------------------১২৪৬ খ্রি.
(৮) নাসিরুদ্দীন মাহমূদ	: ১২৪৬------------------১২৬৬ খ্রি.
(৯) গিয়াসুদ্দীন বলবন	: ১২৬৬ -----------------১২৮৭ খ্রি.
(১০) কায়কোবাদ	: ১২৮৭ -----------------১২৮৯ খ্রি.
(১১) কাইমুর্স	: ১২৮৯------------------১২৯০ খ্রি.

খিলজী বংশের ভারত শাসন (১২৯০-১৩২০ খ্রি.)

একনজরে খিলজী বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) জালালুদ্দীন খিলজী	: ১২৯০------------------১২৯৬ খ্রি.
(২) আলাউদ্দীন খিলজী	: ১২৯৬------------------১৩১৬ খ্রি.
(৩) মালিক কাফূর	: ১৩১৬------------------১৩১৬ খ্রি.
(৪) মুবারক খান	: ১৩১৬------------------১৩২০ খ্রি.
(৫) খসরু খান	: ১৩২০------------------১৩২০ খ্রি.

তুঘলক বংশের ভারত শাসন (১৩২০-১৪১৪ খ্রি.)

একনজরে তুঘলক বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) গাজী মালিক গিয়াসুদ্দীন তুঘলক	: ১৩২০-----১৩২৫ খ্রি.
(২) জুনা খাঁন উরফে উলুঘ খাঁন	: ১৩২৫-----১৩৫১ খ্রি.
(৩) ফিরোজ শাহ তুঘলক	: ১৩৫১-----১৩৮৮ খ্রি.
(৪) সুলতান তুঘলক শাহ দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন	: ১৩৮৮-----১৩৮৯ খ্রি.
(৫) সুলতান আবু বকর তুঘলক	: ১৩৮৯-----১৩৯০ খ্রি.
(৬) সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ তুঘলক	: ১৩৯০-----১৩৯৪ খ্রি.
(৭) সুলতান হুমায়ূন তুঘলক	: ১৩৯৪-----১৩৯৪ খ্রি.
(৮) সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ তুঘলক	: ১৩৯৪-----১৪১১ খ্রি.

সৈয়দ বংশের ভারত শাসন (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি.)

একনজরে সৈয়দ বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) খিজির খাঁন	: ১৪১৪-------------১৪২১ খ্রি.
(২) মুবারক শাহ	: ১৪২১-------------১৪৩৪ খ্রি.
(৩) মুহাম্মদ শাহ	: ১৪৩৪-------------১৪৪৪ খ্রি.
(৪) আলাউদ্দীন আলম শাহ	: ১৪৪৪-------------১৪৫১ খ্রি.

লোদী বংশের ভারত শাসন (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)

একনজরে লোদী বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) বাহলূল লোদী	: ১৪৫১-------------১৪৮৯ খ্রি.
(২) নিজাম খাঁন	: ১৪৮৯-------------১৫১৭ খ্রি.
(৩) ইবরাহীম লোদী	: ১৫১৭-------------১৫২৬ খ্রি.

মোঘল বংশের ভারত শাসন (১৫২৬-১৮০৩ খ্রি.)

একনজরে মোঘল বংশের শাসকদের নাম ও শাসনকাল :

শাসকদের নাম	শাসনকাল
(১) বাবর	: ১৫২৬------------১৫৩০ খ্রি.
(২) হুমায়ূন	: ১৫৩০------------১৫৫৬ খ্রি.
(৩) আকবর	: ১৫৫৬------------১৬০৬ খ্রি.
(৪) জাহাঙ্গীর	: ১৬০৬------------১৬২৭ খ্রি.
(৫) শাহজাহান	: ১৬২৭------------১৬৫৮ খ্রি.
(৬) আওরঙ্গজেব আলমগীর	: ১৬৫৮------------১৭০৬ খ্রি.
(৭) বাহাদুর শাহ (শাহ আলম)	: ১৭০৬------------১৭১২ খ্রি.
(৮) জাহান্দর শাহ	: ১৭১২------------১৭১৩ খ্রি.
(৯) ফররুখ সিয়ার	: ১৭১৩ -----------১৭১৯ খ্রি.
(১০) মুহাম্মদ শাহ	: ১৭১৯ -----------১৭৪৮ খ্রি.
(১১) আহমদ শাহ	: ১৭৪৮------------১৭৪৮ খ্রি.
(১২) দ্বিতীয় আলমগীর	: ১৭৪৮------------১৭৪৮ খ্রি.
(১৩) দ্বিতীয় শাহ আলম	: ১৭৪৮------------১৮০৩ খ্রি.

উপসংহার

উল্লেখিত মুসলিম রাজবংশগুলো প্রায় ৮শ' বছর ভারত শাসন করে। ভরতবর্ষের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির পিছনে নিঃসন্দেহে মুসলমানদের অসামান্য অবদান রয়েছে বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

প্রশ্ন : ১০ : সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস এবং তার শাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে মোঘল শাসনামল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মোঘল সম্রাটদের মধ্যে বাদশা আকবরই ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ শাসক, সাহসী বীর। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। "দ্বীনে ইলাহী" প্রবর্তন করে ইসলামের ইতিহাসে তিনি একটি কালো অধ্যায় রচনা করেন।

সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও পরিচয়

তার মূল নাম আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবর। পিতা সম্রাট হুমায়ূন এবং মাতা হামিদা বানু। তার পিতা শের শাহের সাথে একযুদ্ধে পরাজিত হয়ে সস্ত্রীক সিন্ধুর অমর কোটের হিন্দুরাজা রানা প্রসাদের রাজ্যে পলায়ন করেন। সেখানেই নির্বাসিত জীবনে ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর আকবরের জন্ম হয়।

প্রাথমিক জীবন ও অভিভাবকের প্রতি অনিহা

পিতা হুমায়ূনের মৃত্যুকালে আকবর নিজ অভিভাবক বৈরাম খানের সাথে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটি শহরে ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে মাত্র তের বছর বয়সে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ সালে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈরাম খান তার অভিভাবক নিযুক্ত হন। ফলে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করলেও বৈরাম খানই মূলত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন শী'আ সম্প্রদায়ের লোক। স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও জনগণের সাথে রুক্ষ আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি করেন। ফলে আকবর তার অভিভাবকত্বের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন।

বৈরাম খানের সহযোগীতায় আকবর সিংহাসনে আরোহণ করলেও উপর্যুক্ত কারণে তিনি তাকে পদচ্যুত করেন। তবে অনেক ঐতিহাসিকগণের মতে মোঘল

সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষায় বৈরামের অবদান অনেক। তার যাবতীয় গুণের কারণে তিনি পরিণত হয়েছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে। সম্ভবত এ কারণে দরবারী আমীরগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে বৈরামের বিরুদ্ধে আকবরকে উস্কে দেয় এবং স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণের প্রতি তাকে উৎসাহিত করে।

প্রচলিত শিক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্নতা

বাল্যকালে পিতার মৃত্যু, ক্ষমতায় আরোহণ এবং জ্ঞানার্জনে অনীহা বশত আকবর জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। ফলে তিনি পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রে এক রকম মূর্খতার আবর্তেই রয়ে যান।

মৃত্যু : ১৬০৫ সালে সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন।

আকবরের শাসনব্যবস্থা

(১) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

আকবর ছিলেন নিজ শাসনব্যবস্থার শীর্ষে। তার শাসনামলে সকল প্রতিভাবান ব্যক্তি– সে যে ধর্ম বা জাতিরই হোক না কেন –রাজকার্যের উচ্চ স্থান পেতেন। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দায়িত্বে বিভিন্ন বিভাগ ছিল। যেমন : (ক) অর্থনৈতিক বিভাগ। (খ) সমর বিভাগ। (গ) বিচার বিভাগ। (ঘ) হিসাব বিভাগ। (ঙ) গোয়েন্দা বিভাগ। (চ) পর্যবেক্ষণ বিভাগ। (ছ) ডাক বিভাগ প্রভৃতি।

(২) প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যে আকবর গোটা সাম্রাজ্যকে ১৫টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের শাসককে বলা হত 'নাযেম'। গোটা সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগের প্রধান কাজী নিযুক্ত করতেন আকবর নিজেই আর প্রাদেশিক কাজীগণ প্রধান কাজী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

রাজস্ব নীতি

রাজস্ব বিভাগের সংস্কারে শেরশাহের অবদান অবিস্মরণীয়। পরবর্তী সময়ে তার রাজস্ব ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্রাট আকবর যে অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করেছেন; তা তার অসামান্য দূরদর্শীতারই পরিচায়ক। এ রাজস্ব ব্যবস্থায় যাবতীয় ভূমি মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা :

(১) পোলাহ (যা সব সময় আবাদ হত)।

(২) পরৌত (যা বছরের কিছু সময় পতিত রাখা হত)।

(৩) তেহার (যা তিন চার বছর পতিত থাকত)।

(৪) বনযার (যা বছরের অধিক সময় পতিত থাকত)।

রাজপুতনীতি

সম্রাট আকবর নিজ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও তার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে যেসব নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে রাজপুতনীতি অন্যতম। তিনি ভাবলেন, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ট লোক অমুসলিম। বিশেষত শৌর্য-বীর্যের প্রতীক রাজপুত জনগোষ্ঠীর সাহায্য-সহযোগিতা তার একান্ত প্রয়োজন। কারণ, তারাই মোঘল বংশের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তাই শক্তিশালী রাজন্যবর্গ ও জনগণের সাহায্য-সহযোগীতা লাভ, তাদের মেধা ও শ্রমকে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে রাজপুতদের সাথে যে উদারনীতি গ্রহণ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, তাই 'রাজপুতনীতি' বলে খ্যাত।

বৈবাহিক সম্পর্ক

১৫৬২ সালে আম্বরের রাজা বিহারী মলের কন্যা যোধাবাঈ এবং ১৫৭০ সালে বিকানীরের কল্যাণ মল এবং জয়সাল মীরের রাজার কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। এমনিভাবে নিজ পুত্র সেলিমকে ১৫৮৪ সালে জয়পুরের ভগবান দাসের কন্যার সাথে বিবাহ দেন। এভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি রাজপুতদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগীতায় পরিপুষ্ট হন।

মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন

সম্রাট আকবর প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। বিশেষ করে নিজ সেনাবাহিনীকে অত্যাধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করে গঠন করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে তিনি এতটাই সফল হন যে, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতম বলে বিবেচিত হন।

রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি

এ নীতি অবলম্বন করে সম্রাট আকবর বহু রাজ্য করতলগত করেন। এগুলোর মধ্যে গুজরাট, বাংলা, সিন্ধু এবং রাজপুতনা অন্যতম।

বিদ্রোহ দমন নীতি

সম্রাট আকবরের শাসনামলে যেসব বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে, সেগুলো তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। সেসব বিদ্রোহের মধ্যে উজবেক, বাংলা ও মির্জা হাকীমের বিদ্রোহ অন্যতম।

উপসংহার

একজন শাসক হিসেবে আকবর নিঃসন্দেহে যোগ্য ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা লোভে অন্ধ হয়ে রাজ-ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'দ্বীনে ইলাহী' নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে তিনি ইসলামের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়ের রচনা করে ঘৃণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে রয়েছেন।

প্রশ্ন : ১১ : সম্রাট আকবরের জন্ম ও তার ক্ষমতায় আরোহণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর :

জন্ম ও পরিচয়

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দিতে আকবরের পিতা হুমায়ূন শের শাহের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এরপর ভারতবর্ষ হতে স্ত্রী হামিদা বানুসহ সিন্ধুর অমরকোর্টের হিন্দু রাজা রানা প্রসাদের রাজ্যে পলায়ন করেন। সেখানে নির্বাসিত জীবন যাপনকালে ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের জন্ম হয়। কথিত আছে, হুমায়ূন একটি মৃগনাভী বিতরণ করে উপস্থিত আমীরদের নিকট আশা ব্যক্ত করেন যে, তার পুত্রের যশ ও সুখ্যাতি সুগন্ধি মৃগনাভীর মতো যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিক জীবন

পিতা হুমায়ূনের মৃত্যুকালে আকবর তার অভিভাবক বৈরাম খানের সাথে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটি শহরে ছিলেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার পিতার অতি বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু বৈরাম খান নাবালক সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হন।

অভিভাবকত্বের প্রতি আকবরের অনীহা

কিশোর আকবর সিংহাসনে আসীন হলেও মূলত সে সময়ে তার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী অভিভাবক বৈরাম খানই সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বৈরাম খান শী'আ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা, জনগণের সাথে রূঢ় আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করেন। এ সমস্ত কারণে আকবর তার অভিভাবকত্বের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং তাকে পদচ্যুত করেন।

প্রশ্ন : ১২ : সম্রাট আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ও তা পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর। দ্বীনে ইলাহীর রীতিনীতি ও তার অসারতা প্রমাণ কর।

উত্তর :

ভূমিকা ঃ সম্রাট আকবরই ছিলেন মোঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ শাসক, সাহসী বীর, অনন্য সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন সেনাপতি এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে একজন সফল রাষ্ট্র

নায়ক। দীর্ঘ ৫০ বছর তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন। তবে সর্ববাদী নতুন ধর্ম "দ্বীনে ইলাহী" প্রবর্তন করে তিনি ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় রচনা করে চরম নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে রয়েছেন।

আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ও তার পরিবর্তন

সম্রাট আকবর প্রথমে একজন সরল বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। তখন তিনি আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় জানার প্রতিও তার আগ্রহ ছিল বেশ। প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায তিনি জামাতেই আদায় করতেন। এ উদ্দেশ্যে সাত দিনের জন্য সাত জন ভিন্ন ভিন্ন ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। হজ্বসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারেও তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন।

তবে তার এ ধর্ম-বিশ্বাস বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। শেষ পর্যন্ত তার ধর্মনীতির পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতার অন্ধমোহ এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা তাকে এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাবিত করে তোলে। বিশেষ করে ক্ষমতার প্রতি অন্ধমোহ এবং তার স্থায়িত্ব তাকে জ্ঞানহীন করে ফেলেছিল।

বহুজাতিক দেশ ছিল এ ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ধর্মমত এদেশে বিদ্যমান ছিল। ধর্মে ধর্মে বৈরিতা-বিদ্বেষ রাজ্যক্ষমতায় যে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে –এ আশঙ্কায় সম্রাট আকবর সদা শঙ্কিত ছিলেন। এ আশঙ্কা দূরীকরণ ও নিজ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে তিনি ধর্মসমূহের পারস্পরিক ব্যবধান উঠিয়ে সর্ববাদী একটি ধর্মের প্রবর্তন করেন। যার নামকরণ করেন "দ্বীনে ইলাহী"।

দ্বীনে ইলাহীর রীতিনীতি ও তার অসারতা

দ্বীনে ইলাহীর বেশ কয়েকটি নীতি :

(১) এ ধর্মের কালিমা ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবরু খলীফাতুল্লাহ"।

(২) জন্ম বার্ষিকী পালন এবং বিভিন্ন উৎসবে স্বধর্মীয় লোকজনকে ভোজনের আমন্ত্রণ করা আবশ্যক ছিল।

(৩) সাক্ষাতের সময় সালামের পরিবর্তে তার অনুসারীরা ভিন্নভাবে সম্ভাষণ জানাত। প্রথম ব্যক্তি বলত: "আল্লাহু আকবর" আর দ্বিতীয় ব্যক্তি "জাল্লা জালালুহু" বলে তার জবাব দিত।

(৪) মদ, জুয়া ও সুদ সে ধর্মে বৈধ ছিল।

(৫) আকবরকে সিজদা করা এবং দাঁড়ি মুণ্ডন করা বৈধ মনে করা হত।

(৬) পর্দার হুকুমকে রহিত করা হয়েছিল।

(৭) কেউ মুসলমান হতে পারবে না মর্মে ফরমান জারী করা হয়েছিল।

(৮) কসাই, জেলে, মুচি প্রভৃতি নিম্ন-পেশার লোকদের সাথে মেলামেশা পরিহার করার হুকুম জারী করা হয়েছিল।

(৯) অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান করা হত এবং সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বিধান ছিল।

(১০) ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ যাকাতকে রহিত করা হয়েছিল।

(১১) ইসলামে পঞ্চম স্তম্ভ হজ্বব্রত পালনে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল।

(১২) শূকর ও কুকুরের নাপাক হওয়ার হুকুমকে রহিত করা হয়েছিল।

(১৩) হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

এ ছাড়া সম্রাট আকবরের অনুসারীদের চারটি জিনিস– ধন, মান, সম্মান ও ধর্ম সম্রাটের জন্য উৎসর্গ করতে হত। এ ধর্মের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রথা অনুসরণ করা হত।

দ্বীনে ইলাহীর অসারতা

সম্রাট আকবর দিল্লীর মসনদে স্থায়ী হওয়ার মোহে এবং হিন্দুদের মনজয় করার লক্ষ্যে নিছক রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শরী'অত বিরোধী এবং হিন্দুয়ানী রীতি-নীতি চালু করেন। তার এ কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক দূরদর্শীতা বলে ব্যাখ্যা করা হলেও নিঃসন্দেহে তা ছিল উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শুধু তাই নয়, তার এ হেন কর্মকাণ্ডের কারণে সমগ্র সাম্রাজ্যেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুহাম্মাদ ইয়াযদী এ মর্মে ফতোয়া দেন যে, সম্রাট আকবর পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন; তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। পরবর্তী সময়ে সম্রাটের প্রিয়পুত্র ও সেনাপতি মানসিংহ প্রকাশ্য দরবারে এ ধর্মমতের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৩ : সম্রাট আকবরের মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন, বিদ্রোহ দমন ও তার প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস আলোচনা কর।

উত্তর :

মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন

সম্রাট আকবর প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রেই আমূল সংস্কার সাধন করেন। বিশেষ করে তিনি সেনাবাহিনীকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলেন। তিনি সেনাবাহিনীতে মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর সামরিক সংস্কারের প্রধান

বৈশিষ্ট্য ছিল মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন এবং সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন। একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি সামরিক কৃতিত্বের মাধ্যমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার ও বিদ্রোহ দমন

আকবর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন রাজ্য জয় করেন যেমন: গণ্ডোয়ানা, রাজপুতনা, গুজরাট, বাংলা ও সিন্ধু ইত্যাদি।

তার আমলে যেসব বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে সেগুলোকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। তার মাঝে উজবেক বিদ্রোহ, বাংলা হিদ্রোহ ও মির্জা হাকিমের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস

প্রথমে আকবর একজন সাদাসিধে সরল বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। তিনি আলেম সমাজ, পীর-বুযুর্গদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইলম ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সপ্তাহের সাতদিনের জন্য সাতজন ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। হজ্ব ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারেও অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

প্রশ্ন : ১৪ : আকবরের ধর্মনীতির পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : আকবরের ধর্মনীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট

আকবরের ধর্মনীতি পরিবর্তনের ব্যাপারে যে বিষয়টি বেশী প্রভাব বিস্তার করে তা হল, ক্ষমতার অন্ধমোহ এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। ক্ষমতার প্রতি অন্ধমোহ মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানহীন করে ফেলে।

বহুজাতিক দেশ ছিল এ ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ধর্মমত এদেশে বিদ্যমান ছিল। ধর্মে ধর্মে বৈরিতা ও বিদ্বেষ রাজক্ষমতায় যে কোনো সময় প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এ আশঙ্কায় আকবর শঙ্কিত ছিলেন। আর তার দৃষ্টিতে এ আশঙ্কা দূরীকরণের উপায় ছিল ধর্মসমূহের পারস্পরিক ব্যবধান উঠিয়ে সর্ববাদী একটি ধর্মের প্রবর্তন করা।

ভাববাদী মতাদর্শ নামের একটি দল বহু পূর্ব থেকেই এ দেশে ধর্মের ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে সব ধর্মের ভাবাদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে সব মানুষকে একই সূত্রে গেঁথে ফেলার কাল্পনিক স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। আকবরের সভাকবি আবুল ফযলের বাবা শেখ মুবারক ছিলেন ভাববাদী দর্শনের একজন প্রচারক।

আবুল ফযলও সেই চিন্তা-চেতনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল। সেই ভাববাদী মতাদর্শের চেতনার পক্ষে আকবরকে কাজে লাগাবার মানসে তারা অক্ষরজ্ঞানহীন সম্রাটকে একটি সর্ববাদী ধর্মের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং নিজেকে সকল ধর্মানুসারীদের পৌরহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করে ক্ষমতার মসনদ নিষ্কণ্টক করে তোলার জন্য এটি একটি মোক্ষম পন্থাবলে তারা তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত এ উভয়বিধ ক্ষমতা লিপ্সাই অক্ষরজ্ঞানহীন আকবরকে একটি ধর্ম সৃষ্টি করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। সকল ধর্মের সারবস্তু কি তা অনুধাবন করার জন্যই আকবর তার দরবারে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদেরকে আহ্বান জানাতেন এবং তাদের থেকে প্রত্যেক ধর্মের সারবস্তু অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। ধর্মগুরুরা আকবরের এ হেন উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে এটাকে পরধর্মের প্রতি আকবরের উদারনীতি মনে করে প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের সারবস্তু বর্ণনা করেন মুক্ত মনে। আর এভাবে আকবর তার নিজস্ব ধারণা অনুসারে যে ধর্মের যে বিষয়কে ধর্মের সারবস্তু মনে করেছেন সেগুলোকে সমন্বয় করে দ্বীনে ইলাহীর নকশা তৈরি করেন।

প্রশ্ন : ১৫ : দ্বীনে ইলাহী সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর : বহুবাজিত দেশ ছিল এ ভারতবর্ষ। হিন্দু, মুলমান, শিখ, শী'আ বহু ধর্মমত এদেশে বিদ্যমান ছিল। ধর্মে ধর্মে বৈরিতা ও বিবেধ যে কোনো সময় রাজক্ষমতায় প্রভাব ফেলতে পারে এ আশঙ্কায় সম্রাট আকবরের সভাসদগণ বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করে একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করল। তা হল, সকল ধর্মের পারস্পরিক ব্যবধান উঠিয়ে সর্ববাদী একটি ধর্মের প্রবর্তন করা। তাই আকবরের সভাসদগণের পরামর্শে সকল ধর্মের সারনির্যাস একত্রিত করে তার সমন্বয়ে একটি ধর্ম প্রবর্তন করে এর নাম দিলেন "দ্বীনে ইলাহী"। যার মূল মন্ত্র ছিল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ"।

মূলত তার সভাসদগণ চেয়েছিল সকল ধর্মানুসারীদেরকে পৌরহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করে ক্ষমতার মসনদকে নিষ্কণ্টক করা। কিন্তু তার এ নব আবিষ্কৃত ধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তৎকালীন উলামায়ে কিরাম বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তাদের আন্দোলনের পরে দ্বীনে-ইলাহী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ১৬ : হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে তাঁর পদক্ষেপগুলোর উপর আলোকপাত কর।

উত্তর :

সূচনা : দ্বিতীয় সহস্রাব্দে উম্মতের নিদারুন সঙ্কটময় মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা যাকে সমাজ সংস্কারকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনিই হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.। তিনি ছিলেন একই সাথে একজন মহান সমাজ সংস্কারক, যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, তাসাউফের তরীকা চতুষ্টয়ের বিখ্যাত শাইখ, শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার মূলোৎপাটনকারী, নববী আদর্শের মূর্তপ্রতীক এক মহা সাধক পুরুষ। তিনি আকবরের দ্বীনে ইলাহীসহ চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের প্রভাবে তদানিন্তন হিন্দুস্তানের বিপর্যস্ত ইসলাম ও মুসলিম সমাজের ত্রাণকর্তারূপে আভির্ভূত হন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবেক ৯৭১ হিজরী ১৪ই শাওয়াল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ভারতের অঙ্গরাজ্য পাঞ্জাবের সেরহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার মূল নাম আহমদ। পিতা শাইখ আব্দুল আহাদ ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর ২৮ তম মতান্তরে ৩১তম অধঃপুরুষ।

শিক্ষা জীবন

কুরআন শরীফ হিফয করার মাধ্যমে তার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। নিজ পিতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এরপর শিয়ালকোটে গমন করে মাওলানা শাহ কামাল কাশ্মিরীর কাছে দর্শন বিদ্যা; কালাম শাস্ত্র ও উসূলে ফিকহের উপর গভীর পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। এ ছাড়া শাইখ ইয়াকুব কাশ্মিরী থেকে ইলমে হাদীস এবং মাওলানা বদখশানী থেকে ইলমে তাফসীর ও ইলমে ফিক্হ শিক্ষা করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ধর্মীয় যাবতীয় শাস্ত্রে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

তাসাউফ চর্চা

বাহ্যিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধির প্রতিও মনোযোগ প্রদান করেন। প্রথমে তিনি নিজ পিতা শাইখ আবদুল আহাদ রহ.-এর কাছে আধ্যাত্মিক সাধনা করেন। উভয় তরীকায় পূর্ণতা অর্জন করে পর্যায়ক্রমে শাহ সিকান্দার ও

শাহ্ কামাল থেকে খিলাফত অর্জন করেন। এরপর নিজ পিতার ইন্তেকালের পর ১০০৭ হিজরীতে হজ্বের সফরকালে দিল্লীতে নকশবন্দিয়া তরীকার পৃষ্ঠপোষক খাজা বাকী বিল্লাহ রহ.-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে কঠোর মুজাহাদা করার পর তার কাছ থেকে নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার খেলাফত লাভ করেন।

কর্ম জীবন

আগ্রায় প্রথম শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে শুরু হয় তার প্রথম কর্মজীবন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি রাজকীয় অনাচারের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এরই সাথে জন সাধারণের নৈতিক, সামাজিক তথা সার্বিক অবক্ষয়ের বিষয়টিও তিনি লক্ষ্য করেন। এতে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীতা তিনি উপলব্ধি করেন প্রবলভাবে। কাজেই সে লক্ষ্যে তিনি আগ্রা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যান নিজ দেশ সেরহিন্দে। সেখানেও তাঁর শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্তু শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি শুরু করেন সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রম। আর এভাবেই তিনি সারাটি জীবন উম্মাহর সংশোধনের ফিকিরে অতিবাহিত করেন।

ইন্তেকাল

এ মহান মুজাদ্দিদ ও ত্যাগী পুরুষ ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর পদক্ষেপসমূহ

"নেতার পরিবর্তন নয়, নীতির পরিবর্তন চাই" –এ ছিল হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর সংস্কার আন্দোলনের মূল দর্শন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ফলে বেশ কয়েক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগে। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানসহ স্বার্থান্বেষী আলেম-উলামা, ভ্রষ্ট দরবারী চাটুকার, শী'আ সম্প্রদায় ও নাচেগানে মত্ত দরবারীরা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কার আন্দোলন রুখতে তারা তৎকালীন সম্রাট আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি) এর নিকট হযরত মুজাদ্দিদ রহ.-এর বিরুদ্ধে এ মর্মে অপবাদ দেওয়া হয় যে, "মুজাদ্দিদ রহ. জনগণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। তিনি এতটাই দাম্ভিক যে, কারো মতামতের তোয়াক্কা পর্যন্ত করেন না। সর্বপরি তিনি সম্রাটের রাজ্যশাসনের জন্য হুমকি স্বরূপ।"

তা ছাড়া তারা হযরত মুজাদ্দিদ রহ.-এর একটি লেখাকে বিকৃত করে হযরত আবদুল হক দেহলভী রহ.-সহ তৎকালীন প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের কাছে

প্রেরণ করে তাঁর বিরুদ্ধে "কাফির" (!) ফাতওয়া সংগ্রহ করে। সম্রাটকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে সেটি হাতিয়ার স্বরূপ তার নিকট পেশ করে। ফলে সম্রাট তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করেন।

কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদ রহ.-এর উত্তম চরিত্র-মাধুর্য দেখে এবং তাঁর মুখে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহের বলিষ্ঠ উপস্থাপনা শুনে কয়েদখানার বন্দিরা সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে তওবা করে হযরতের হাতে বাইয়াত হতে শুরু করে। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই কয়েদখানা পরিণত হয় ইবাদত খানায়। দুর্গপতি সম্রাটের নিকট এ মর্মে প্রতিবেদন পেশ করেন যে, "এ নবাগত বন্দির প্রভাবে এখানকার পশুগুলো মানুষে এবং মানুষগুলো ফিরিশতায় পরিণত হচ্ছে।" সম্রাট জাহাঙ্গীর এ প্রতিবেদন শুনে অভিভূত হন এবং হযরতকে মুক্তি দিয়ে বিরাট সম্মানের সাথে রাজ-দরবারে তলব করেন। হযরত মুজাদ্দিদ রহ. সেখানে সম্রাট ও দরবারীদের সামনে দ্বীনে ইলাহীর অসারতা প্রমাণ করেন এবং ইসলামের মূল ব্যাখ্যা ও আদর্শ উপস্থাপন করেন।

এ ছাড়া দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে তিনি আরও যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) উত্তম চরিত্রের নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং নিজে আমলের মাধ্যমে সুন্নাতের প্রচার ও প্রসার ঘটান।

(২) ওয়াজ-নসিহত ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে তিনি হক-বাতিলের সঠিক পরিচয় জনসম্মুখে তুলে ধরেন।

(৩) পত্রযোগে তিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, উলামায়ে কিরাম ও আমীর-উমারাদের নিকট ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তা ছাড়া পত্রে তিনি বাতিলকৃত বিভিন্ন আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যও আহ্বান জানান।

(৪) সেনাপ্রধান ও দরবারের আমীর-উমারাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আপন মতে দিক্ষিত করেন এবং তাদের দ্বারা সম্রাটকে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

(৫) বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে শী'আদের ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরেন এবং স্বার্থান্বেষী দুর্নীতিবাজ উলামায়েসূদের কঠোর সমালোচনা করেন।

(৬) সুন্নাত ও বিদ'আতের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন এবং সুন্নাতের সুফল ও বিদ'আতের কুফল বর্ণনা করেন। সাথে সাথে সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিদ'আতে হাসানার নামে ছড়ানো ফিতনার মূলোৎপাটন করেন।

(৭) সম্রাটের কাছে নিম্নোক্ত সাত দফা দাবী উত্থাপন করেন :

ক. সম্রাটকে সিজদা করার রীতি সম্পূর্ণরূপে রহিত করতে হবে।

খ. মুসলমানদেরকে গরু জবাই করার অনুমতি প্রদান করতে হবে।

গ. সম্রাট ও সভাসদদেরকে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

ঘ. শরী'আ বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ কাজির পদ পুনর্বহাল করতে হবে।

ঙ. বিদ'আত এবং সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

চ. ইসলাম বিরোধী সকল আইন রহিত করতে হবে।

ছ. জরাজীর্ণ বিধ্বস্ত মসজিদসমূহ সংস্কার এবং আবাদ করতে হবে।

উপসংহার

দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম বিরোধী যে সকল রীতিনীতি, প্রথা ও অপবিশ্বাস চালু হয়েছিল– যথাযথ ও সফল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. সেগুলোর মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন : ১৭ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর জন্মলগ্নে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর :

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর জন্মলগ্নে ভারতের অবস্থা

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর জন্মলগ্নে ভারতের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। উপমহাদেশে তখন চলছিল ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর চরম দুর্দিন। বহু ধর্ম প্রতিষ্ঠার ফলে ধর্মে ধর্মে সংঘাত আর সাম্প্রদায়িক কলহে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। সে দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে ক্ষমতার সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করার জন্য সম্রাট আকবর শোনাল সাম্যের বাণী। সে প্রচলিত সকল ধর্মের উপাদান মিশ্রিত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম হিন্দু ধর্মের উপাদানকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি করল 'দ্বীনে-ইলাহী'।

এর প্রভাবে ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন নিক্ষিপ্ত হল স্বার্থের আস্তাকুঁড়ে। ইসলামী মূল্যবোধ বলি হয়ে গেল ক্ষমতা লিপ্সার যুপকাষ্ঠে। ইরানি শী'আদের প্রভাবে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষাধারা রূপান্তরিত হল গ্রিক দর্শন ভিত্তিক শিক্ষাধারায়। সাধারণ জনগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। প্রাচ্যের বাতিল মতাদর্শ ও হিন্দু দর্শনের মিশ্রণে ইসলামের আধ্যাত্মিক ধারাও এক অভিনব ভ্রান্ত স্রোতে প্রবাহিত হতে লাগল।

বিদ'আত ও কুসংস্কারের ভয়াল থাবায় সুন্নতে নববী মৃতপ্রায় অবস্থার রূপ নিল। রাজদণ্ডের ভয়ে মানুষের উন্নত শিরগুলো প্রভুর পরিবর্তে রাজার পদতলে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে থাকল। সৃষ্টি হল এক ভয়াবহ ও করুন পরিস্থিতি। জন্ম নিল এক নব্য জাহেলিয়াত।

প্রশ্ন : ১৮ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-কে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল কেন? তার মুক্তি লাভের ঘটনা এবং মুক্তি লাভের পর ইসলামের কল্যাণে যেসব বিষয় আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনি সম্রাটের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন, সেগুলো উল্লেখ করে তার ফলাফল আলোচনা কর।

উত্তর :

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-কে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্তিদানের কারণ

সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পিতা সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত 'দ্বীনে-ইলাহী'র প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে তার ক্ষমতাকে আরো পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। ফলে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সংস্কার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে বন্দী করে গোয়ালিয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেয় এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু ইলমে ওয়াহীর প্রেরণায় উজ্জীবিত মহান ব্যক্তিত্বের ওই আন্দোলনকে জেল-জুলুম, হত্যার ভয় এমনকি কারারুদ্ধ করেও স্তব্ধ করতে পারে নি। তিনি দুর্গে বন্দি থেকেও অন্যান্য বন্দিদের মাঝে ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করতে লাগলেন। ইসলামের সঠিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার কথা ব্যাখ্যা করে তাদেরকে বোঝালেন। কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক তার বলিষ্ঠ উপস্থাপনা ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে কয়েদিরা তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে সংস্কারবাদী এ চেতনার দীক্ষা নিতে শুরু করে। চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, মদ্যপ, ঘাতক, খুনী, লুটেরা সবধরনের কয়েদি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অল্প দিনেই জীবনের গতিধারা পাল্টে ফেলে। কয়েদখানা পরিণত হয় ইবাদতখানায়। এদিকে তাঁকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সারা দেশে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। এভাবে কেটে যায় দুটি বছর।

কয়েদখানার এ পরিবেশ অবলোকন করে দুর্গপতি সম্রাটকে লিখে পাঠালেন,

"নবাগত এ বন্দির প্রভাবে এখানকার পশুগুলো মানুষে আর মানুষগুলো ফেরেশতায় রূপান্তরিত হচ্ছে।"

রিপোর্ট পাঠে সম্রাট ঘাবড়ে গেলেন। সাথে সাথে অভিভূতও হলেন। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে দিল্লী নিয়ে আসেন।

ইসলামের কল্যাণে তিনি সম্রাটের কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেন

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-কে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে রাজদরবারে নিয়ে আসা হল। রাজঅতিথি হিসেবে দরবারে আসার এ সুযোগকে তিনি কাজে লাগালেন। সম্রাটের সঙ্গে মতবিনিময়কালে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সকল অনাচারের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তিনি সম্রাটকে সতর্ক করে দিলেন এবং ইসলামের কল্যাণে কিছু জরুরি বিষয় আঞ্জাম দেওয়ার আবেদন জানালেন। বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

(১) সম্রাটকে সিজদা করার নীতি সম্পূর্ণরূপে রহিত করতে হবে।

(২) মুসলমানদের গরু জবাই করার অনুমতি দিতে হবে।

(৩) বাদশাহ ও তার সভাসদদেরকে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হবে।

(৪) শরইয়্যাহ বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কাজীর পদ পুনঃবহাল করতে হবে।

(৫) সকল প্রকার বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

(৬) ইসলাম বহির্ভূত সকল আইন রহিত করতে হবে।

(৭) ভগ্ন বিধ্বস্ত মসজিদসমূহ পুনঃসংস্কার করত সেগুলো আবাদ করতে হবে।

ফলাফল

ইসলামের কল্যাণে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. কর্তৃক এ সকল দাবি সম্রাট মেনে নেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে শাহী ফরমানও জারী করেন। আর এরই মাধ্যমে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর সংস্কার আন্দোলন সফলতার মুখ দেখতে শুরু করে। কিন্তু তাঁর এ সফলতা দরবারীদের সহ্য হল না। তারা ছলে-বলে-কৌশলে সম্রাটকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। তারা সম্রাটকে বোঝাল, এ লোকটির প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। তাতে সে যে কোনো সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে। তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া যায় না।

ফলে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পেলেও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে নিষেধ করে তাঁকে অতিথির সম্মানে সেনাবাহিনীর দ্বারা নজরবন্দি রাখা হল। কিন্তু এতে তিনি দমে যান নি বরং তিনি একে ইসলাম প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। প্রতিদিন বাদশাহর সাথে বৈঠক হত। তখন তিনি ইসলামের সকল ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আহার-অনুষ্ঠান এমনকি সুফীদের জটিল বিষয়গুলোও তিনি সম্রাটের কাছে তুলে ধরতেন। নজরবন্দি থাকাকালে সম্রাট ছাড়াও সেনাপ্রধান ও দরবারের আমীর

উমারাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র মাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে তারা তাঁর হাতের ফয়সালাই গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে আপন মতে দীক্ষিত করেন।

দরবারের সভাসদদের চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন করে প্রকৃত ইসলাম অভিমুখী করে দেওয়ার সূক্ষ্ম কৌশলে তিনি এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব পর্যন্ত রাজা ও কর্মচারীরা নকশবন্দিয়া তরীকার মুরীদ ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯ : বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদে এবং সুফিবাদের সংস্কারে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর অবদান সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর :

সূচনা : সম্রাট আকবরের ছত্রছায়ায় স্বার্থান্বেষী দরবারী উলামায়ে সূ ও কতিপয় মূর্খ লোকের প্রভাবে সৃষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ও বিদ'আতের ব্যাপকতার ফলে সুন্নতে নববী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে দ্বীনে ইলাহীর প্রভাব ও প্রাচ্যের বিভিন্ন বাতিল মতাদর্শের সংমিশ্রণের ফলে ইসলামের আত্মশুদ্ধির নির্মল ধারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নানা গোমরাহী। এ হেন সঙ্কটময় মুহূর্তে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সুন্নাহের প্রচার প্রসারের জন্য যথোপযুক্ত নানামুখী সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সূফীবাদের সংস্কারেও তাঁর অবদান অসরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদে

হযরতের গৃহিত কর্মসূচি

বিদ'আত ও কুসংস্কার নির্মূলের ক্ষেত্রে যে কার্যকর মূলনীতিটি গ্রহণ করেছিলেন, তা হল, সরাসরি বিদ'আতের বিরোধিতায় না গিয়ে সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর ব্যাপক প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এ উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত কর্মসূচি হাতে নেন :

(১) জনসম্মুখে সুন্নতের সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরেন এবং তার ফযিলত, উপকারিতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

(২) বিদ'আতের পরিচয় ও তার কুফল এবং এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উম্মতের সামনে তুলে ধরেন।

(৩) বিদ'আতে হাসানাহ ও সাইয়িআহ নামে বিদ'আতের শ্রেণী বিন্যাসকে প্রত্যাখ্যান করে সকল প্রকার বিদ'আতকে গোমরাহী বলে প্রচার চালান।

(৪) শরী'অতের আমলসমূহকে মর্যাদা ও গুরুত্ব হিসেবে শ্রেণীবিন্যাস করে ফরযকে সুন্নাতের উপর এবং সুন্নতকে নফলের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

(৫) রাসূলুল্লাহ সা.-এর সকল সুন্নতকেই দু'ভাবে বিভক্ত করেন। যথা–

(১) ইবাদত সংক্রান্ত। (২) দেশাচার বা অভ্যাসগত অর্থাৎ যা নবীজী সা. অভ্যাস হিসেবে এবং যা তিনি ইবাদত হিসেবে করেছেন, তার বিপরীত কিছু করাকেই তিনি বিদ'আতে মুনকার বলেছেন এবং এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য তিনি সার্থক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর যেসব আমল নবীজী সা. দেশাচার বা অভ্যাসগতভাবে করেছেন, সেগুলো অনুসরণকে সর্বোচ্চ সফলতা লাভের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেন।

সূফীবাদ সংস্করণে হযরতের গৃহিত কর্মসূচিসমূহ

১. তরীকতের উপর শরী'অতের গুরুত্বদান : কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে রচিত আত্মশুদ্ধির নির্মল ধারাটি তখনকার সূফীদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন ধর্মদর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে তা ক্রমশ কুরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত একটি ধারায় পরিণত হয়। আর তাতে আত্মমগ্ন হওয়াকে জাহেরী শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণের চেয়েও তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। এমনকি শরী'অতের প্রকাশ্য আহকাম মান্যকারী ব্যক্তিকে "মা'রিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ" বলে বিদ্রুপ করা হত।

অজ্ঞ সূফীদের অনেকেই নিজেদের সম্পর্কে মনে করত যে, তারা 'সায়ের ফিল্লাহ'-এর মাকাম ছাড়িয়ে 'ফানা ফিল্লাহ' এর স্তরে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া জ্ঞানহীন সূফীরা মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মা'রিফাত সংক্রান্ত "ওয়াহদাতুল উজূদ" এর অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে "সকল সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা নিহিত, স্রষ্টার পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই" –এ সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এ ছাড়া তারা আরো বহু বিভ্রান্তির শিকার ছিল। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এ ভ্রান্ত সূফীবাদের আমূল পরিবর্তন করেন।

১. তরীকতের উপর শরী'আতের গুরুত্ব দান

গোটা শরী'আতকে তিনি ইলম, আমল ও ইখলাস এ তিনভাগে ভাগ করেন। এরই সাথে শরী'অতের দৃষ্টিতে কোনটির গুরুত্ব কতটুকু এবং কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য, তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।

সুতরাং আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তারপর শরী'আতের ইলম অর্জন ও তদানুযায়ী আমল এরপর আত্মশুদ্ধির স্থান বর্ণনা করেন। তিনি তরীকত ও হাকীকতকে শরী'অতে তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ ইখলাসের

পূর্ণতা বিধানকারী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি নিজ পুত্রকে একপত্রে লিখেন, "একমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণই কাজে আসবে। সূফীদের মা'রিফাত তত্ত্বজ্ঞান যদি রাসূলুল্লাহ সা.-এর (নির্ধারিত শরী'অতের) অনুসরণে হয়, তা হলে ভালো; অন্যথায় তা নিষ্ফল হতে বাধ্য"।

২. "ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ"-এর অপব্যাখ্যার বিপরীতে "ওয়াহদাতুশ শুহূদ"-এর প্রচারণা

মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর وحدة الوجود-এর অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে অজ্ঞ সূফীরা সর্বেশ্বরবাদের যে শ্লোগান তুলেছিল, তিনি তার বিপরীতে সব কিছুই তাঁর থেকে সৃষ্ট শ্লোগানের প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন।

৩. তিনি তাসাউফের স্তর বিন্যাস করে প্রতিটির অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

উপসংহার

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর সময়ে প্রচলিত বহু বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করে তদস্থলে সুন্নাহের প্রচলন ঘটাতে সক্ষম হন। সাথে সাথে বিপদগামী সূফীদেরকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন।

প্রশ্ন : ২০ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা ও তার ফলাফল বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর : আধ্যাত্মবাদীদের মতাদর্শ

সূফীদের জ্ঞান দ্বীনতার কারণে যে সকল বিষয়ের উদ্ভব ঘটে তা নিম্নরূপ :

(১) কুরআন-সুন্নার ভিত্তিতে রচিত আত্মশুদ্ধির নির্মলধারা প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

(২) সকল ধর্ম-দর্শনের কিছু কিছু বিষয় আত্মস্থ করে নতুন এক ধারার উদ্ভব ঘটায়, যা কুরআন-সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিপরীত।

(৩) তারা মনগড়া আধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন হওয়াকে জাহেরী শরী'অতের বিধি-বিধান মেনে চলার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিত।

(৪) শর'ঈ বিধি-বিধান অনুসরণের বিষয়টি ছিল তাদের নিকট সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। ফলে শরী'আত ছেড়ে রিয়াজত মুজতাহাদার পিছনেই তারা মত্ত হয়ে পড়ে।

(৫) শরী'অত অনুসরণকারীদেরকে তারা মা'রিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ ও বাহ্যপূজারী বলত।

(৬) "সায়ের ফিল্লাহ"-এর মাকামে পৌঁছে "ফানা ফিল্লাহ"-এর মাকামে পৌঁছে গেছে বলে মনে করত। এ ধরনের আরো বহু বিভ্রান্তির শিকার ছিল তারা।

আন্দোলনের রূপরেখা :

(১) নববী আদর্শের অনুসরণ ছাড়া মা'রিফাত মূল্যহীন

মুজাদ্দিদ রহ. ঘোষণা করেন যে কর্মের সাথে নববী আদর্শের কোনো মিল নেই, তা যে নামেই হোক না কেন, তা নিষ্ফল হতে বাধ্য। নিজ সন্তানকে বলেন, "হে বৎস! কিয়ামতের দিন একমাত্র রাসূলের অনুসরণ কাজে আসবে। মা'রিফাত তত্ত্বজ্ঞান যদি সুন্নতে নববীর অনুসরণে হয় তা হলে ভালো, অন্যথায় তা নিষ্ফল হবে।" জুনাইদকে স্বপ্নে দেখে জনৈক ব্যক্তি অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সকল তত্ত্ব-রহস্য, মা'রেফাত নিষ্ফল হয়েছে। কেবল মাত্র রাসূলের অনুসরণ কাজে এসেছে।

(২) শরী'অতের প্রতি গুরুত্ব দান

সাধনা যদি শরী'অত মোতাবেক না হয়, তা হলে তা অবশ্যই নিষ্ফল হবে। শরী'অতের একটি মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা বা মাকরূহ থেকে বিরত থাকা জিকির ফিকির ও মুরাকাবা থেকে বহুগুণ উত্তম। প্রবৃত্তি দমন করার উদ্দেশ্যে শরী'অতের একটি বিধানকে অনুসরণ করা হাজার বছর ব্যাপী মুজাহাদা ও সাধনার চেয়ে উত্তম। শরী'অত পরিপন্থী সাধনা প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করে। যেমন হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের সাধনা প্রবৃত্তিকে দমন করে নি বরং লালসাকে বাড়িয়েছে।

(৩) মা'রিফতের গুরুত্ব শরী'অতে কতটুকু

সুফীবাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন কাজের গুরুত্ব কতটুকু, তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ১. সর্বপ্রথম আকাইদ ও বিশ্বাসের পরিশোধন অপরিহার্য। (২) এরপর শরী'অতের হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব জেনে তা আমল করা আবশ্যক। তৃতীয় নম্বারে হল আত্মশুদ্ধি। সুতরাং উপর্যুক্ত দুটি বিষয় অর্জিত না হলে আত্মশুদ্ধি অসম্ভব।

(৪) মা'রিফাত শরী'অতের একাংশের পরিপূরক

গোটা শরী'অতকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন : (ক) ইলম (খ) আমল (গ) ইখলাস। এ তিনটি বিষয়ের সমন্বিত রূহ হল শরী'অত। আর শরী'অতের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। দুনিয়া ও আখেরাত এর সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হল শরী'অত। আর মা'রিফাত হল শরী'অতের তৃতীয় বিষয় ইখলাসের পূর্ণতা বিধানকারী।

(৫) ওয়াহদাতুল উজূদের অপব্যাখ্যার বিপরীতে ওয়াহদাতুশ শুহূদের প্রচারণা

জ্ঞানহীন সুফীরা মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মা'রিফাত সংক্রান্ত ওয়াহদাতুল উজূদের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে সকল সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা নিহিত, স্রষ্টার পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাসে তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের "হামাহ উসত" (সর্বত্রই তিনি) এ শ্লোগানের বিপরীতে তিনি "হামাহ আয উসত" (সবকিছুই তিনি) এ প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত থেকে রক্ষার প্রয়াস চালান। (সকল সৃষ্টিই এক শ্রেণীভুক্ত, তারা কেউই স্রষ্টা নয় বরং সকলেই অন্য কর্তৃক সৃষ্ট, স্রষ্টা পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান)।

সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

এভাবে আধ্যাত্ম সাধনার স্তর বিন্যাস করে কোন স্তরের কি হুকুম, তা সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়ে একদিকে যেমন তিনি সাধকদেরকে বিভ্রান্তির হাত হতে রক্ষা করার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন, তেমনিভাবে সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত সুফীদের প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বলতে গেলে দিকভ্রান্ত সূফীদেরকে তিনি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক একটি গতিশীল ধারায় প্রবাহিত করেছেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ২১ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর পরিচয় কি? তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ধারাগুলো কি ছিল? বিস্তারিত আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার পূর্ণ অনুসারী ও তাঁর মানসপুত্র। উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোকিত পথে নিয়ে আসার পিছনে এবং তাদের মধ্যে নববী আদর্শের চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁর আবদান ছিল অপরিসীম।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেদ ১১১৪ হিজরীর ৪ শাউয়াল বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সময় উত্তর ভারতে অবস্থিত তাঁর নানাবাড়ি মুযাফফরনগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ, উপাধি আবুল ফাইয়াজ, ঐতিহাসিক নাম আলীমুদ্দীন। তবে তিনি ওয়ালী উল্লাহ নামেই জগদ্বিখ্যাত। তাঁর পিতা শাইখ

আব্দুর রহমী বংশগত দিক থেকে হযরত উসমান রাযি.-এর বংশধর। মতান্তরে হযরত উমর রাযি.-এর বংশধর এবং তাঁর মাতা ইমাম মূসা আল-কাযিমের বংশধর।

শিক্ষা ও কর্মজীবন

৫ বছর বয়সে তিনি মক্তবে ভর্তি। ৭ বছর বয়সে কুরআন মাজীদ হিফয করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, তাফসীর, তর্কশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৪ বছর বয়সে নিজ পিতার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং ওই বৎসরই তাঁর বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়।

এর মাত্র দুই বৎসর পর তাঁর পিতার ইন্তেকালে পর তিনি মাদরাসায়ে রহীমিয়্যায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ বার বৎসরকাল অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়ের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতন দেখে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মুসলিম জাতিকে প্রচলিত অন্ধত্ব ও গোমরাহী থেকে বাঁচাতে হলে তিনটি বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

(১) যুক্তিদর্শন। (২) আধ্যাত্মিক দর্শন। (৩) ইলম বির রিওয়াইয়াহ।

কেননা মুসলমানরা তখন গ্রিক দর্শনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। তাই সমাজকে এ রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য এ শাস্ত্র শিক্ষা করা ছিল একান্ত প্রয়োজন। এমনকি তারা কুরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনাকে সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করত। কাজেই এ বিষয়ের সঠিক ধারণা অর্জন করাও ছিল একান্ত আবশ্যক। আর যুক্তিদর্শন ও আধ্যাত্মিক দর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার জন্য আবশ্যক ছিল ইলম বির রিওয়াইয়াহর প্রজ্ঞা অর্জন করা।

হেজাজ সফর ও তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি

হযরত শাহ সাহেব রহ. ইলমে দ্বীন হাসিলের প্রবল আগ্রহ বুকে নিয়ে সংস্কার আন্দোলনের জন্য ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্রে স্বাধীনভাবে ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১১৪২ হিজরীতে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানে দু'বছর অবস্থান করে শাইখ আবু তাহের ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম থেকে ইলমে হাদীস অধ্যায়ন করেন। অবশেষে শাইখ আবু তাহের রহ. থেকে তাসাউফের খিলাফত লাভ করে ১১৪৪ হিজরীতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার পর তাঁর সংস্কার আন্দোলনের জন্য দুটি মূলনীতি নির্ধারণ করেন।

১. কুরআনে কারীমের ব্যবহারিক দর্শন।

২. অর্থনৈতিক ভারসাম্য।

রচনাবলী

তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

ইন্তেকাল

এ মহামনীষী ৬১ বছর বয়সে ২৯শে মুহাররাম ১১৭৬ হিজরী যোহরের নামাযের সময় ইন্তেকাল করেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর সংস্কার আন্দোলনের ধারাসমূহ

তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বর্তমান শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে শরী'অতের খেলাফত ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো। এ দাবিকে সামনে রেখে তিনি তাঁর আন্দোলনের যে কর্মসূচি পেশ করেন, তাকে মোটামুটি দশটি ধারায় বিভক্ত করা যায় :

১. কুরআন-সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তখন ছিল বস্তুবাদ বিকাশের সূচনালগ্ন। ইউরোপে বিকশিত বস্তুবাদের ঢেউ সবেমাত্র ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। বস্তুবাদীরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তৈরি অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যকার জাগতিক সফলতার মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে সহজেই বিভ্রান্ত করছিল মুসলিম উম্মাহকে। এ অবস্থা দেখে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার আলোকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার সয়লাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা খুব কঠিন হবে। তাই তিনি কুরআন ও সুন্নাহে উল্লেখিত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, নগর উন্নয়ননীতি ইত্যকার বিষয়কে সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করেন এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তা মানুষের স্বভাবধর্মের খুব কাছাকাছি বরং তা নব্য আবিষ্কৃত যে কোনও চিন্তা-ধারার চেয়ে সর্বাংশে উত্তম।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও সুন্নাহকে যুগসম্মতভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি ইসলামের সনাতন বা মূল ধারা থেকে মোটেও সরে যান নি।

২. শিক্ষানীতির সংস্কার

বাদশাহ হুমায়ূনের আমলে ভারতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রিক দর্শনের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। শাহ সাহেব রহ. সর্বপ্রথম কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে সিলেবাসে [পাঠ্যসূচিতে] আমূল পরিবর্তন আনেন।

৩. মুসলিম জাতির আকীদা সংশোধন ও কুরআন মাজীদের প্রতি আহ্বান

সম্রাট আকবর প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে মুসলমানদের ঈমান আকীদার যে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, হযরত শাহ সাহেব তা সংশোধনের জন্য ব্যাপকভাবে কুরআন মাজীদের দাওয়াত জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এর অংশ হিসেবে সর্বপ্রথম ফার্সি ভাষায় কুরআন মাজীদের তরজমা করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়ে যান।

৪. হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার-প্রসার

হাদীস ও সুন্নাহর প্রতি অবহেলার কারণে ভারতে যে শির্ক ও বিদ'আতের সয়লাব দেখা গিয়েছিল, হযরত শাহ সাহেব রহ. তার মূলোৎপাটনের জন্য সিহাহ সিত্তাহসহ বিভিন্ন হাদীস শরীফের কিতাবের দরসদান শুরু করেন।

৫. যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন মজীদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন এবং সুন্নতে নববীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা

একশ্রেণীর মানুষের ধারণা হল, ইসলামের বিধানকে যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। শাহ সাহেব রহ. তাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে এ কাজকে তাঁর বিপ্লবী কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন।

৬. ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ও তার সভ্যতা প্রমাণ এবং বিরুদ্ধবাদীদের সমুচিত জবাব

শাহ সাহেব তাঁর লিখিত "ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء" নামক গ্রন্থে খিলাফতের সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়ে তাতে বিরুদ্ধবাদীদের সকল ধারণা খণ্ডন করেন।

৭. শ্রমজীবিদের উপর থেকে অত্যাধিক চাপ রহিত করা এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন

শ্রমিকদের উপর থেকে অতিরিক্ত চাপ রোধ করা ব্যতিরেকে সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে না –এ সত্যকে উপলব্ধি করে শাহ সাহেব রহ. কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শ্রমনীতিকে মুসলমানদের জন্য আদর্শ বলে বর্ণনা করেন।

৮. উম্মাতে মুহাম্মাদীর সর্বস্তরের জনগণের প্রতি সংশোধনের আহ্বান

হযরত শাহ সাহেব রহ. দরস-তাদরীসের পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও তার ব্যাধি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি সমাজের সকল স্তরের রোগ সম্পর্কে অবগত হয়ে সকলকে সংশোধনের প্রতি আহ্বান জানান।

৯. শিক্ষা ও তারবিয়তের মাধ্যমে
যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করা

এমন একদল যোগ্য ও সচেতন উত্তরসূরী তৈরির ব্যাপারে শাহ সাহেব রহ. ছিলেন যথেষ্ট তৎপর, যারা পরবর্তীকালে তার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং তার তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেন শাহ আবদুল আযীয, শাহ ইসহাক, মুহাম্মদ বেলায়েত আলী, সাইয়িদ আহমদ শহীদ, সাইয়িদ ইসমাইল শহীদ রহ. প্রমুখের মতো মহান ব্যক্তিবর্গ।

১০. সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের
কবল থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা

সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর ভারতে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তা ছিল মুসলমানদের জন্য খুবই বিপদজনক। শাহ সাহেব মুসলিম জাতিকে ওই দুর্যোগ-দুঃসময় থেকে উদ্ধারের জন্য জনগণের মাঝে জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি করেন।

উপসংহার

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মহান সংস্কারক, এ উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রসেনানী। তাঁর বিপ্লবী কর্মসূচির এ ধারাগুলো তিনি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন।

প্রশ্ন : ২২ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁর রাজনীতিতে যোগদানের কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর : শাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২১নং প্রশ্নে দ্রষ্টব্য।

রাজনীতিতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.
এর যোগদানের কারণ

ভূমিকা : হিজরী দ্বাদশ শতকে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ একেবারে নড়বড়ে হয়ে পড়ে। সম্রাটদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল এর অন্যতম কারণ। সাথে সাথে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব পৃথিবীকে বস্তুনির্ভর বিলাসী জীবনের প্রতি অভ্যস্ত করায় মানুষ ক্রমান্বয়ে নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে। বস্তুবাদী এ চিন্তা-চেতনার ঢেউ ইউরোপের গণ্ডি পেরিয়ে যখন উপমহাদেশের মাটিতে আঘাত হানতে শুরু করেছিল, তখনই মহামনীষী হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. আবির্ভূত হন।

শাহ সাহেবের রাজনীতিতে যোগদানের কারণসমূহ

(ক) আমীর-উমারাদের মাঝে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা

হিজরী দ্বাদশ শতকে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। শুরু হয় রাজ্যের আমীর-উমারাদের মাঝে ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। ফলে রাজ্যময় ছড়াতে থাকে বিদ্রোহের দাবানল। ৬০ বছরের ব্যবধানে বদল হয় দশ দশজন শাসক। অন্যায়-অবিচার ও বিদ্রোহ সেনাবাহিনীর সুশৃঙ্খল ভীতকে ক্রমশ দুর্বল করে দেয়। সম্রাটের বিলাসিতার সুযোগে ইরানী-তুরানী আমত্যবর্গ এতটাই প্রবল হয়ে উঠে যে, তারাই মোঘলদের ভাগ্য নির্ধারক বনে যায়।

(খ) মুসলমানদের জন্য দুটি ভয়ঙ্কর আন্দোলন

আলমগীরের জীবদ্দশায়ই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি ভয়ঙ্কর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। একটি পাঞ্জাবের শিখ আন্দোলন। অপরটি দক্ষিণ ভারতের শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা আন্দোলন। আলমগীর নিজ জীবদ্দশায় এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করলেও তার মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল নিয়ে পরবর্তী আমীরদের আন্দোলনের সুযোগে শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজা রামের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি দুর্জেয় হয়ে উঠে। এমনকি সে ১৭৫৭ সালে দিল্লী দখল করে নেয়।

(গ) রাজপুত ও জাঠদের বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের আমলে রাজপুতগণ মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে একটি মজবুত সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। যার প্রভাবে মোঘল প্রশাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এদের ক্রমবর্ধমান উন্নতিও মোঘল প্রশাসনের জন্য ছিল বিরাট হুমকি। দিল্লী ও আকবরাদে তারা দুটি দুর্গ দখল করে নিয়ে নির্বিঘ্নে পৈশাচিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এরূপ একটি বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল।

(ঘ) শিখ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ

১১২৫ হিজরী গৌড় গোবিন্দ সিং ধর্ম-ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দান করেন। ১১২৭ হিজরীতে লক্ষণদাস বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে ফাতদারাস, সাচ্চাপদশা ও সাহারানপুর থেকে শুরু করে সাটলেজ নদী থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত শহরগুলো অধিকার করে নেয়। শিখদের এ অগ্রযাত্রা উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে ফেলে।

(ঙ) শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্ব

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আদের মাঝে বৈরীভাব হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম থেকেই শুরু হয়। বহু আকীদাগত বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে, তর্কযুদ্ধ, বাকযুদ্ধ, পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি ও লাঠিযুদ্ধ ছিল ভারত উপমহাদেশের সাধারণ ব্যাপার।

(চ) ইরানদের লুণ্ঠন ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

সম্রাট মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে ইরান সম্রাট নাদির শাহের ভরত আক্রমণ উপমহাদেশের বুক থেকে মোঘল পরিবারের পতাকা ও ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকু ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়।

নাদির শাহের রাজকোষে অর্থসঙ্কট দেখা দিলে তা পূরণের জন্য ১৭৩৮ সালের মার্চ মাসে ভারত অভিযান শুরু করেন। ১৭৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি দিল্লী দখল করে নেন। অবশেষে ১৭৩৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীর রাজকোষ শূন্য করে ৭০ কোটি রুপি নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

(ছ) ইংরেজদের বিহার ও বাংলায় আধিক্য বিস্তার

১৬০০ সালে বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে উপমহাদেশের রাজনীতিতে ইংরেজদের অনুপ্রবেশই ছিল শাহ সাহেবের রাজনীতিতে প্রবেশের অন্যতম কারণ। মারাঠা, শিখ ও জাঠদের সাথে সন্ধি করে ক্রমেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে।

অবশেষে বঙ্গদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং মীরজাফর, উমিচাদ, রাজ বল্লভ ও রায়দুর্লভ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে ১৭৫৭ সালে পলাশীল আম্রকাননে পরাজিত করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় নিজেদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।

(জ) অর্থনৈতিক দুরবস্থা

অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের চরম বিশৃঙ্খলা ও অসৎ রীতিনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সেনাবাহিনী তাদের নির্ধারিত বেতন না পাওয়ায় নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন চালায়। ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো ভেঙে পড়ে।

(ঝ) হিন্দু-মুসলিম আত্মঘাতী সংঘর্ষ

পূর্ব থেকেই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ ভারতের একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছিল। ১৬৫৬ সালে একক হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মানসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় শিবজী মেলার। ফলে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ আবার দানা বাঁধতে শুরু করে; কোথাও কোথাও তা আত্মঘাতী সংঘর্ষে রূপ নেয়।

(ঞ) ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ

উপমহাদেশে পূর্ব থেকেই বহু শ্রেণীর মানুষ বসবাস করত। ফলে মুসলমানদের সমাজে অনুপ্রবেশ করে বহু হিন্দুয়ানী প্রথা। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে শী'আদের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনের দরুন এ সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। সর্বত্র অবৈধ রেওয়াজ, কবরপূজা, নজর-নেওয়াজ ইত্যাদির সয়লাব চলতে থাকে। এভাবে মুসলমানরা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ রহ. সমাজের এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন ব্যতীত এসব সংকট থেকে উত্তরণের অন্য কোন পথ নেই। তাই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

উপসংহার

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ রহ. ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর আদর্শের অন্যতম উত্তরাধিকারী ও মানস সন্তান। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মাঝে আদর্শিক চেতনার উৎস।

প্রশ্ন : ২৩ : শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ রহ.-এর রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : বহুজাতিক দেশ ভারতে মুসলিম আধিপত্য যখন পতনোন্মুখ এবং ইউরোপীয় বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ধাক্কায় ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস যখন টলটলায়মান, ঠিক তখনি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ রহ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনে দীর্ঘ অধ্যায়ন ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ইসলামী আদর্শই হতে পারে আগত দিনে ভারতবর্ষের মানুষের জন্য সুস্থ রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকাশের একমাত্র নিয়ামক; একমাত্র আদর্শের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ঠেকানো যেতে পারে ইউরোপীয় বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শনের ধ্বংসাত্মক সয়লাব। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক-চারিত্রিক দিকগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন তীব্রভাবে। মৃতপ্রায় মুসলিম উম্মাহের মাঝে ইসলামী জাগরণের নতুন জোয়ার সৃষ্টির জন্য তিনি পরোক্ষ রাজনীতির পাশাপাশি প্রত্যক্ষ রাজনীতির যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, মূলত সেগুলোই পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের মুসলিম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ রহ.-এর রাজনৈতিক কার্যক্রম

মোঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের আন্ত ও বহিঃশক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজন ছিল সমাজে সর্বত্র দ্বীন তথা সংস্কার ও পুনর্গঠন। সে উদ্দেশ্যে তিনি যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন, তা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল।

(১) চিন্তাধারা বিনির্মাণ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম।

(২) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম।

(এক) পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম : রাজনীতির মূল কথা হল আদর্শভিত্তিক দেশ পরিচালনার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে জনমত তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে সফলতার মূল ভিত্তি হল দুটি।

(১) নির্ভুল ও পরিমার্জিত আদর্শ।

(২) সেই আদর্শের সফল বাস্তবায়ন। আর সফল বাস্তবায়নের পূর্ব শর্ত হল উক্ত আদর্শের প্রতি অনুরক্ত একটি দল এবং বলিষ্ঠ, প্রত্যয়ী ও নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী গঠন করা। এ উদ্দেশ্যে তার গৃহিত কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

ক. ইসলামী শরী'আর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান : ইসলামী শরী'আর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান ব্যতীত সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। তাই তিনি একটি দলকে হাতে কলমে এর শিক্ষা দেন।

খ. তাসাউফের শিক্ষাদান : অস্ত্রের বলে হুকুমত উচ্ছেদ করা যেতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের সংস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত নতুন সরকার টিকিয়ে রাখা যায় না। এ সত্যটি উপলব্ধি করে তিনি তাসাউফকে রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর উক্ত দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাসাউফে দিক্ষিত করেন।

গ. ওয়াজ-নসীহত ও গ্রন্থ প্রণয়ন : জনগণের মানসিকতা তৈরির জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ-নসীহত শুরু করেন। তিনি তার বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনাকে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেন।

(দুই) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম : একটি নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি তার রাজনৈতিক কার্যক্রমকে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট হন। সে উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেন :

(ক) মোঘল সম্রাটদের নিকট পত্র প্রেরণ : তখনকার বিলাসী সম্রাটদের নিকট তিনি উপদেশ সম্বলিত বহু পত্র প্রেরণ করেন। এসব পত্রে তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ মেধার আলোকে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন ক্রমান্বয়ে পতনের দিকে ধাবিত হওয়ার মূল কারণ ও পতনোন্মুখ পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার লাভের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে জরুরি পরামর্শ প্রদান করেন। সমকালীন সম্রাটকে একপত্রে তিনি লিখেন–

১. জাঠদের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য তাদের অধিকৃত অঞ্চল ও দুর্গগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. খালেসার পরিসীমা বিস্তৃত করে দিল্লীর আশপাশকে খালেসার জন্য বর্ধিত করতে হবে।

৩. বড় বড় আমীর বাছাই করে তাদেরকে জায়গীর দিতে হবে। ছোটদের মনসবদারী দিতে হবে নগদ মূল্যে।

৪. যারা কোনো হাঙ্গামায় মারাঠাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে, তাদেরকে জায়গীর, মনসব ও রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।

৫. সুশৃঙ্খলভাবে সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করতে হবে।

৬. মুসলমান বাদশাহ ও আমীরগণকে অবৈধ আরাম-আয়েশে লিপ্ত না হয়ে অতীত পাপমুক্তির জন্য সরল অন্তরে তওবা করতে হবে এবং পরবর্তী জীবনে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

খ. আহমদ শাহ আবদালীকে দিল্লীতে আনয়ন : মারাঠাদের শক্তি নিঃশেষ ও ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের সঙ্কটমুক্ত করার লক্ষ্যে শাহ সাহেব রহ. আফগান শাসক শাহ আবদালীকে ভারতে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার আহ্বান জানান। ১৭৫৫ সালে আবদালীর ভারত অভিযান শিখ ও মারাঠা শক্তিকে চরমভাবে বিধ্বস্ত করে। ফলে মোঘল সম্রাটদের পুনরায় রাজ্য ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার সুযোগ আসে।

গ. জিহাদের প্রশিক্ষণ দান : শাহ সাহেব জানতেন যে, জ্ঞান ও সাহিত্য দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করা যায়; কিন্তু সাম্রাজ্য জয় করা যায় না। তাই তিনি নিজ শিষ্যদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সুসংঘবদ্ধ বাহিনীতে পরিণত করেন।

ঘ. মজবুত সংগঠন : শাহ সাহেব রহ. একযুগ সাধনার পর তার স্বহস্তে গড়ে তোলা মহান জামাতের সাহায্যে একটি মজবুত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থির করেন। তার একটি কেন্দ্রীয় পরিষদও গঠন করেন এবং এর শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে দেন। এভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. কর্তৃক একটি শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী হর. উপমহাদেশের এক কঠিন ক্রান্তিকালে আবির্ভূত হয়ে ইসলামী রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করেন।

প্রশ্ন : ২৪ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত কর।

উত্তর : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর আন্দোলনের ফলাফল

তাঁর আন্দোলনের ফলাফল সুদূর প্রসারী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হয় তাঁর থেকে এবং শেষ হয় এক শতাব্দি পর। এ এক শতাব্দিকালের মধ্যে এ আন্দোলনের পুরোভাগে তিনজন ইমাম বা জাতীয় নেতার আবির্ভাব হয় এবং একটি জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) ইমাম ওয়ালী উল্লাহ ১৭৩১-১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

(২) ইমাম শাহ আবদুল আযীয রহ. ১৭৬৩-১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

(৩) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. ১৮২৪-১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ।

শতাব্দিকাল ব্যাপী এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ব্যক্তি গঠন, জিহাদের প্রশিক্ষণদান ও সংগঠনের মধ্য দিয়েই শেষ।

আন্দোনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ইমাম মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-এর নেতৃত্বে ১৮৩১ সালে। এ সময় থেকেই শুরু হয় নিয়মিত ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম। অনেক রক্ত ঝরিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজদের কুটকৌশল ও আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখ থেকে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয় বুঝেই আন্দোলনকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করা হয়। ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির খাতে।

উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান রহ. এ আন্দোলনে তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন। তৃতীয় পর্যায়ের এ আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারত উপমহাদেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়।

ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের আগমন ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎপরতা

প্রশ্ন : ২৫ : ভারতবর্ষে আরবদের আগমন ও ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর : ভারতবর্ষে আরবদের আগমন

(১) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় রাসূল সা. কর্তৃক ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র এক শতাব্দীর মাঝে মুসলমানগণ ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত দখল করে ইসলামের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন।

(২) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মালাবারে মুসলমান আরব ব্যবসায়ীগণ আগমন করেন।

আরবদের আগমনে ভারতবর্ষে ইসলামের প্রভাব

মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এর সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে তা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরীর বিজয় ও চৌহান রাজা পৃথিরাজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসন বুনিয়াদ লাভ করে। মুসলিম সুলতান ও বাদশাহগণ ন্যায় ও ইনসাফের শাসন দ্বারা এদেশে শান্তি সমৃদ্ধির জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের সংমিশ্রণে ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছিল এক জান্নাতি আবাসভূমিতে। ফলে অমুসলমানগণ দলে দলে ইসলামের সুশিতল ছায়াতলে দীক্ষিত হতে থাকে।

আরবদের সম্পর্কে কয়েক জনের অভিমত

(১) প্রখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক বলেন, ভারতবর্ষে বলপূর্বক ইসলাম বিস্তার করা হয় নি। কারণ, ইতিহাসে অমুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের কোনো নজীর নেই।

(২) স্যার থমাস বলেন, সওদাগর ও ধর্মপ্রচারকদের আত্মত্যাগ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

প্রশ্ন : ২৬ : ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের আগমন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক তৎপরতার বিবরণ দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : ভারতবর্ষে বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত ছিল। এদেশের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কথা রূপকথার মতো বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিল। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করতে আগমন করত।

আরবদের আগমন

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে আরবদের আগমন শুরু হয়। বিভিন্ন ধরনের মসলা, উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র, সুগন্ধি ও কাঁচামালের জন্য সমুদ্র পথে আরবরা ভারতবর্ষে আসত। ইসলামের আবির্ভাবের পর হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফতকালে পারস্য বিজয়, ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতবর্ষের সাথে ভারতবর্ষের সাথে আরবদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ব্যবসার পাশাপাশি ইসলাম প্রচারও ছিল আরবদের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে উপমহাদেশের পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান, দেবলসহ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে তাদের ব্যাপক আগমন ঘটেছিল।

তুর্কীদের আগমন

আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামলে অর্থাৎ সিন্ধু অভিযানের প্রায় আড়াই শতাব্দী পর নবদীক্ষিত তুর্কী মুসলমানগণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

পর্তুগীজদের আগমন

১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ইমানুয়েলের পৃষ্ঠপোশকতায় ভাস্কোদাগামা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পার হন এবং আরব নাবিকদের সহযোগিতায় ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে মে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। এরপর থেকে এদেশে পর্তুগীজ বণিকগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করে। তারা সর্বপ্রথম ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে গোয়াতে তাদের কুঠি স্থাপন করে এবং ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে তা বাংলায় স্থানান্তরিত করে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজরা তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে তারা ব্যবসার রীতিনীতি উপেক্ষা করে এ দেশের জনগণের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে এবং সরকারী শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। ফলে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে কাশিম খান তাদেরকে হুগলী থেকে এবং শায়েস্তাখান তাদেরকে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ থেকে চিরতরে বিদায় করে দেন।

ওলন্দাজদের আগমন

হল্যাণ্ডের একদল বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে "ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী" গঠন করে ভারতবর্ষে আগমন করে। ওলন্দাজরা এ দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিস বিদেশে রপ্তানী করত। ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে মসলিপট্টমে এবং ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে পুলিকটে কুঠি স্থাপন করে। জনবল ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে একসময় তাদের বাণিজ্য মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় সীমিত হয়ে পড়ে।

দিনেমারদের আগমন

ডেনমার্কের অধিবাসীরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে "দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠন করে ভারতে আগমন করে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করতে না পেরে ১৭৪৫ সালে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠিগুলো বিক্রি করে উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়।

ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ফরাসি সম্রাট চতুর্থ লুই এর রাজত্বকালে তারই অর্থসচিব কোলবার্ট "ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠন করেন। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঁ-সোয়া ক্যারো সর্বপ্রথম সুরাটে বাণিজ্য কুঠির স্থাপন করেন। এরপর বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক কুঠির

স্থাপন করেন এবং পুরোদমে ব্যবসা চালিয়ে যান। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে কোম্পানীর অর্থবল হ্রাস পেলে তা পুনর্গঠন করে ব্যবসার গতি ফিরিয়ে আনা হয়। সর্বশেষ ১৬৭৪ সালের পরে ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে টিকে থাকার প্রশ্নে তারা ক্রমশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে।

বৃটেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের সফল নৌ অভিযান ও সমুদ্র বাণিজ্যে ইংরেজরা অনুপ্রাণিত হয়। অপরদিকে র‍্যালফফীচ এবং জন মিনডেন্‌হল প্রমুখ ইংরেজ পর্যটকদের বর্ণনায় ভারতবর্ষের অতুলনীয় বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্যের কথা ইংরেজরা জানতে পারে। ফলে প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করার জন্য লণ্ডনে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি বণিক দল গঠিত হয়। তারা রানী প্রথম এলিজাবেথের নিকট থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি সনদ নিয়ে উপমহাদেশে আগমন করে। এরাই ইতিহাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত। ইংরেজ বণিকগণ এদেশে আসার পর প্রধানত দুই ধরনের তৎপরতা চালায় যথা– (১) ব্যবসায়িক তৎপরতা। (২) রাজনৈতিক তৎপরতা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়িক তৎপরতা

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. বিভিন্ন স্থানে কুটি স্থাপন ও এদেশের সরকারের অনুমোদন লাভ।

খ. অপরাপর বণিকদের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা।

বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন ও সরকারের অনুমোদন লাভ

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের রাজা ক্যাপটেন হাকিন্সকে জাহাঙ্গীর দরবারে প্রেরণ করেন। তার আবেদনক্রমে সম্রাট ইংরেজদেরকে সুরাটে একটি কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জেমস স্যার টমাসরোকে জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজ দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজদরবারে অবস্থান করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বণিকদের জন্য কিছু অলিখিত সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেন। ফলে ইংরেজরা সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পুরোদমে ব্যবসা চালু করে। অন্যদিকে তারা ব্যবসার সুবিধার্থে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পাটনা, কাশিম বাজার, ঢাকা, রাজমহলসহ গোটা উপমহাদেশে কুঠি স্থাপনে সক্ষম হয়।

উপসংহার : বিদেশী বণিকরা ব্যবসার নামে এ উপমহাদেশে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করতে শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে তারা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকে।

প্রশ্ন : ২৭ : ভারতে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসি বণিকদের আগমন ও তাদের তৎপরতার বিবরণ দাও।

উত্তর : পর্তুগীজদের আগমন ও তৎপরতা

১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ইমানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে আরব বণিকদের সহযোগীতায় ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভাস্বো-দা-গামার জলপথ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পর্তুগীজদের এদেশে বাণিজ্যের পথ খুলে যায়। ফলে তারা ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গোয়াতে এসে কুঠি স্থাপন করে এবং ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে তা বাংলায় স্থানান্তরিত হয়। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, হুগলী প্রভৃতি স্থানে তারা বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে ব্যবসায়িক তৎপরতা শুরু করে। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে রেশমী কাপড়, লবঙ্গ, এলাচী, দারুচিনি, বাদাম ইত্যাদি বাংলাদেশে আমদানী করত। আর বাংলা থেকে চাল, ডাল, ঘি, তেল ইত্যাদি রপ্তানী করত। কালক্রমে পর্তুগীজরা ব্যবসানীতি উপেক্ষা করে জনগণের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে এবং সরকারী শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব নানাবিধ কারণে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কাশিম খান ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তার সেনা বাহিনী নিয়ে হুগলী দুর্গ অবরোধ করে এবং এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়।

ওলন্দাজদের আগমন ও তৎপরতা

১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের একদল বণিক 'ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠন করে ভারতবর্ষে আগমন করে। মসলিপট্টমে এবং পুলিকটে কুঠি স্থাপন করে। বাংলায় তাদের কুঠি ছিল চচুঁয়া, বলেশ্বর, কাশিমবাজার, বরানগর ইত্যাদি স্থানে। তারা এদেশ থেকে কাঁচা রেশমী সুতা, সুতী বস্ত্র, চাল, ডাল বিদেশে রপ্তানী করে এবং সুমাত্রা যাভা বিভিন্ন দ্বীপ থেকে বিভিন্ন প্রকার মশলা আমদানী করে। কালক্রমে তাদের বাণিজ্য বর্তমান মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় সীমিত হয়ে পড়ে।

দিনেমারদের আগমন ও তৎপরতা

১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের বণিকদল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে 'দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠন করে ভারতে আগমন করে বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। তাদের কুঠিগুলোর মাঝে ত্রিবাঙ্কুর ও শ্রী রামপুরের কুঠিদ্বয় ছিল বেশি প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তারা বেশি সুবিধা করতে না পেরে ইংরেজদের কাছে তাদের কুঠিগুলো বিক্রি করে এদেশ থেকে চলে যায়।

ফরাসি বণিকদের আগমন ও তৎপরতা

ফরাসি সম্রাট চতুর্থ লুই এর রাজত্বকালে তারই অর্থসচিব কোলবার্ট ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে। সম্রাট তাদেরকে পর্যাপ্ত অর্থ দান করেন। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারো সর্বপ্রথম সুরাটে ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এরপর ওলন্দাজদের সাথে সংঘর্ষ হলে তারা পরাজিত হয়। এরপর বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে ১৭০২ সালে ফরাসি কোম্পানী আবার পুনর্গঠিত হয় এবং তারা মাহে ও কারিকল বন্দর পুনরুদ্ধার করে। বাংলায় বলেশ্বর, কাশিমবাজার, চন্দনগর প্রভৃতি স্থানে তারা কুঠি স্থাপন করেন। এরপর ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দের পরে ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের প্রশ্নে তারা ক্রমশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে।

প্রশ্ন : ২৮ : ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও তার ফলাফল সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মোঘল সম্রাটদের আভ্যন্তরীণ জটিলতার সুযোগে ইংরেজ বণিকরা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি এ দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও বহুমুখী রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে একপর্যায়ে এ দেশ দখল করে নেয়।

ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন ঘটে মূলত ব্যবসার উদ্দেশ্যে। তারা বৈদেশিক পণ্য আমদানী করে এ দেশের মানুষের মনজয় করে গড়ে তোলে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কুঠি। ব্যবসার উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে জমিদারী ক্রয় করে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ও জমিদারী পরিচালনার জন্য এ দেশীয় এবং ইংরেজ জনবলের সংমিশ্রণে গড়ে তোলে সামরিক বাহিনী। প্রতিবেশী জমিদারদের সাথে সংঘর্ষেও তারা এ বাহিনীকে ব্যবহার করত।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় মোঘল সরকারের অদক্ষতা এবং দেশের রাজন্যবর্গের পারস্পরিক কোন্দল ও দুর্বলতা তাদের মনে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে এ দেশকে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যে পরিণত করার বাসনা জাগিয়ে তোলে। তাই তারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি আরো জোর দেয়। ১৬৯৬ সালে বাণিজ্য কুঠিগুলোকে জলদস্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষার অজুহাতে দুর্গে পরিণত করে। ১৬৯৮ সালে বর্তমান কলিকাতা নগরীর জমিদারী ক্রয় করে এবং ১৭০০ সালে তথায় "ফোর্ট উইলিয়াম" নামে দুর্গ তৈরি করে। এভাবে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও মুম্বাইকে ভারতবর্ষে বৃটিশ অভ্যুত্থানের তিনটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করে।

রাজনৈতিক তৎপরতার বিবরণ

ভারতবর্ষকে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যে পরিণত করতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল ও তার স্থায়িত্ব লাভে জন্য ইংরেজদের গৃহিত রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলোকে তিনটি মৌলিক শিরোনামে ব্যক্ত করা যায়। যথা :

এক. পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার ক্ষমতা দখল

বাংলার সবশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী লাভ করেন। এরপর দেশীয় গাদ্দারদের সহযোগিতায় ইংরেজরা তাকে ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে পরাজিত করে রাজ্যত্রয়ের ক্ষমতা দখল করে নেয়। তবে পরবর্তী সময়ে মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মোঘল সম্রাট শাহ্ আলম বাংলার মসনদ পুনরুদ্ধারের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা চালালেও ২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে তাঁরা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন এবং সম্রাট শাহ্ আলম গোলামীর চুক্তি করে দিল্লীতে ফিরে যান।

দুই. সাম্রাজ্য বিস্তার

সম্রাট শাহ্ আলমের সন্ধির ফলে গোটা উপমহাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যশক্তিগুলো দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১. ইংরেজ পক্ষাবলম্বী নতজানু সম্প্রদায়। যেমন : দিল্লীর শাহ্ আলম, হায়দারাবাদের নিজাম, শিখশক্তি প্রমুখ।

২. স্বাধীনতাকামী শক্তি। যেমন : মহীশুরের সুলতান ফাতেহ্ আলী টিপু, রোহিলাখণ্ডের পাঠান রাজন্যবর্গ, মারাঠাদের বিভিন্ন দল প্রমুখ।

এ স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলোকে দমিয়ে রাখার জন্য ইংরেজ অপশক্তি নিম্নোক্ত কুট-কৌশল অবলম্বন করে।

ক. পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার নীতি : এ নীতির আওতায় রোহিলাখণ্ডের স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে অযোধ্যারের নবাব সুজাউদ্দৌলাকে উস্কে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ধর্মে ধর্মে ও গোত্রে গোত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে রাখা হয়।

খ. অধীনতামুক্ত মিত্রতা নীতি : স্বাধীনতাকামীদের আদর্শ পুরুষ মহীশুরের সুলতান টিপুর সাথে পরপর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরেজরা অধীনতামূলক মিত্রতার প্রস্তাব দিলে সুলতান তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

অবশেষে নিজ সেনাপতি মীর সাদেকের গাদ্দারীর ফলে ১৭৯৯ সালে ইংরেজ ও নিজামের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে মালভেদীর ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন।

আহমদ শাহ আবদালীর পর মারাঠা শক্তি দিল্লী দখল করে নিলে মারাঠিদের দমনের নাম করে ১৮০৩ সালে ইংরেজরা দিল্লী দখল করে নেয়।

গ. পররাজ্য দখল নীতি : এ ক্ষেত্রে তারা তিনটি পন্থায় অগ্রসর হয়।

১. শক্তিপ্রয়োগ বা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে ১৮৪৮ সালে শিখদের থেকে পাঞ্জাব এবং ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় বক্সারের যুদ্ধে পেগু দখল।

২. স্বত্ব বিলোপ নীতি তথা বৃটিশ কর্তৃক সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের উত্তরসূরী না থাকলে সে রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে মর্মে আইন প্রণয়ন করে নাগপুর, ঝাসি প্রভৃতি রাজ্য দখল।

৩. প্রজাহিতের নাম করে নিযামের বেরায় প্রদেশ, সিকিম প্রভৃতি দখল।

তিন. শাসন-শোষণ সংক্রান্ত কর্মতৎপরতা

উপমহাদেশে বৃটিশ উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখতে যে-সকল নীতি গ্রহণ করে, তা চার ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও শোষণ।

২. রাজনৈতিক আগ্রাসন।

৩. ধর্মীয় আগ্রাসন।

৪. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

ফলাফল

ইংরেজরা এসকল রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। এরপর ২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মোঘল সম্রাট শাহ আলমকে পরাজিত করে দিল্লীর লাল কেল্লা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল ছাড়া অবশিষ্ট মোঘল সাম্রাজ্য, ১৭৭৪ সালে রোহিলাখণ্ড, ১৭৯৯ সালে সুলতান টিপুকে পরাজিত করে মহিশুর, ১৮৪৮ সালে মারাঠিদের দমন করে দিল্লী, ১৮৪৩ সালে সিন্ধু এবং ১৮৪৮ সালে পাঞ্জাব দখল করে। এভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসাথে তারা দখল টিকিয়ে রাখতে এ দেশের মানুষের উপর অন্যায়ভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক আগ্রাসনসহ বহুমুখী আগ্রাসন চালায়।

উপসংহার

ইংরেজরা এ সকল তৎপরতার মাধ্যমে ভারতবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলেও স্বাধীনতাকামী জনতা দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে এ দেশের মাটি থেকে বিতাড়ন করে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনে।

শাহ্ আব্দুল আযীয রহ.-এর জীবন-কর্ম ও অবদান

প্রশ্ন : ২৯ : শাহ্ আব্দুল আযীয রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-কর্ম, তাঁর ঐতিহাসিক 'দারুল হরব' ফাতওয়া প্রদান ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর :

শাহ্ আব্দুল আযীয রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম :

তাঁর প্রকৃত নাম শাহ্ আবদুল আযীয। উপাধী 'সিরাজুল হিন্দ'। তাঁকে গোলাম হালীম নামেও ডাকা হত। অনেকে তাঁকে "হুজ্জাতুল্লাহ" বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ছিলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.-এর সুযোগ্য সন্তান। তিনি ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১১৫৯ হিজরীর ২৫শে রমাযান দিবাগত রাতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

অতি অল্প বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে সকল বিষয়ে ইলম অর্জন করতে থাকেন। ১২ বছর বয়সে পিতার ইন্তেকালের পর শাইখ নুরুল্লাহ বুরহানবী, শাইখ মুহাম্মাদ আমীন কাশ্মীরী, মাওলানা আশেক বিন উবায়দুল্লাহ্ রহ. প্রমুখ বিজ্ঞ আলেম থেকে হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ ছাড়া আরো অনেক আসাতিজায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

কর্মজীবন

হযরত শাহ্ আবদুল আযীয রহ. মাত্র ১৭ বছর বয়সে নিজের যোগ্যতা বলে পিতার প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁর স্থাভিষিক্ত হন এবং শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার পাশাপাশি পিতার রেখে যাওয়া সংস্কারের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে আত্মোনিয়োগ করেন। তিনি নিজ লক্ষ্যে পৌছার জন্য ৫টি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যথা :

১. কুরআনে কারীমের প্রচার।

২. ইলমে হাদীসের প্রচলন দান এবং উন্নতি বিধান।

৩. বাতিলের খণ্ডন ও হকের প্রতিষ্ঠা।

৪. পিতার আদর্শে আদর্শবান কর্মীবাহিনী গঠন।

৫. গণজাগরণ সৃষ্টি।

রচনাবলী

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ.-এর রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– ফতহুল আযীয, আল-ফাতওয়াহ ফিল মাসাইলিল মুশাককাকাহ, তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, উজালায়ে নাফে'আহ, মীযানুল বালাগাহ, মীযানুল কালাম, সিররুল জলীল ফি মাসআলাতিত তাফসীল, সিররুশ শাহাদাতাইন ইত্যাদি।

ইন্তেকাল

দীর্ঘ ৭৮ বৎসরের বর্ণাঢ্য জীবন পাড়ি দিয়ে ৭ই শাওয়াল ১২৩৯ হিজরী মোতাবেক ৬ই মে ১৮২৮ ইংরেজী সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁকে নিজ পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর পাশে সমাহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক দারুল হরব ফাতওয়া

আহমদ শাহ আবদালীর সহযোগীতায় দিল্লীর সম্রাটরা মারাঠিদের প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও তাদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে আবার মারাঠিরা লাল কেল্লা দখল করে নেয়। মারাঠিদের দমন করার অজুহাতে ইংরেজ সেনাপতি লর্ডলেক ১৮০৩ সালে দিল্লী দখল করে নিয়ে ফরমান জারী করে : এখন থেকে ভারতের শাসন নীতি হবে– সৃষ্টি আল্লাহর, সাম্রাজ্য সম্রাটের আর কর্তৃত্ব চলবে কোম্পানীর।

ইংরেজদের ক্ষমতা দখল করার পর অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে আগ্রাসী তৎপরতা চালায় এবং ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার জন্য যে হীন ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়, তা এক দীর্ঘ ইতিহাস।

এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শাহ আব্দুল আযীয যখন বুঝতে পারলেন যে, দেশ এখন সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের করতলগত হয়ে গেছে। সুতরাং ১৮০৬ ইংরেজী সালে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফাতওয়া দেন, "ভারত এখন দারুল হরব" (শত্রু কবলিত এলাকা)। সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য একে স্বাধীন করা।

ফাতওয়ার পতিক্রিয়া

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ.-এর এ ফাতওয়া দাবানল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভ্রান্ত প্রচারণায় দ্বিধাগ্রস্থ উম্মতের অনেকেই পেয়ে গেল সঠিক সিদ্ধান্ত। জ্বলে উঠল স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা। স্বাধীনতার ইতিহাসে সূচিত হল নতুন অধ্যায়ের। আমীর খানের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শহীদ সৈয়দ আহমদ শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর নেতৃত্বে জমায়েত হতে লাগল স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ বাহিনী। দলে দলে তারা সমবেত হতে থাকল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সিত্তানা

দুর্গে। কিন্তু ইংরেজদের হীন ষড়যন্ত্রে জগৎ শেঠ ও রায় দুর্লভদের প্রেতাত্মাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐতিহাসিক বালাকোঠের প্রান্তরে রক্তের অক্ষরে লেখা হল স্বাধীনতাকামী শহীদানের নাম। তবু সে আন্দোলন থেমে থাকে নি বরং তা ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে ১৮৫৭ সালে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী আলেম সমাজের নেতৃত্বে সর্বব্যাপী তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ (স্বাধীনতা আন্দোলন) এর রূপ লাভ করে। শামেলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন থানা ভবন সরকার। সেই একই চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ।

যার সুযোগ্য সন্তানেরা জীবনবাজি রেখে উজ্জীবিত হতে থাকে স্বাধীনতার চেতনায়। ইংরেজ খেদাও আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলনসহ বহু আন্দোলনের পথ মাড়িয়ে আবার উদিত হয় স্বাধীনতার লাল সূর্য। সরে যেতে বাধ্য হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। মানুষ ফিরে পায় স্বাধীন জীবনের অনাবিল শান্তি।

প্রশ্ন : ৩০ : কে ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন? 'দারুল হরব' ঘোষণার প্রেক্ষাপট বিস্তারিত আলোচনা কর!

উত্তর : দারুল হরবের ঘোষক

ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা দেন ইমাম শাহ আব্দুল আযীয রহ.।

দারুল হরব ঘোষণার প্রেক্ষাপট

(১) ইংরেজদের এ দেশে আগমন : ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে মে রাজা ইমানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে আরব বণিকদের সহযোগিতায় ভারত উপমহাদেশের রাস্তা আবিষ্কার করেন। এরই সূত্র ধরে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রানী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে বাণিজ্য সনদ নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছদ্মবেশে ইংরেজরা এ দেশে আগমন করে। এ বণিকদল ইতিহাসে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে পরিচিত।

(২) ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ : ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশের রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতার সুযোগে এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে এবং নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও কুট-কৌশল গ্রহণ করতে থাকে।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দখল

এ দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের যোগ-সাজসে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে দেশ প্রেমিক নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও কুট-কৌশল করতে থাকে।

মীর কাশিমের বিদ্রোহ ঘোষণা

মীর কাশিম ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে সাথে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে তারা পরাজিত ও শাহ আলম বন্দি হন। ফলে তিনি ইংরেজদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে দিল্লী ফিরে আসেন।

ফতেহ আলী টিপুর শাহাদত

রোহিলাখণ্ডের পাঠান্যবর্গ ও মহীশুরের স্বাধীনতাকামী সম্রাট ফতেহ আলী টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পর পর তিনবার যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও হায়দারাবাদের নিজাম ও সেনাপতি মীর সাদেকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে অবশেষে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মালভেলীর ময়দানে পরাজিত ও নিহত হন।

দিল্লীর ক্ষমতা দখল

আহমদ শাহ আবদালীর সহযোগিতায় দিল্লীর সাম্রাজ্য মারাঠিদের প্রভাবমুক্ত হলেও দুর্বলতার কারণে মারাঠিরা পুনরায় 'লাল কেল্লা' দখল করে নেয়। মারাঠিদের দমনের নাম করে ইংরেজ সেনাপতি লর্ডলেক ১৮০৩ সালে দিল্লী দখল করে ঘোষণা দেয়, এখন থেকে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক নীতি হবে এই যে, সৃষ্টি আল্লাহর, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর শাসন-কর্তৃত্ব চলবে কোম্পানীর।

ইংরেজদের অমানবিক নির্যাতন

ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর একদিকে এ দেশের মানুষের উপর চালায় নির্যাতনের বিভীষিকা ও অর্থ-সম্পদ শোষণের দস্যুবৃত্তি। অপরদিকে এ দেশের মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে আগ্রাসী তৎপরতা চালায় এবং ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার জন্য এবং মুসলিম জাতির অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়ার জন্য যে হীন ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা এক দীর্ঘ ইতিহাস।

ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা

এ হেন পরিস্থিতি অবলোকন করে শাহ আব্দুল আযীয রহ. যখন অনুধাবন করতে পারলেন যে, দেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত, তারা নামে মাত্র দিল্লী ক্ষমতাসীন সম্রাটদের থেকে এ ফরমান আদায় করেছে যে, এখন বাদশা সালতানাতের রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীর হুকুমেই চলবে। তখন শাহ আবদুল আযীয রহ. দ্বিধাহীন নির্ভীক কণ্ঠে ফতওয়া ঘোষণা করেন, ভারত এখন দারুল হরব (শত্রু কবলিত দেশ)। সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হল এ দেশকে স্বাধীন করা।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩১ : সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-কে ছিলেন? তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. ছিলেন শাহ আবদুল আযীয রহ.-এর আধ্যাত্ম সাধনা, আদর্শিক চেতনা ও জিহাদী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত এক মহান পুরুষ। খেদমতে খলক ও মানুষের সেবায় ব্রত এক মহামনীষী। বাতিল প্রতিরোধে সাহসী ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। নিম্নে তার জীবন ও কর্মতৎপরতার উপর আলোকপাত করা হল।

জন্ম ও পরিচয়

নাম সাইয়েদ আহমদ। পিতার নাম সাইয়েদ মুহাম্মদ ইরফান। তিনি ১৭৮৬ ইংরেজী সাল মোতাবেক ১২০১ হিজরী সফর মাসে আযোধ্যারের অন্তর্গত রায়বেরেলীর বিখ্যাত সাইয়েদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত হাসান রাযি. ও হযরত হুসাইন রাযি. উভয়ের বংশধর ছিলেন। এ কারণে তাঁকে সাইয়েদ আহমদ হাসানী ওয়াল হুসাইনী বলা হয়।

শিক্ষাজীবন

মাত্র ৪ বৎসর বয়সে তাকে মক্তবে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু লেখা পড়ায় মনোযোগ না থাকায় দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ মাত্র কয়েকটি সূরা মুখস্থ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৭/১৮ বছর বয়সে পিতার ইন্তেকালের পর তিনি দিল্লীতে শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর হাতে বাইয়াত হন। শাহ সাহেবের নির্দেশে আধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি শাহ আবদুল কাদির রহ.-এর নিকট ইলম অর্জন শুরু করেন। কয়েকটি কিতাব অধ্যায়নের পর কিতাবের লেখা দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তার মাঝে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হলে শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর নির্দেশে তার বাহ্যিক ইলম হাসিলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সামরিক প্রশিক্ষণ

বাল্যকালেই হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর মাঝে সামরিক প্রতিভার ছাপ ফুটে উঠে। হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. তাঁর এ সুপ্ত প্রতিভা আঁচ করতে পেরে সশস্ত্র বাহিনীতে ভর্তি হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তিনি ১২২৭ হিজরীতে রোহিলাখণ্ডের সাধীনচেতা খোদাভীরু নবাব আমীর খানের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হন। রাজপুতানা এবং মালবের বিরুদ্ধে

পরিচালিত যুদ্ধে অসাধারণ সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। ১২৩২ সালে ইংরেজদের সাথে নবাবের সন্ধি হলে তিনি তার সেনাবাহিনী ত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন।

ইন্তেকাল

আজীবন সংগ্রামী সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা এ মহান পুরুষ ২৪ যিলকদ ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ সনে বালাকোটের ময়দানে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদে শহীদ হন।

তাঁর কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সেনাবাহিনী ত্যাগের পর তিনি হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ.-এর নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা ও সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতা স্বাধীনতা ও সংস্কার আন্দোলনে গণজাগরণের সৃষ্টি করে। তার কর্মতৎপরতাকে মৌলিক চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

এক. দাওয়াত ও ইসলাহী তৎপরতা।

দুই. স্বাধীনতার লক্ষ্যে জিহাদী চেতনা সৃষ্টি ও মুজাহিদ সংগ্রহের প্রয়াস।

তিন. সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতা।

চার. জিহাদের ময়দানে সশস্ত্র কর্মতৎপরতা।

নিম্নে এগুলোর উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা গেল।

(১) দাওয়াত ও ইসলাহী তৎপরতা

তিনি সকলকে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে আত্মিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধি অর্জনের আহ্বান জানান। এ উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহিত কর্মসূচি নিম্নরূপ :

(ক) দেশের সর্বত্র তাঁর এ মহান দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালে মুজাফফর নগর থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত অঞ্চলগুলো সফর করে জনগণ থেকে ইসলাহ ও জিহাদ এ দু' বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন।

(খ) মুরীদ ও অনুসারীদের আত্মশুদ্ধি, তরবিয়ত দান ও জিহাদী কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র তৈরি করে তাদেরকে স্থানীয় কেন্দ্রের সাথে জুড়ে দেন।

(২) জিহাদী চেতনা সৃষ্টি ও মুজাহিদ সংগ্রহ

তিনি আত্মশুদ্ধি ও জিহাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রচলিত ধারার বিপরীতে তরীকায়ে মুহাম্মাদী নামে একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তন করেন এবং সফরের সময়

এর উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি নিজ আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে স্বাধীনতার পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টি, জিহাদের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিবর্গের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও এর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ করেন।

(৩) সংস্কারমূলক কার্যক্রম

(ক) চিন্তা চেতনার পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি নিজ মুরীদ ও অনুসারীদেরকে বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার দিক্ষা দিতেন এবং দ্বীনী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন।

(খ) এ উদ্দেশ্যে তিনি উর্দূ ভাষার প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংস্কার করেন।

(গ) তাঁর সময়ে মুসলিম সমাজে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বিধবা মহিলাকে বিবাহ করা ঘৃণ্য কর্ম জ্ঞান করা হত। এ কুপ্রথার মূলোৎপাটনের জন্য তিনি নিজে বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন এবং আশি বৎসর বয়স্কা নিজ বিধবা বোনকে বিবাহ দেন।

(ঘ) কবরপূজা ও মাজারপূজার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি ইসলামী ধারায় যে সব কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার সংস্কার করেন।

(ঙ) "পথের নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভারতীয়দের উপর হজ্ব ফরয নয়" এ মর্মে প্রচলিত ফাতওয়ার কারণে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্বের মতো একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিধান উপমহাদেশ থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছিল। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. হজ্বের গুরুত্ব জনগণের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ১৮২১ সালে আটশত সফরসঙ্গী নিয়ে এগারটি জাহাজে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং পরবর্তী বছর পবিত্র হজ্ব পালন করে ১৮২৮ সালের ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

(৪) জিহাদের ময়দানে সশস্ত্র তৎপরতা

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. হজ্ব এর সফর শেষে দেশে ফিরে আসার পর পূর্ণ উদ্যমে আজাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতাকামী মুজাহিদগণকে সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য সৈনিকরূপে গড়ে তোলার তাগিদে ১৮২৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি বীরত্বের ঐতিহ্যবাহী সীমান্ত প্রদেশের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন।

আগষ্ট ১৮২৭ ইংরেজী সাল মোতাবেক ১২৪৮ হিজরীর ১২ই জুমাদিউস সানী "হাণ্ড" নামক স্থানে পৌঁছে ইমামতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে ভারতবর্ষে বিশুদ্ধভাবে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান এবং পাঞ্জাবের শিখ স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে মরণপণ জিহাদে লিপ্ত হন। ১৮৩২ সনে বালাকোটের জিহাদে শাহাদাত লাভের মাধ্যমে এ সংগ্রামী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফলাফল

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতবর্ষের জনগণের হৃদয়ে স্বাধীনতার যে চেতনা জাগ্রত করেছিল, তা তাঁর শাহাদাতের পবিত্র রক্তে সিক্ত হয়ে তাঁর অনুসারীদের প্রচেষ্টায় আরো বহুগুণে বেগবান হয়। ফলে ১৮৫৭ সালে মহা বিপ্লবের রূপ লাভ করে। আর সেই চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয় মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ। যার অনুসারীদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সফল আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে।

উপসংহার : হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. ছিলেন হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.-এর যোগ্য মানসপুত্র। তার সশস্ত্র সংগ্রাম ও বালাকোটের জিহাদে আত্মত্যাগ উম্মাহকে পরবর্তী সকল আন্দোলন ও সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রশ্ন : ৩২ : সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর পেশোয়ার আক্রমণ এবং সুলতান মুহাম্মদ খানের আত্মসমর্পণ ও তার হাতে পেশোয়ার সমর্পণের বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর :

পেশোয়ার আক্রমণ

মায়ার যুদ্ধের পর তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে পেশোয়ার ও মারদান পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলে সকলেই এ প্রস্তাব মেনে নেয়। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি গোটা বাহিনী নিয়ে মারদানের পথে রওয়ানা হন। সৈয়দ সাহেব মারদানে দুই রাত অতিবাহিত করে ৬/৭ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পেশোয়ারের পথ হয়ে চরসাদ্দায় পৌঁছেন। সেখান থেকে মাটা হয়ে শবকদরে ছাউনি ফেলেন। সেখান থেকে রিযীতে পৌঁছেন। সেখানে অবস্থানকালে সুলতান মুহাম্মদ খান ক্ষমা চেয়ে আবরর ফয়জুল্লাহ খানকে সৈয়দ আহমদ সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন এবং পেশোয়ার আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করার আবেদন করে। জবাবে সৈয়দ সাহেব বলেন, আমরা আজ পেশোয়ারে অবস্থান করব। সে যদি বিশ্বাসঘাতক না হয়, তা হলে স্বস্থানে অবস্থান করতে বলুন। এদিকে তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে

পেশোয়ারে প্রবেশ করেন। সেখানের জনগণ ও সেনাবাহিনী তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাদরে গ্রহণ করে নেয়। ফলে বিনা যুদ্ধে পেশোয়ার দখল হয়ে যায়।

সুলতান মুহাম্মদ খানের আত্মসমর্পণ ও তার হাতে পেশোয়ার সমর্পণ

মুজাহিদ বাহিনী পেশোয়ার দখল করে নেওয়ার কারণে সে হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কোনো উপায়ন্তর না দেখে সুলতান মুহাম্মদ খান বার বার সৈয়দ সাহেবের কাছে আনুগত্যের পয়গাম পাঠাতে থাকে। তার এ অনুগত্যের বিষয়ে সৈয়দ সাহেব নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত দেন, মুহাম্মদ খান আনুগত্য করার পর তাকে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত রাখা হবে। এ সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরই মাঝে সুলতান মুহাম্মদ খান ফয়জুল্লাহ খানের মাধ্যমে সৈয়দ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। পরামর্শক্রমে সতর্কতা হিসেবে প্রথমে মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুলতান মুহাম্মদ খান যারখানী গড়ের পাশে একটি মাঠে এসে সাক্ষাতে মিলিত হন। এ সাক্ষাৎ মাওলানা ইসমাঈলের হাতে হাত রেখে সৈয়দ সাহেবের আনুগত্যের বায়'আত ও দ্বীনের খেদমত, জিহাদ, মুজাহিদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী দিন আবার তার সাথে মিলিত হলে সেখানে সৈয়দ সাহেবের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয় নেতা হাযারখানী মাঠে পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হবেন আর সাথে থাকবে উভয় দলের সেনাবাহিনী।

পরামর্শ মোতাবেক হাযারখানী মাঠে দুই নেতার সাক্ষাত হয় এবং আলোচনাকালে সৈয়দ সাহেব কাবুল থেকে মায়ার পর্যন্ত সব ঘটনা তার সম্মুখে ব্যক্ত করেন এবং সেই থেকে সুলতান মুহাম্মদ খান ও তার ভাইয়ের বায়'আত গ্রহণ ও বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করে এবং বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে গাদ্দারীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, অথচ আমি তোমার ও তোমার ভাইয়ের বিদ্রোহের কারণই জানতে পারলাম না।

প্রশ্ন : ৩৩ : সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর পরিচয় কি? তাঁর কর্মতৎপরতা আলোকপাত কর।

উত্তর :

জন্ম ও পরিচয়

হযরত সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ১২ রবিউস সানী ১১৯৩ হিজরীতে অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সাইয়েদ আব্দুল গণি। মাতার নাম ফাতেমা।

শিক্ষা-দীক্ষা

মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কুরআনে কারীম হিফজ করেন। এর পর দুই বা তিন বছরে পিতার নিকট নাহু, সরফ, ফিক্‌হ, মানতিক এর কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন। মাতার ইন্তেকালের পর চাচা আব্দুল আযীয রহ. তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। হযরত সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর কাছে মাত্র পনের বৎসর বয়সে প্রচলিত পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করেন।

সমরবিদ্যা

হযরত সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ২১ বছর বয়েসেই যুদ্ধের যাবতীয় কলাকৌশল আয়ত্ত করে নেন। জীবনের প্রথম যুদ্ধেই তাঁর মাঝে একজন সত্যিকার যোদ্ধার যাবতীয় গুণ ফুঠে ওঠে। তিনি একবার বিশ্রাম নিয়ে দশ-এগার মাইল হাঁটতে পারতেন। তিনি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পাথর ও বালুর উপর এবং তীব্র শীতে খালী গায়ে চলতে পারতেন। বক্তৃতায় ছিল তাঁর বিরাট পারদর্শীতা।

সংস্কারমূলক কার্যক্রম

সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ইলম হাসিলে পর বিদআত-কুসংস্কারের মূলোৎপাটনকে জীবনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজ থেকে বিদআত ও কুসংস্কার উচ্ছেদের জন্য তাঁর অন্যতম পদক্ষেপ ছিল :

১. ওয়াজ নসীহত। ২. গ্রন্থ রচনা।

বিদ'আতীদের অপবাদ ও তার খণ্ডন

হযরত ঈসমাঈল শহীদ রহ. এর সংস্কারমূলক কার্যক্রমে বিদ'আতীরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা তাঁর এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে তৎকালীন সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করে যে, "ইসমাঈল শান্ত দীল্লিকে অশান্ত করে তুলছে। সে নির্ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের অবমাননা করছে; রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মৃতি-বিজড়িত বরকতময় জিনিসগুলোর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছে"। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বাদশাহ

তাঁকে দরবারে তলব করলেন। তিনি সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা মাহাত্ম্য সম্পর্কে এমন আবেগময় বক্তৃতা প্রদান করেন যে, বাদশাহ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। এরপর বাদশাহ তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পাঞ্জাব সফর

পাঞ্জাবের শাসক রণজিৎ সিং শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলমানদের উপর ব্যাপক নির্যাতন ও ধর্মীয় বিধান পালনে প্রকাশ্যে বাধা প্রদানের খবর পেয়ে তা বন্ধ করতে সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ১২৪১ হিজরীতে পাঞ্জাব সফর করেন।

বালাকোট ও মুজাফফরাবাদে শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহ.

শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. এবং নেতৃস্থনীয় অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ পরামর্শক্রমে সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ও মাওলানা খাইরুদ্দীন রহ. কে বালাকোটের অভিমুখে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ভূগাড় মাঙ্গে পৌঁছে সামান্য যাত্রা বিরতি দেন। অনন্তর বরফাবৃত পথ অতিক্রম করে সীমাহীন কষ্টে বালাকোটে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছা মাত্র পিখলী ও ফাগানের শাসক সুলতান জবরদস্ত খান ও তাঁর সাথীরা হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর কাছে মুজাফফরাবাদ অভিযানের প্রস্তাব পেশ করেন। মুজাহিদদের একটি খণ্ডদল সেখানে প্রেরণ করার শর্তে তিনি রাজি হন; কিন্তু মাওলানা খাইরুদ্দীন তাঁর সাথে একমত হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে মুন্সি গাউস মুহাম্মাদকে আমীর নিযুক্ত করে মুজাফফরাবাদ প্রেরণ করেন।

সৈন্যবাহিনী মুজাফফরাবাদের নদী পার হয়ে শিখদের গড়ের ছাউনি দখল করে নেয়। পরে মাওলানা খাইরুদ্দীন সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর নির্দেশে মুজাফফরাবাদের দিকে যান। সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. বিভিন্ন কারণে সেখানে এক মাস অবস্থান করেন এবং শিখদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর শিখরা সেখান থেকে পলায়ন করে মুজাফফরাবাদের দিকে চলে যায় এবং সেখানে লুটতারাজ ও অগ্নি সংযোগ করে। এরপর মাওলানা খাইরুদ্দীন নিজ বাহিনী নিয়ে বালাকোটের দিকে যাত্রা করেন।

শাহাদাত

আল্লাহ তা'আলার কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য সাইয়েদ শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর সাথে হাজার মাইল সফর করে পেশোয়ারে পৌঁছেন। অবশেষে ১২৪৬হিজরীর যিলকদ মাসের ২৪ তারিখে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

উপসংহার

সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. ছিলেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর গঠিত মুজাহিদ বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক। ভারতবর্ষকে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু মুক্ত করতে তিনি খোদার রাহে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লহ তা'আলা তাঁকে সমুন্নত মর্যাদায় উন্নীত করুন।

প্রশ্ন : ৩৪ : বালাকোট ময়দানে মাওলানা ইসমাঈলের অবস্থা ও মুজাফফরাবাদ অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা দাও!

উত্তর :

ভূমিকা : মাওলানা ইসমাঈল রহ.-এর সংগ্রামী জীবন অনেক দীর্ঘ। তিনি তার জীবনে অনেক সংগ্রাম ও অভিযান পরিচালনা করেছেন। নিম্নে বালাকোটে তার পরিকল্পনা ও মুজাফ্‌ফরাবাদে তার অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

এক গ্রামের অধিবাসীদের পরামর্শ দান

ভুগাড়মাঙ্গ নাকম একটি গ্রামে যাত্রা বিরতি করলে সেখানকার অধিবাসীরা পরামর্শ দেয় যে, বালাকোটে পৌছাতে চাইলে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত হবে না। কেননা তুষারপাতে পথ বন্ধ হয়ে গেলে তা অতিক্রম করতে একমাস অপেক্ষা করতে হবে।

বালাকোট ময়দানে যেভাবে পৌঁছলেন

ইতঃমধ্যে তুষারপাত শুরু হয়ে যায়। ফলে কোনোমতে পাহাড়ি গোয়ালদের সহযোগিতায় অতিকষ্টে বরফের উপর দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বালাকোটে পৌছান।

যবরদস্ত খানের আবদার

মাওলানা ইসমাঈল বালাকোটে পৌছিলে পিখলী ও ফাগানের শাসক সুলতান যবরদস্ত খান ও তার সঙ্গী-সাথী ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ মাওলানা ইসমাঈলের খিদমতে হাজির হয়ে মুজাফফরাবাদ অভিযানের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি তাতে এ শর্তে সম্মত হন যে, মুজাহিদদের মাত্র একটি খণ্ডদল এ অভিযানে তাদের সঙ্গে যাবে।

মুজাফফরাবাদ অভিযানে

মাওলানা খায়রুদ্দীনের দ্বিমত

মাওলানা খায়রুদ্দীন এ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারছিলেন না। কেননা তিনি এটাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে মনে করছিলেন। এ কারণেই তিনি বলেন, যদি যবরদস্ত খানের সৈন্য নেওয়ার এতই খাহেশ হয়, তা হলে সামানা

যোগাড় করার জন্য ৫০০০ টাকা দিতে বলুন। ইসমাঈল বলেন, সে ওয়াদা করেছে মুজাফফরাবাদ গিয়ে সামানা যোগাড় করে দেবে। মাওলানা খায়রুদ্দীন বলেন, এটা তার বাহানা মাত্র। তাই তিনি যেতে রাজি হলেন না।

মুজাফফরাবাদের দিকে রওনা

মুন্সি গাউস মোহাম্মদকে সরদার নিযুক্ত করে মুজাফফরাবাদের দিকে বাহিনী প্রেরণ করা হয়। খবর পাওয়া মাত্রই শিখরা নদী পার এবং পারা পারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্র নাম নিয়ে নদীতে নেমে পড়েন এবং হাটু পানি ভেঙে নদী পার হয়ে যান।

যবরদস্ত খানের বিশ্বাসঘাতকতা

সুলতান যবরদস্ত খান আপন বাড়িঘর এবং বাজারের দখল পাওয়ার পর শিখদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করতে চেষ্টা করেন। তার এ কাজের কারণে মুজাহিদ বাহিনী তাকে ভর্ৎসনা ও গালমন্দ করেন।

অঙ্গীকার পূরণে যবরদস্ত খানের গড়িমশি

শিখরা মুজাহিদদের গড়ে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। যখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলছিল, এমন সময় পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী মাওলানা ইসমাঈল যবরদস্ত খাঁনকে রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র, প্রয়োজনীয় সামানা সরবরাহ করতে বললে সে গড়িমশি শুরু করে।

শের সিং-এর আগমন ও যবরদস্ত খানের হা-হুতাশ

শের সিং সুলতান নযফ খানের সঙ্গে বালাকোট উপত্যকায় এসে গেছে। এই সংবাদ শুনে যবরদস্ত খান হা-হুতাশ শুরু করেন। মাওলানা খাইরুদ্দীন বলেন, চিত্রটা আমার মাথায় পূর্বেই ছিল এবং শর্তও করেছি; কিন্তু যে নিজ রাজ্য বাঁচাতে টাকা খরচ করতে চায় না, তাকে কি বলব!

মাওলানা খায়রুদ্দীনের প্রস্তাব ও যবরদস্ত খানের ভিন্নপথে গমন

মাওলানা বলেন : সামনে নদী ও পাহাড়। কাজেই আশঙ্কাজনক স্থানগুলো আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দাও আর ঝুকিমুক্ত স্থানে তুমি তোমার সৈন্য নিয়ে থাক। তারা এ পরামর্শ সকলে পছন্দ করল। কিন্তু যবরদস্ত খান যে পথ দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে, সে পথে সামানাদি রেখে মাওলানাকে ডেকে বলেন– চলুন! উপায়ন্ত না পেয়ে মুজাহিদ বাহিনী রওনা শুরু করল। কিন্তু পথিমধ্যে যবরদস্ত খানের সৈন্যবাহিনী পালিয়ে যায় আর মুজাহিদ বাহিনী শিখদের মুকাবেলায় রুখে

দাঁড়ায়। বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে শিখরা মুজাফফরাবাদে গিয়ে ঘরবাড়ি পোড়ানো ও লুণ্ঠন কার্য শুরু করে। যাত্রাপথে তিনি অসুস্থ্য হন। সুস্থ্য হয়ে বালাকোটে পৌঁছলে যুদ্ধের বিভীষিকা দেখতে পান।

উপসংহার

মাওলানা ইসমাঈল রহ.-এর সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত।

হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩৫ : হাজী শরী'অতুল্লাহ কে ছিলেন? তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর "দরুল হরব" ফাতওয়ায় প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে যারা আন্দোলনমুখর হয়ে উঠেছিলেন, হাজী শরীঅতুল্লাহ রহ. তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

নীলকর সাহেবদের দ্বারা নিগৃহীত ও অত্যাচারিদের কাছে তিনি ছিলেন মুক্তির স্বপ্নপুরুষ। হিন্দু জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন একজন ত্রাণকর্তা সম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হাজী শরী'অতুল্লাহ রহ. ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শরীয়তপুর জেলার শামাইল নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল জলীল তালুকদার। আট বছর বয়সে তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি আপন চাচা আযীমুদ্দীনের কাছে লালিত-পলিত হন।

শিক্ষাজীবন

বার বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় গমন করে মাওলানা বাশারত আলীর কাছে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করে আরবী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ১৭৯৯ সালে আঠারো বছর বয়সে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন।

দীর্ঘ বিশ বছর সেখানে অবস্থান করে আরবের বিখ্যাত শাইখ মাওলানা তাহের সোম্বল আল-মক্কীর নিকট কুরআন-হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে মাওলানা উপাধি লাভ করেন এবং কাদেরিয়া তরীকায় তাঁর কাছে মুরিদ হন। অবশেষে ১৮১৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মজীবন

দেশে ফিরে তিনি দেশের মানুষের হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে পূর্ণ ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন, নির্যাতিত মানুষের মাঝে রাজনৈতিক চেতানা জাগ্রত করণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনায় জনগণকে উজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য।

ইন্তেকাল

এ মহাপুরুষ, মর্দে মুজাহিদ ১৮৪০ সালে ইন্তিকাল করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ.-এর আন্দোলনের বিবরণ

বাংলাদেশীয় অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে কবরপূজা, পীরকে সিজদা করাসহ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ সকল বিদাআত ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করে বিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তাধারা পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষকে বুঝাতে থাকেন। ইসলামের যে সকল ফরয কাজ মানুষ ছেড়ে দিয়ে ছিল, সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি অধিক গুরুত্বারোপ করতেন। এজন্য তাঁর আন্দোলন "ফরায়েজী আন্দোলন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তা ছাড়া ইংরেজদের হাতে নিগৃহীত মানুষের মুক্তি ও ইংরেজদের তল্পিবাহক হিন্দু জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত মানুষদের মুক্তি চিন্তা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাকে দারুণভাবে বিচলিত করে দেয়। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, পরাধীনতা মেনে নিয়ে এ দেশে কোনোদিন ইসলামী আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কাজেই তিনি শাহ আব্দুল আযীয রহ. ও সাইয়েদ আহমদ রহ. এর আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করে বঙ্গদেশকে "দরুল হরব" (শত্রু কবলিত দেশ) ঘোষণা দিয়ে দুর্বার আন্দোলনে নেমে পড়েন। আর দারুল হরবে জুমার নামায বিধিসম্মত নয় বলে ফতওয়া প্রদান করেন। মুসলমানদের থেকে পরিত্যাক্ত ফরয কাজগুলোর ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এ আন্দোলনে।

ফরায়েজী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

হাজী শরীয়তুল্লাহ এর ফরায়েজী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মৌলিক দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়।

১. ইসলামী ধারায় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা

এ ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেন, তার সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ:

(ক) সমাজ থেকে অনৈসলামিক কার্যক্রম দূর করা।

(খ) ইসলামের মৌলিক বিধান অর্থাৎ ফরযগুলোকে যথাযথভাবে পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

(গ) ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(ঙ) সকলের মাঝে সদ্ভাব তৈরি করা।

২. পরধীনতার অক্টোপাস ছিন্ন করে স্বাধীনতার মন্ত্রে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করা

এ ক্ষেত্রে তিনি নিম্নরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেন–

(ক) ইংরেজদের শোষণ প্রতিহত করার জন্য লাঠিয়াল বহিনী গঠন।

(খ) নীলকরদের অত্যাচার প্রতিহত করে চাষীদের জীবন রক্ষা করা।

(গ) দূর্গাপূজা, কালি পূজা ইত্যাদি হিন্দুধর্মীয় উৎসবে মুসলমানদের কর দেওয়ার আইন বাতিল করা।

(ঘ) জমিদার কর্তৃক প্রজাদের আরোপিত অবৈধ কর বন্ধ করা।

(ঙ) ফরায়েজী আন্দোলনের সদস্য বৃদ্ধি করা এবং এর কর্যক্রম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।

ফলাফল

হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ.-এর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক তাঁর আন্দোলনে শরীক হয়। তাঁর আন্দোলনের প্রধানকেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। এ ছাড়া ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, পাবনা ও মোমেনশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এ আন্দলোন জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা দলে দলে এ আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। ক্রমেই হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ. হিন্দু জমিদার ও নীল কুঠিয়ালদের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ান। ১৮৩১ সালে ঢাকার নয়াবাড়ি নামক স্থানে প্রচারাভিযান চালানোর সময় কতিপয় হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের সাথে ভীষণ সংঘাত বেঁধে যায়। তাঁর অব্যাহত কর্মতৎপরতার ফলে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল ফরায়েজীদের সাংগঠনিক তৎপরতার আওতায় চলে আসে।

উপসংহার

হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. ও সাইয়েদ আহমদ রহ.-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী এবং একজন মর্দে মুজাহিদ। নীলকরের দ্বারা নির্যাতিত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন মুক্তির স্বপ্নপুরুষ। উৎপীড়িত মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন ত্রাণকর্তা স্বরূপ। ফরায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি বৃটিশ বিরোধী তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পীর দুদু মিয়া রহ.-এর
জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩৬ : দুদু মিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : যে সকল মহা মনীষী ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিজের জীবন বাজী রেখে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন দুদু মিয়া তাদের অন্যতম। মজলুমদেরকে শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল আপসহীন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

জন্ম ও পরিচয়

তাঁর নাম মুহ্‌সিন উদ্দীন। তিনি দুদু মিয়া নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর পিতা সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ্ রহ.। তিনি ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমার মুলফতগঞ্জ থানার বাহাদুরাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

দুদু মিয়া নিজ পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য মাত্র বার বছর বয়সে তাঁকে মক্কা শরীফ প্রেরণ করা হয়। পাঁচ বছর সেখানে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে ইলম হাসিল করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পরও তিনি নিজ পিতার নিকট উচ্চতর জ্ঞান চর্চা করেন।

জীহাদী চেতনা

মক্কা শরীফ গমনের পথে বেশ কিছুদিন কলকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর শিষ্য হাজী নেসার আলীর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর আদর্শিক জিহাদী চেতনায় প্রভাবিত হন।

ইন্তেকাল

এ মাহামনীষী ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৪১বছর বয়সে ঢাকার বংশালে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দুদু মিয়ার কর্মতৎপরতা

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহর ইন্তেকালের পর ফরায়েজীগণ দুদু মিয়াকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করেন। ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক এ

আন্দোলনের গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে তিনি পীর-মুরীদির ব্যাপক প্রচলন ঘটান। সাথে সাথে তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এ দু'ধরনের কর্মতৎপরতাকেও নিজ আন্দোলনের আওতাভুক্ত করেন। নিম্নে তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

১. অর্থনৈতিক তৎপরতা

তৎকালীন জমিদাররা কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে বিভিন্ন কর আরোপ অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। দুদু মিয়া কৃষকদেরকে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

২. রাজনৈতিক তৎপরতা

দুদু মিয়ার রাজনৈতিক তৎপরতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জমিদারদের অত্যাচার প্রতিরোধে লাঠিয়াল বহিনী গঠন।

ইংরেজদের মদদপুষ্ট জমিদাররা মুসলমান কৃষকদের উপর পূজা উদযাপনের চাঁদা বাবদ কর আরোপ করত। তিনি এর বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং সরকারী খাজনা ব্যতীত সকল বেআইনী কর আদায়ে অস্বীকৃতি জানান। এরই সাথে জমিদারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য মজবুত লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন।

(খ) অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান।

দুদু মিয়া কানাইপুরের অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে ১৮৪১ সালে অভিযান চালান। জমিদার লাঠিয়ার বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ফরায়েজীদের উপর অত্যাচার না করা এবং বেআইনী কর আরোপ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করে। ১৮৪২ সালে তিনি ফরিদপুরের জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালান। ফরায়েজীরা জমীদারকে হত্যা করে। ফলে ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াসহ অন্যদের ব্যাপক ধর-পাকড় করে। পরবর্তী সময়ে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় দুদু মিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ দুটি এলাকা ছাড়াও তিনি ঢাকা, পাঠনা, যশোর, মালদাহ প্রভৃতি অঞ্চলের অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লববের সময় ইংরেজরা তাকে দুই বছর কাল কলিকাতায় আটকে রাখে। এরপর মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকায় বসবাস করতে শুরু করেন।

ফলাফল

ফরায়েজী আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হলেও দুদু মিয়ার সময় এ কর্মতৎপরতা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ শক্তি ইংরেজ খেদাও আন্দোলন বেগবান করে তোলে।

উপসংহার : দুদু মিয়া বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাথে সাথে বলিষ্ঠ সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে তিনি ফরায়েজী আন্দোলনকে সুসংহত করেছিলেন।

নিসার আলী ওরফে তিতুমীর রহ.-এর জীবন ও অবদান

প্রশ্ন : ৩৭ : নিসার আলী কে ছিলেন? তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : নিসার আলী ওরফে তিতুমীর রহ. ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর আন্দোলনের বঙ্গদেশীয় একজন বলিষ্ঠ নেতা। মুসলমানদের উপর হিন্দু জমীদার নীলকর সাহেবদের সীমাহীন উৎপীড়ন তাঁর হৃদয়ে ভীষণভাবে আঘাত হানে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর আদর্শকে সামনে রেখে নিপীড়িত মুসলমানদের মুক্তির জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম নিসার আলী, তবে তিনি তিতুমীর নামেই অধিক পরিচিত। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাসান আলী ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত কৃষক।

হজ্জ সফর ও ধর্মীয় শিক্ষা

১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। হজ্ব পালনের পর দীর্ঘ পাঁচ বছর মক্কা নগরীতে অবস্থান করে দ্বিনী ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণতা অর্জন করেন।

জিহাদের দীক্ষা লাভ

মক্কা শরীফে অবস্থান কালে সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর সংশ্রবে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর থেকে জিহাদী চেতনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

তিতুমীরের আন্দোলনের কর্মসূচি

তিতুমীর নিজ মুরশিদ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. থেকে জিহাদী দীক্ষা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহিত পদক্ষেপগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত।

এক. মুসলিম সমাজ থেকে হিন্দুয়ানী প্রথার বিলুপ্ত সাধন এবং মুসলমানদেরকে দ্বীন পালনের প্রতি আহ্বান

এ দেশের মুসলমানরা দীর্ঘ দিন যাবৎ হিন্দুদের সাথে উঠা-বসা করার ফলে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের হিন্দুয়ানী প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এমনকি হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসব পালনও মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি এর কঠোর বিরোধিতা করেন।

দুই. জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করণ

তিতুমীরের প্রচারণার কারণে দলে দলে লোক তাঁকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। মুসলমানদের ঈমান-আমল হেফজতের জন্য তিতুমীর একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জনগণের মধ্যে তিনি স্বাধীনতার চেতানা উজ্জীবিত করেন। জিহাদী তৎপরতা চালানোর জন্য তিনি কলিকাতার অদূরে নারিকেল বাড়িয়ায় একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

তিন. ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

মুসলমানদের উপর হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, কৃষ্ণদেব নামে একজন জমিদার মুসলমামদের দাড়ির উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করে। তিতুমীর মুসলমানদেরকে এই কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর পরামর্শ দেন। এতে জমিদাররা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে। গোবরডাঙ্গার জমিদার কালি প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণিয়ার জমিদার কৃষ্ণরায় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তিতুমীর বাহিনীর কাছে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

এ ছাড়া স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে তিনি অসাধারণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার বেশ কিছু জমিদারদেরকে তিনি পরাস্ত করেন। তাদের জমিদারীর এলকাগুলো অধিকার করে তিনি তাতে স্বধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। মিসকিন খাঁকে প্রধানমন্ত্রী এবং মাসুদ খাঁকে সে রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

জমিদাররা তিতুমীরের সাথে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে ইংরেজদের দারস্থ হয় এবং তাদের সহযোগিতা কমানা করে। ইংরেজ মেজিস্ট্রেট তাঁকে দমন করার জন্য আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তিতুমীরের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এতে তৎকালীন ইংরেজ বড় লাট বেন্টিক ক্ষুব্ধ হয়ে কর্ণেল স্টুয়ার্ডের নেতৃত্বে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে শক্তিশালী এক সেনাদল প্রেরণ করে।

উক্ত বাহিনীর সাথে বেশ কয়েকটি কামান ও প্রচুর গোলা-বারুদ ছিল। তিতুমীর নিজ বাহিনী নিয়ে একমাত্র বাঁশের লাঠি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়ে যান। কিন্তু কামান ও গোলা-বারুদের সমানে বাঁশের লাঠি নিয়ে তারা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে নি। ইংরেজদের গোলায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তিতুমীরও বীরবিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান।

উপসংহার

নিসার আলী তিতুমীর বাংলার মানুষকে ইংরেজ নীলকর ও অত্যাচারী জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতে অমীয় সুধা পান করেন।

সিপাহী বিপ্লব, তার ফলাফল ও বিপ্লবোত্তর মুসলমানদের অবস্থা

প্রশ্ন : ৩৮ : সিপাহী বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর উপমাহদেশের মুসলিম সমাজ ও উলামায়ে কিরামের অবস্থা আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর অসন্তোষের এক জ্বলন্ত প্রকাশ। এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের অপরাধে মুসলিম সমাজ ও উলামায়ে কিরামের উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের খড়গ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

সিপাহী বিপ্লবের কারণসমূহ

রাজনৈতিক কারণ

পলাশী যুদ্ধের একশত বছরের মধ্যে ধূর্ত ইংরেজরা কৌশলে গোটা উপমাহাদেশ অধিকার করে নেয়। এজন্য তারা সম্রাজ্য বিস্তারে গাদ্দার তৈরি, হিন্দু মুসলিম পরস্পরকে উস্কে দেওয়ার নীতি, ষড়যন্ত্র এবং শোষণনীতি গ্রহণ করেছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

ইংরেজরা সেকালে মুসলমানদের জায়গীর বাতিল করে দেয়। নতুন ভূমিনীতির মধ্যমে কৃষকদের ভূমির মালিকানা জমিদারদের দিয়ে দিয়েছিল। মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে এবং দেশীয় ও ইংরেজ সিপাহী এবং অফিসারদের মধ্যে বেতন-ভাতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্য গড়ে তোলে।

ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক কারণ

ইংরেজরা হিন্দু মুসলিম ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর উপর ধর্মীয় আগ্রাসন চালায়। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত কারার অপচেষ্টা চালায়। সাথে সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ভারতবাসীদের উপর চালিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালায়।

সামরিক কারণ

সিপাহীদেরকে নিজ খরচে দূরদেশে যুদ্ধ যাত্রায় বাধ্য কারা হয়। তাদেরকে মুসলিম ধর্মে নিষিদ্ধ শূকরের চর্বিযুক্ত এবং হিন্দু ধর্মমতে গরুর চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহারে বাধ্য করা হয়।

বিপ্লব সৃষ্টিতে উলামায়ে কিরামের অবদান

৬ই মে ১৮৩১ সালে বালাকোটের পারাজয়ের পর বেঁচে যাওয়া মুজাহীদগণ ও উলামায়ে কিরাম স্বাধীনতা আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। দিল্লী, পাটনা এবং আফগান সীমান্ত এলাকা থেকে আন্দোলন পরিচালিত হয়। গোপনে সারা দেশে চলতে থাকে যুদ্ধের প্রস্তুতি। সেনাবাহিনীর মধ্যেও যুদ্ধেরে চেতনা উজ্জীবিত করা হয়। পরিশেষে ১৮৫৭ সালে দেশীয় সিপাহী, উলামায়ে কিরাম এবং স্বাধীনতাকামী আমজনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লব। যা সিপাহী বিদ্রোহ নামেও পরিচিত।

ফলাফল

শুরুতে ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লব শুরু হলেও পরবর্তীকালে বিদ্রোহীদের মাঝে মতানৈক্য, দেশীয় রাজন্যবর্গের শত্রুতা, বৃটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক শক্তি এবং বিপ্লবীদের বলিষ্ঠ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এ জাগরণ আপাতত ব্যর্থ হয়। তবে তা পরবর্তীকালে “বৃটিশ খেদাও” আন্দোলনে ভারতবাসীকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

বিপ্লবোত্তর উপমহাদেশে মুসলিম সমাজ ও উলামা কিরামের অবস্থা

ইংরেজরা মুসলমানদেরকে তাদের প্রধান শত্রু মনে করত। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার কারণ জানতে চেয়ে ইংরেজ সরকার কোম্পানির নিকট রিপোর্ট চাইলে ডঃ উইলিয়াম লিওর এ মর্মে রিপোর্ট করেন যে, ১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহ মূলত মুসলমানদের আন্দোলন। আর এর নেতৃত্বে প্রদান করেছে আলেম সমাজ। এ রিপোর্টের পর মুসলিম সমাজ ও উলামা কেরামে উপর নেমে আসে নির্যাতনের বিভীষিকা। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ক. মুসলিম সমাজের অবস্থা

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী ধর্ম। তাই মুসলমানারা উপমাহাদেশে ইংরেজদের দখল মেনে নিতে পারে নি। একারণে ইংরেজরা নানা কৌশলে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতবাসীর উপর নেমে আসা অত্যাচার ও নির্যাতন নিপীড়নের মূল শিকার হয় মুসলিম সমাজ। ইংরেজরা দু'লাখ মুসলমানকে শহীদ করে। শিশু, বৃদ্ধ ও নারী কেউ তাদের পৈশাচিক নির্যাতন থেকে রেহাই পায় নি। ১৮৫৭ সালে ১৮ই নভেম্বর দিল্লীর জামে মসজিদের আঙ্গিনায় এক দিনে সাতাশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

অনেক মুসলমানকে শূকরের চামড়ায় জড়িয়ে কিংবা গায়ে শূকরের চর্বি মাখিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। খাজা হাসান নিজামী লিখেছেন, হাজার হাজার মুসলিম নারী ইংরেজদের পৈশাচিক নির্যাতনের ভয়ে নিজেরাই কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। অনেক পুরুষ নিজ স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা করার পর নিজেরাও আত্মহত্যা করেছে। এ ছাড়াও মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবেশ ইংরেজদের হাতে ধ্বংস হয়। ইতিহাসে এ জাতীয় পশুত্ব ও হিংস্রতার নজির মেলা ভার।

খ. উলামা কিরামের অবস্থা

বিপ্লব ব্যর্থ হলে উপমাহদেশেরে উলামায়ে কিরামের উপর নেমে আসে ইতিহাসের সবচেয়ে পৈশাচিক নির্যাতন। অর্ধলক্ষাধিক আলেমেকে ইংরেজরা অত্যন্ত নির্মম ভবে হত্যা করে। শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ., হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ., ফজলে হক খায়রাবাদী রহ. সহ সহস্রাধিক আলেমকে আন্দামান, মাল্টা, সাইপ্রাস ও কালাপানিতে নির্বাসন দিয়ে তাদের উপর চালানো হয় অমানবিক নির্যাতন। তাদের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে আন্দোলন চালিয়ে যওয়া তো দূরের কথা, কাফন দাফন করার মতো ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী আলেমও খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

উপসংহার

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কবল থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে সিপাহী বিপ্লব মুসলমান আলেম সমাজ ও জনসাধারণের এক গৌরবজ্জ্বল ও অভূতপূর্ব অবদান।

প্রশ্ন : ৩৯ : সিপাহী বিপ্লব ও তার ফলাফল বর্ণনা কর

উত্তর : সিপাহী বিপ্লবের প্রেক্ষপট

বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ রহ. ও ইসমাঈল রহ. শাহাদাৎ লাভের পর এ আন্দোলনের কর্মীবাহিনী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি কেন্দ্র ছিল দিল্লিতে। এটিই ছিল মূল কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন শাহ ইসহাক রহ.। এরপর তিনি হজ্বে চলে যাওয়ার পর শাহ আব্দুল গণী রহ.। এভাবে পর্যায়ক্রমে এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.। তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে উত্তর ও মধ্য ভারতে ইংরেজ বিরোধী চেতনা আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং সর্বত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নে যুদ্ধ ও শাহাদাতের তীব্র আগ্রহ আন্দোলিত হতে থাকে।

অন্য একটি কেন্দ্র ছিল পাটনায়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলী রহ., মাওলানা বিলায়েত আলী রহ. ও মাওলানা ফারহাত আলী রহ.-এর ন্যায় স্বাধীনতাকামী বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী তিন মহান ব্যক্তিত্ব। তাদের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ভারতের গোটা অঞ্চলে স্বাধীনতার চেতনা সম্প্রসারিত হয়।

আরেকটি কেন্দ্র ছিল আফগান ও সীমান্ত অঞ্চলে। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী রহ., মাওলানা ফয়েজ আলী, ইয়াহইয়া আলী রহ. ও আকবর আলী রহ.-এর মতো খ্যাতনামা আত্মত্যাগী মুজাহিদবৃন্দ। এদের প্রচেষ্টায় আফগান সীমান্ত অঞ্চল, সিন্ধু, বেলুচ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। এভাবেই এ সকল উলামায়ে কিরামের প্রচেষ্টায় দেশের আনাচে-কানাচে কোম্পানীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। গোপনে গোপনে সারাদেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

এদিকে দেশীয় সৈনিকদের সাথে ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ, বৃটিশ সৈনিকদের তুলনায় দেশীয় সৈনিকদের বেতনের হার কম হওয়া, বৃটিশ সরকারের ইচ্ছামত বহিঃরাষ্ট্রের যে কোনো স্থানে প্রেরণের বাধ্যতামূলক আইন, যুদ্ধে দেশীয় সৈনিকদের অগ্রে প্রেরণ এসব আচরণ বৃটিশ সরকারের প্রতি সৈনিকদের রুষ্ট করে তোলে। অধিকন্তু এদের উপর ইংরেজদের ধর্মীয় আগ্রাসন, রাজনৈতিক নির্যাতন ও সামাজিক নিপীড়নের নির্মম ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডও সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সারাদেশের সিপাহীর অন্তরে ইংরেজ বিরোধী চরম ক্ষোভ সঞ্চিত হয়। এ হেন মুহূর্তে ইংরেজ সরকার আবার এনফিল্ড রাইফেলে ব্যবহারের জন্য একধরনের নতুন টোটা প্রবর্তন করে। যে টোটা গরু

ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত ছিল। মুসলমানদের কাছে শূকর হারাম আর হিন্দুদের কাছে গরু দেবতা। ফলে পশ্চিম বঙ্গের বেকারপুরে সেনানিবাসে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকরা এ টোটা ব্যবহার করতে অসম্মতি জানায়। এ নিয়ে উত্তপ্ততার এক পর্যায়ে ইংরেজ অফিসাররা এ দেশীয় সৈনিকদের সকলকেই নিরস্ত্র করে ফেলার কুমতলবে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহ ক্রমান্বয়ে সারাদেশের সেনানিবাস ও স্বাধীনতাকামীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র যথা– দিল্লী, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, রায়বেরেলী ও ঝাঁসীসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে সারাদেশের আলেম-উলামা ও স্বাধীনতাকামী মানুষ একাত্ম হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লব ও ফলাফল

সঞ্চিত এ ইংরেজ বিরোধী চরম ক্ষোভকে কেন্দ্র করে সারাদেশের আলেম-উলামা ও সিপাহী জনতা স্বাধীনতাকামী মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোটা দেশের আনাচে-কানাচে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এ যুদ্ধ।

ইংরেজ বিরোধী এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মূলত দুটি কেন্দ্র থেকে। একটি ছিল থানা ভবন। যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ., রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. কাসিম নানুতবী রহ.। অপর কেন্দ্রটি ছিল আম্বালায়। যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী রহ. ও মাওলানা ইয়াহইয়া আলী রহ.।

একপর্যায়ে হাজী সাহেবকে আমীর, রশীদ আহমাদ রহ.-কে প্রধান বিচারপতি ও নানুতবী রহ.-কে প্রধান সেনাপতি করে একটি স্বাধীন সরকারেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু ইংরেজদের বিশাল সৈন্যবাহিনী, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ অভ্যুত্থান সফলতার মুখ দেখতে পারে নি। ক্রমান্বয়ে সব এলাকা আবার ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। গণমানুষের রক্তের বন্যার উপর দিয়ে ইংরেজ সরকার পুনরায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে নেয়।

ইংরেজদের আগ্রাসনের ফলে মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতি ও সমস্যার বিবরণ

প্রশ্ন : ৪০ : ইংরেজদের আগ্রাসনের ফলে মুসলমানরা যে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : সুদীর্ঘ সাতশত বছর ভারতবর্ষ শাসন করার পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন পারস্পরিক আত্মকলহ এবং বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে, তখন সুযোগসন্ধানী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বেনিয়ারা বিভিন্নমুখী ষড়যেন্ত্র লিপ্ত হয় এবং মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। এ কারণে মুসলমানদের তারা প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করত। কাজেই মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার জন্য তারা যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করেছিল। এ ক্ষেত্রে এমন কোনো হীন পন্থা বাদ ছিল না, যা তারা গ্রহণ করে নি। ক্ষমতার মসনদকে নিষ্কণ্টক করার স্বার্থে বিভিন্ন দিক থেকে তারা মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালায়। ফলে উপমহদেশের মুসলমানগণ অবর্ণনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইংরেজ কর্তৃক মুসলমানদের উপর আগ্রাসন এবং নির্যাতনের দিকগুলো নিম্নরূপ :

১। রাজনৈতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন।

২। অর্থনৈতিক আগ্রাসন।

৩। ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক আগ্রাসন।

৪। পাস্পরিক কলহ সৃষ্টি এবং হকপন্থীদের অবদমিত রাখার বিভিন্ন কলা-কৌশল।

১. রাজনৈতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজরা মুসলামনদেরকেই তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি এবং স্থায়ী শত্রু মনে করত। তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল বলেছিলেন– মূলত মুসলমানরাই যে আমাদের একমাত্র শত্রু, এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে উলামায়ে কিরাম। তাই ইংরেজরা ক্ষমতায় আরোহণের পর সাধারণ মুসলমান ও আলেম সমাজের উপর অকথ্য নির্যাতন চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইংরেজদের অত্যাচারকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. আলেম সমাজের উপর নির্যাতন।

খ. সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন।

ক. আলেম সমাজের উপর নির্যাতন নিম্নরূপ

১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী দখল করার মাধ্যমে ইংরেজরা প্রায় গোটা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়। তখন শাহ্ আব্দুল আযীয রহ. ভারতকে "দারুল হরব" ঘোষণা করেন। ফলে সারা দেশে ইংরেজ বিরোধী যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়, তাতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী আলেমসমাজকে অবদমিত করার লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়।

দেশীয় মীরজাফরদের যোগ-সাজশে আলেমসমাজের আন্দোলনকে চরমভাবে ব্যাহত করে দেয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর উলামায়ে কিরামের উপর ইংরেজদের নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এবং তাঁর একান্ত শিষ্য মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. ও রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ.-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। ফলে হাজী সাহেব কিছুদিন আত্মগোপন থেকে হিজরত করে মক্কা শরীফ চলে যান। কাসেম নানুতবী রহ. দেশে আত্মগোপন করে থাকেন। মাওলানা গঙ্গুহী সাহেব রহ. কে গ্রেফতার করে খোলা তবারীর নিচে পায়ে হাঁটিয়ে মুজাফফর নগর নেওয়া হয়। ছয় মাস বন্দিজীবন যাপনের পর নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ না থাকায় তিনি ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে যান। ১৮৫৭ সলের সিপাহী বিপ্লব ও পরবর্তী সময়ে দুই লাখ মুসলমান নার-নারীকে শহীদ করা হয়। এর মধ্যে উলামা কিরাম ছিলেন একান্ন হাজার।

এডওয়ার্ড টমাস বলেন, শুধু দিল্লীতেই পাঁচশত আলেমকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। উলামাদের নানামুখী আন্দোলনে ইংরেজরা ছিল আতঙ্কিত। তাই তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শাইখুল হিন্দ রহ. এবং তাঁর চার সাথী হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ., মাওলানা উযায়ের গুল রহ., মাওলানা হাকিম নুসরাত হুসাইন রহ., মৌলভী ওয়াহিদ আহমদ রহ. কে সাড়ে তিন বছর মাল্টায় বন্দি করে রাখে। এ ছাড়া বহু আলেমকে মাল্টা, আন্দামান ও সাইপ্রাসে নির্বাসন দেয়। এভাবে আলেমসমাজকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সমূলে উৎখাত করার পায়তারা চালায়।

খ. সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন

ইংরেজরা একমাত্র মসলমানদেরকেই মূল শত্রু মনে করত। ফলে বিভিন্ন সময়ে তারা মুসলামানদের উপরে বিভিন্ন কৌশলে নির্যাতন চালাত। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতবর্ষের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের যে বিভীষিকা নেমে আসে, মুসলমানরাই ছিল তার মূল শিকার। অবুঝ শিশু ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষও ইংরেজদের অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর দিল্লীর জামে মসজিদের আঙ্গিনায় এক দিনে সাতাশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। অনেককে শূকরের চামড়ায় মুড়িয়ে, অনেকের গায়ে শূকরের চর্বি মাখিয়ে আগুনে জালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। খাজা হাসান নিজামী লিখেছেন, হাজার হাজার মুসলিম নারী ইংরেজদের পৈশাচিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আবার অনেক পুরুষ নিজের স্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা করে নিজেরাও আত্মহত্যা করেছে। হুগলী নদীর স্রোতে হাজার হাজার মুসলমানের লাশ ভেসে যেত প্রতিদিন।

২. অর্থনৈতিক আগ্রাসন

বৃটিশরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী করতে হলে মুসলমানদেরকে আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখতে হবে। এ সিদ্ধান্ত মতে তারা মুসলমানদেরকে কাঙ্গাল বানানোর জন্যে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের জঘন্যতম কৌশল ছিল নিম্নরূপ :

ক. সরকারী চাকরি ও সুযোগ-সুবিধা থেকে মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করা হত।

খ. অলাভজনক উৎপাদন– যেমন : নীল চাষ, আফিম চাষ, পপি চাষ, তামাক পাতা চাষ ইত্যাদি কাজে চাষে মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হত।

গ. মুসলিম ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকদেরকে নানা অজুহাতে হয়রানী করা হত। তাদের উপর অন্যায়ভাবে কর আরোপ করা হত। এমনকি কোথাও কোথাও তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘ. বিভিন্ন রাজ্যে নতুন নতুন নবাব নিয়োগ করা হয়। নবাবরা নিজ নিজ নবাবী রক্ষায় ইংরেজদের জন্য রাজকোষাগার উজাড় করতে শুরু করে। এভাবে মাত্র নয় বৎসরে বাংলা থেকে ছয় কোটি ঊনচল্লিশ হাজার চৌদ্দশত আটা নব্বই পাউণ্ড লুটপাট করা হয়।

ঙ. কৃষকদের উৎপাদিত ফসল নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। স্যার জন সুঞ্জ বলেন : ইংরেজদের নিষ্পেষণ নীতি এ দেশ ও দেশবাসীকে এতটাই কাঙ্গালে পরিণত করে যে, এর নজীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

৩. শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আগ্রাসন

ইংরেজরা এ কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, এদেশের মানুষ যদি তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও আদর্শিক চেতনাকে গ্রহণ না করে, তা হলে তাদের ক্ষমতার মসনদ স্থায়িত্ব লাভ করবে না। এ উদ্দেশ্যে তারা নিম্নোক্ত কর্মসূচি বস্তবায়ন করে।

ক. মুসলিম জাতির কর্ণধার উলামা কিরামকে হত্যা বা দেশান্তর করে।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাট করে।

গ. আর্থিক সুবিধাদী প্রদানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা চালায়।

ঘ. বহু মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করে।

ঙ. ইংরেজী ও খ্রিষ্টানী শিক্ষা চালু করে বৃত্তি, চাকুরী এবং সরাকারী খেতাব ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মধ্যমে এ শিক্ষাকে লাভজনক করে জনগণের সমানে উপস্থাপন করে।

চ. রাষ্ট্রীয় অনুদান ও সরকারী জায়গীরের আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এবং ওয়াকফকৃত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে নতুন নতুন ভূমিনীতি প্রণয়ন করে এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান ও সরকারী জায়গীর বাতিল করে বন্ধ ও উচ্ছেদ করে দেয়।

ছ. মুসলমানদের ঐক্যকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পুরনো ধর্মীয় বিভেদ উস্কে দেয় এবং বহু নতুন ফেরকা, যেমন– কাদিয়ানী, আহলে হাদীস, আহলে কুরআন, মওদুদীবাদ ইত্যাদির জন্ম ও তাদের বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। এভাবে হকপন্থীদের ব্যাপক ক্ষতি করা হয়।

জ. হিন্দু, শিখ, আর্য সমাজসহ অন্যান্য জতি-গোষ্ঠীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

৪. সামাজিক আগ্রাসন

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের জন্য ইংরেজদের অন্যতম অপকৌশল ছিল বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে একটি স্থায়ী বিবদমান পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখা। সে লক্ষ্যে তারা শুরু থেকেই মুসলমানদের সাথে বৈরিতা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সখ্যতার নীতি গ্রহণ করে। ভূমিনীতি, পাঁচসালা-দশসালা নীতি প্রবর্তন করে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। তা ছাড়া স্থানীয় প্রশাসন তথা মহকুমা, ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েতে অন্যান্যদেরকে একচেটিয়া সুবিধা প্রদান করে। বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে মুসলিমবিরোধী পক্ষকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করে।

উপসংহার

ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর বৃটিশরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদকে পাকাপোক্ত কারার হীন মানসে অর্থনৈতিক, সমাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আগ্রাসন চালিয়ে মুসলমানদের যে সর্বনাশ করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল; এমনকি সেই ক্ষতি থেকে আজও মুসলিম সমাজ পুরোপুরি উঠে দাঁড়াতে পারে নি।

প্রশ্ন : ৪১ : ভারতে বৃটিশ সরকার ও ইংরেজদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর :

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সাথে সাথে ইংরেজরা এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে সমূলে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগ্রাসন চালাতে থাকে। তাদের এ আগ্রাসনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন।

(২) ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা।

(৩) মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা।

(৪) পারস্পরিক আত্মকলহ সৃষ্টি এবং হকপন্থীদের অবদমিত করার পায়তারা।

(১) ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন

শিক্ষাই জাতীয় মেরুদণ্ড। যে জাতি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সে জাতি মৃত। সেকালে ভারতবর্ষের মুসলমানরা ধর্মভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম সরকারদের পৃষ্ঠপোষকতায় শহর বন্দর ও গ্রামে-গঞ্জে গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চলত সরকারী জায়গীরের আয় ও রাষ্ট্রীয় অনুদানের উপর ভিত্তি করে।

ইংরেজরা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মুসলমানরা সহজে নতি স্বীকার করার জাতি নয়। তাই এ দেশে তাদের ক্ষমতার মসনদকে সুদৃঢ় করতে হলে মুসলিম জাতির জাতিসত্ত্বাবোধ ও আদর্শিক চেতনাকে হত্যা করতে হবে। আর মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতিই তাদের চেতনার উৎস। সুতরাং তার ধ্বংস সাধনকেই তারা প্রধান টার্গেট হিসেবে নির্ধারণ করে।

ইংরেজরা মুসলমানদের এ চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রথমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রাষ্ট্রীয় অনুদান বন্ধ করে দেয় এবং ভূমি সংস্কারের নামে জায়গীরগুলোও বাতিল করে দেয়। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাভাবে মুখ থুবড়ে পরে। এদিকে গণচাঁদার উপর ভিত্তি করে যে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান তখনও দাঁড়িয়েছিল, সেগুলোতেও নানাভাবে হয়রানী করা হয়। ফলে দেশের ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। যেখানে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে কেউ না কেউ আলেম ছিল। সেখানে পরবর্তীকালে গ্রামকে গ্রাম খুঁজেও জানাযা পড়ানোর জন্য একজন আলেমও পাওয়া যেত না।

মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার এ করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সেস্থানে তারা ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায়। সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম সন্তানদের চেতনাকে প্রভাবিত করা হয় ভিন্ন খাতে এবং একই সঙ্গে তাদেরকে এমন এক জীবনবোধ ও চেতনার সাথে পরিচিত করে তোলে, যা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী।

এদিকে মুসলমানদের লেবাস পোশাককে ব্যঙ্গ করার জন্য খানসামা ও দারোয়ানদের পোশাক নির্ধারণ করা হয়েছিল পায়জামা, পাঞ্জাবী ও পাগড়ি। ইসলামী জীবনবোধ ও চর্চাকে সেকেলে বলে ব্যঙ্গ করা হত। এভাবে ক্রমান্বয়ে তারা ইসলামী জীবনধারার পরিবর্তে পাশ্চাত্য জীবনধারার সাথে পরিচিত করে তুলতে চাইল মুসলমানদেরকে। আর ধ্বংস করে দিতে লাগল মুসলমানদের মূল আদর্শিক চেতনাকে।

(২) ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। ক্রমশ এ দেশের মানুষকে খ্রিষ্টান বানানোর বিভিন্ন অপকৌশল চালাতে থাকে। দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের শিকার এ জাতিকে চাকরি ও সুন্দরী যুবতীর প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে ১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষে যেসব শিশু এতিম হয়েছিল, তাদেরকে লালন-পালনের নামে তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছিল। মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাদ্রীদেরকে এ দেশে আমাদানী করা হত। তারা বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে খ্রিষ্টান ধর্মের মহত্ত্ব ও ইসলামের অসারতা জনসম্মুখে তুলে ধরত। এভাবে বহু মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে।

(৩) মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা

একদিকে যেমন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তাদের প্রিয় ইবাদতখানা মসজিদকে গির্জা বানানোর চেষ্টা চালিয়েছে। দিল্লির জামে মসজিদকে গির্জা বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সে সময় বহু মসজিদকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির ও গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(৪) পারস্পরিক আত্মকলহ সৃষ্টি এবং হকপন্থীদের অবদমিত করার পায়তারা

ইংরেজদের অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে যে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, তা ভেঙে দেওয়ার জন্য ইংরেজরা নানা রকম কুট-কৌশল

শুরু করে। মুসলমানদের মাঝে পরস্পর আত্মকলহ বাঁধিয়েও হকপন্থীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে স্বাধীনতার শক্তিকে অবদমিত করার পায়তারা চালায়। এজন্য ইংরেজরা আহমদ রেজা খান ও তার দলকে ক্রয় করে নিয়ে সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও হকপন্থী উলামায়ে কিরামকে ওয়াহাবী মতাবলম্বী বলে আখ্যা দিয়ে দেয় এবং সাধারণ জনগণের মাঝে তাদেরকে হেয় করার চেষ্টা করে। অপরদিকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে দাঁড় করিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দেওয়ায় মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও কলহ সৃষ্টি করে। ফলে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি অনেকটাই হ্রাস পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

প্রশ্ন : ৪২ : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : সাম্রাজ্যবাদী দখলদার ইংরেজ বেনিয়াদের কবল থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিচালিত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলে উলামায়ে কিরাম আন্দোলনের মাধ্যমে উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশে সৈন্যবাহিনী গঠন, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তৈরি এবং খাঁটি দ্বীনী ইলম সংরক্ষণ ও প্রসারের সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় মাদারে ইলমী ঐতিহাসিক 'দারুল উলূম দেওবন্দ'। নিম্নে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোকপাত করা হল।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটকে মোটামুটি চারটি শিরোনামে উপস্থাপন করা যায়

(ক) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। (খ) অর্থনৈতিক পেক্ষাপট।

(গ) সামাজিক পেক্ষাপট। (ঘ) ধর্মীয় প্রেক্ষাপট।

(ক) রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বৃটেনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমন করে। মোঘল সম্রাটদের বিলাসিতা, রাজ্য-পরিচালায় অদক্ষতা এবং দেশীর রাজ্যন্যবর্গের পারস্পরিক কোন্দল ও নানামুখী দুর্বলতার সুযোগে বৃটিশ বেনিয়ারা উপমহাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র, চকচক্রান্ত ও দেশীয় গাদ্দারদের সহযোগিতায় ২৩ শে জুন ১৭৭৫ সালে পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা-বিহার-ড়ড়িষ্যার অধিকার কেড়ে নেয়।

এরপর পর্যায়ক্রমে ইংরেজরা ২২ শে অক্টেবর ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মোগল সম্রাট শাহ আলমকে পরাজিত করে দিল্লীর লালকেল্লা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা ছাড়া অবশিষ্ট মোঘল সাম্রাজ্য, ১৭৭৪ সালে রোহিলাখণ্ড, ১৯৯৯ সালে সুলতান টিপুকে পরাজিত করে মহিশূর, ১৮৪৩ সালে সিন্ধু এবং ১৮৪৮ সালে পাঞ্জাব অধিকার করে নেয়। এভাবে সল্পসময়ের ব্যবধানে গোটা ভারতবর্ষে বৃটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী ধর্ম। তাই এধর্মের অনুসারীগণ ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকারকে মেনে নিতে পারে নি। হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর ঐতিহাসিক 'দারুল হরব' ফাতাওয়ার পর থেকে শুরু হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন। সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. ও সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ রহ. এর সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও বালাকোঠের লড়াই এবং ১৮৫৭ সালে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র বিপ্লব মূলত তারই সুফল।

সিপহী বিপ্লবের ব্যর্থতা উলামায়ে কিরামকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তারা আপাতত সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে গণআন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে উপনিবেশক ইংরেজ বেনিয়াদেরকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তারা। কাজেই দক্ষ, যোগ্য, বলিষ্ট ও আত্মত্যাগী নেতৃত্বের জন্য ব্যক্তি গঠনের মহান চেতনাকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ।

(খ) অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার উদ্দেশ্য বৃটিশ সম্রাজ্যবাদী সরকার বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় :

(ক) সরকারী চাকরির সুযোগ-সুবিধা থেকে মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করে।

(খ) অলাভজনক উৎপাদন, যেমন– নীল চাষ ইত্যাদিতে মুসলমনদেরকে বাধ্য করে।

(গ) মুসলিম ব্যবসায়ী ও শিল্প কলকারখানার মালিকদেরকে নানা অজুহাতে হয়রানী করে। তাদের উপর অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কর আরোপ করে এবং তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র তুলে ধরে ডাব্লিউ এস ব্লিন্ট তৎকালীন বৃটিশ সরকারকে এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে, আমরা যদি লুট-পাটের এ ধারা অব্যহত রাখি, তা হলে এমন একসময় আসবে, যখন ভারতীয়রা বাধ্য হয়ে একে অপরকে ভক্ষণ করবে। এমনি এক কঠিন মুহূর্তে জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ।

(গ) সামজিক প্রেক্ষাপট

উপমহাদেশের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইংরেজদের অন্যতম কৌশল ছিল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে স্থায়ীভাবে একটি বিবদমান পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা। এ উদ্দেশ্যে ইংরেজরা শুরু থেকেই মুসলমানদের সাথে বৈরিতা এবং অন্যান্য জাতির সাথে সখ্যতার নীতি গ্রহণ করে। ভূমিনীতি, পাঁচসালা-দশসালানীতি প্রবর্তন করে এবং জমিদারী ক্রয়ে হিন্দুদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ছাড়া স্থানীয় প্রশাসন তথা মহকুমা, ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েতে অন্যান্যদেরকে একচেটিয়া সুবিধা প্রদান করে। বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে মুসলিমবিরোধী পক্ষকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করে। সামাজিকভাবে মুসলমানদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ।

(ঘ) ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

সামরিক শক্তির জোরে একটি ভূখণ্ড দখল করা যায়, কিন্তু সেখানে দখল দারিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে দখলদারদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনাকে উক্ত ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রবিষ্ট করতে হয়। বৃটিশ বেনিয়ারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তায়ন করে।

১। মুসলিম জাতির কর্ণধার আলেম সমাজকে হত্যা কিংবা দেশান্তর করা হয়।

২। রাষ্ট্রীয় অনুদান ও সরকারী জায়গীরের আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এবং ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে নতুন ভূমিনীতি প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অনুদান ও সরকারী জায়গীর বাতিল করে বন্ধ ও উচ্ছেদ করা হয়।

৩। ইংরেজী ও খ্রিষ্টানী শিক্ষা চালু করা হয়। বৃত্তি, চাকরি, সরকারী খেতাব ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ শিক্ষাকে লাভজনক প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

৪। ব্যাপকভাবে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা হয়। অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বহু মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করা হয়। সাথে সাথে অসংখ্য মসজিদকে গির্জা, মদ্যশালায় ও আস্তাবলে রূপান্তরিত করা হয়।

৫। মুসলিম পারস্পরিক ঐক্য নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে পুরনো ধর্মীয় বিবাদ উস্কে দেয়া হয় এবং বহু নতুন ফেরকা, যেমন– কাদিয়ানী, আহলে কুরআন, আহলে হাদীস ও মওদুদী ইত্যাদির জন্ম এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে।

৬। হিন্দু, শিখ, আর্য সমাজ ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। ইংরেজদের এ হেন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্ম, মুসলিম জাতিসত্তা এবং ইসলামী শিক্ষা ধ্বংসের মুখে পড়ে। এমনি এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ।

উপসংহার : বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় আগ্রাসনে বিপর্যস্ত মুসলিম জাতিকে রক্ষার্থে, খাঁটি ইসলামী শিক্ষার বিস্তার এবং ইংরেজ বিতাড়নের মাধ্যমে উপমহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ।

প্রশ্ন : ৪৩ : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সূচনা কিভাবে হয় এবং কখন কোথায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রতিষ্ঠাতা ছয় মহাপুরুষগণ কারা? বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : উপমহাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়াদের দখল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিপ্লব' ব্যর্থ হলে উলামায়ে কিরাম উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী ইশারা ও ইলহামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। এ ক্ষেত্রে আকাবেরে সিত্তাহ বা ছয়জন মহাপুরুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এসম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

যেভাবে শুরু হয় দারুল উলূম দেওবন্দের পদযাত্রা

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলে ইংরেজদের ধরপাকড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য থানাভবন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. হিজরত করে মক্কা শরীফ চলে যান। প্রধান বিচারপতি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এবং প্রধান সেনাপতি হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. আত্মগোপন করেন। সিপাহী বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানকারী আলেম সমাজকে সমূলে নির্মূল করার লক্ষ্যে ইংরেজরা হাজার হাজার আলেমকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শত শত আলেমকে বন্দি ও দেশান্তর করে। দিল্লীর মাদরাসা রহিমিয়াহসহ যে দু' একটি মাদরাসা তখনো চালু ছিল,

সেগুলোও বন্ধ করে দেয়। চিন্তাশীল যে কজন আলেম তখনও জীবিত ছিলেন, এ পরিস্থিতি দেখে তারা উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ ছিল হযরত নানুতবী রহ.-এর শ্বশুরালয়। সাধারণ ক্ষমার সুবাদে গোপনীয়তা ছেড়ে বেরিয়ে আসা হযরত নানুতবী রহ. প্রায়ই দেওবন্দ যেতেন এবং সেখানকার স্বাধীনতাকামী আলেম সমাজ ও বুযুর্গদের সাথে উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরামর্শ করতেন। দীর্ঘ সাত-আট বছর এভাবেই কেটে যায়। তাঁরা সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু মাদরাসার রূপরেখা কি হবে এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহ হবে কিভাবে, তা নিয়ে তারা চিন্তিত ছিলেন।

হযরত হাজী আবেদ হুসাইন রহ. ছিলেন সেই বুযুর্গদের অন্যতম। তিনি দেওবন্দের ছাত্তা মাসজিদের ইমাম ছিলেন। একদিন বাদ ফজর তিনি উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুরাকাবায় রত ছিলেন। গায়েবীভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি গণচাঁদার উপর ভিত্তি করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ইশারা পান। তিনি মুরাকাবা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং কাঁধের রুমালকে থলির মতো বানিয়ে তাতে নিজের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম তিন টাকা রাখেন।

এরপর তিনি অন্যান্য বুযুর্গদের কাছে এবং আবুল বারকাত মহল্লায় গমন করেন। মওলানা মাহতাব আলী রহ. ছয় টাকা, মাওলানা ফজলুর রহমান রহ. বার টাকা, মাওলানা জুলফিকার আলী রহ. বার টাকা এবং মাওলানা ফজলুল হক রহ. ছয় টাকা প্রদান করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনশত টাকা জমা হয়ে যায়। এভাবেই ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

কখন কোথায় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়

হাজী আবেদ হুসাইন রহ. জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে মিরাটে অবস্থানরত হযরত মাওলানা নানুতবী রহ. কে এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, আমারা মাদরাসার কাজ শুরু করে দিয়েছি, আপনি অবিলম্বে চলে আসুন। তিনি মৌলভী মাহমুদ রহ. কে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। ৩০শে মে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ মুতাবেক ১৫ই মুহাররম ১২৮৩ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ থানাধীন ছাত্তা মসজিদের প্রাঙ্গনে একটি ডালিম গাছের ছায়ায় হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. কে পাঠ দানের মাধ্যমে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা ও সূচনা হয়।

আকাবিরে সিত্তাহ্ তথা ছয় মহাপুরুষ

নাম	জন্ম	প্রতিষ্ঠাকালে বয়স	মৃত্যু
১। মওঃ জুলফিকার আলী রহ.	১৮১৯ ইং ১২৩৭ হি.	৪৫ বৎসর	১৯০৪ ইং ১৩২২ হি.
২। মাও ঃ ফজলুর রহমান রহ.	১৮২৯ ইং ১২৪৭ হি.	৩৫ বৎসর	১৯০৭ ইং ১৩২৫ হি.
৩। মাওঃ কাসেম নানুতবী রহ.	১৮৩২ ইং ১২৪৮ হি.	৩৪ বৎসর	১৮৮০ ইং ১২৯৭ হি.
৪। মাওঃ ইয়াকুব নানুতবী রহ.	১৮৩৩ ইং ১২৪৯ হি.	৩৩ বৎসর	১৮৮৪ ইং ১৩০২ হি.
৫। হাজী আবেদ হুসাইন রহ.	১৮৩৪ ইং ১২৫০ হি.	৩২ বৎসর	১৯১২ ইং ১৩২৮ হি.
৬। মাওলনা রফিউদ্দীন রহ.	১৮৩৬ ইং ১২৫২ হি.	৩০ বৎসর	১৮৯০ ইং ১৩০৬ হি.

উপসংহার : উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে, উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ছিল একটি ঐতিহাসিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

প্রশ্ন : ৪৪ : দারুল উলূম দেওবন্দ কখন কোথায় ও কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

এ উপমহাদেশে ইসলাম এসেছে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি.-এর যুগে। সেই থেকে নিয়ে 'মা আনা 'আলাইহি ওয়া আসহাবী'-এর কেতনধারী এক জামাতের নিরলস প্রচেষ্টায় হিন্দু প্রধান ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে একসময় এ দেশে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচার এ দেশের মানুষের নিজস্ব শিক্ষা-সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারে পরিণত হয়। কিন্তু সব যুগেই সত্যকে গ্রাস করে নেওয়ার জন্য বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা বিলীন করে দিতে চায় হকের অস্তিত্বকে। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

মোঘল আমলে মুর্খতার সুযোগ নিয়ে সম্রাট আকবর দ্বীনে ইলাহী আবিষ্কার করে উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে যখন নিঃশেষ করে দিতে চাইল, তখন মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. তাঁর সফল মোকাবেলা করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দিতে ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে বাতিল যখন নিজেকে দাঁড় করাতে চাইল, তখন এর মোকাবেলায় শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. নববী সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক সকল বিধি-বিধানকে বিশ্লেষণ করে ইসলামী জীবনবোধ ও আন্দোলনের এক নতুন রূপরেখা

ও নব্য বাতিলকে রুখার কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। এমনিভাবে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে এ উপমহাদেশের পথ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ব্যবসার ছদ্মাবরণে ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী এ দেশে আগমন করে।

তৎকালীন অপরিণামদর্শী রাজন্যবর্গের খেয়ালী বদান্যতায় তারা এ দেশে মজবুত ঘাঁটি করে নেয়। অবশেষে একদিন ছলেবলে কলে-কৌশলে মীর জাফর, ঘষেটি বেগমদের বিশ্বাসঘাতকতার যোগ-সাজশে নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে এদেশের ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নেয়। ফলে এদেশে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ধস নামে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজ করে দারুণ অস্থিরতা, সর্বত্র চলতে থাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হুকুমত। উলামায়ে কিরাম, স্বাধীনতাকামী তৌহিদী জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে।

শাহ আব্দুল আযীয রহ. ঘোষণা দেন, ভারত এখন থেকে দারুল হরব তথা শত্রু কবলিত দেশ। সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হল, একে স্বাধীন করা। দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এ ফতওয়ার ঘোষণা। শাহ ইসমাইল শহীদ রহ. ও শহীদ সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে জমায়েত হতে থাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাহাড়ের পাদদেশে এবং একদফা যুদ্ধ হয় ইংরেজদের সাথে। কিন্তু মীর জাফর, ঘষেটি বেগমের মতো বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতায় বালাকোট প্রান্তরে মুজাহিদরা পরাজয় বরণ করেন।

তাই বলে আন্দোলন থেমে থাকে নি। ১৮৫৭ সালে আবার ঘটে সিপাহী বিপ্লব। এ বিপ্লবে প্রাথমিকভাবে সফলতা আসলেও শেষ পর্যন্ত মুজাহিদরা পরাজয় বরণ করে। হাফেয যামেন রহ. সহ অনেকেই শহীদ হন। অনেক নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন। এরপর শুরু হয় আলেম সমাজের উপর লোমহর্ষক নির্যাতন। লক্ষ লক্ষ আলেমকে জবাই করে শহীদ করা হয়। স্বাধীনতাকামীদের মনোবল ভেঙে ফেলার জন্য শহীদানের লাশ দিনের পর পর দিন গাছে লটকিয়ে রাখা হয়। শেরশাহ গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের কোনো একটি বৃক্ষ ছিল না, যাতে শহীদানের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয় নি। আলেম কাউকে পেলেই নির্বিচারে হত্যা করা হত। পূর্বে যেখানের অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো মুসলিম ঘর আলেম ছাড়া ছিল না, সেখানে মাইলকে মাইল খুঁজেও জানাযা পড়ানোর জন্য একজন আলেমও পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরো নানা রকম ষড়যন্ত্রের শিকার হতে থাকে এ উপমহাদেশের জনগণ। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল মুসলমানদের অস্তিত্ব বুঝি আর টিকিয়ে রাখা যাবে না।

এদিকে স্বাধীন থানাভবনের সরকারের পতনের পর আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. কোনোক্রমে আত্মগোপন করে মক্কা শরীফে হিজরত করে যেতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি তার অনুসারীদের পুনরায় সংগঠিত করেন। কিছুদিন পর সাধারণ ক্ষমার সুবাদে কাসিম নানুতবী রহ. ও রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. এরও মুক্তভাবে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসার সুযোগ হয়। আবার নতুনভাবে পরামর্শ চলতে থাকে। কোন পথে আনবে জাতীয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত থাকার ফলে দীর্ঘদিন শিক্ষার প্রতি ফিরে তাকানোর সুযোগ হয় নি মুসলমানদের। তদুপরি ইংরেজদের কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। তদস্থলে চাপিয়ে দেওয়া বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত হতে থাকে মুসলিম যুবসমাজ। ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বিভ্রান্ত হয়ে হারাতে পারে হিদায়েতের পথ এবং বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি দখল করে নিতে পারে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান। তা হলে যে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ হয়ে পড়বে আরো সঙ্গীন। অপরদিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন যারা, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী চেতনা বিলাতেন যে আলেমসমাজ, ইংরেজদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে তাদের অনেকেই শাহাদাতবরণ করেছন।

ফলে নেতৃত্বের জন্য আত্মসচেতন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভূত হয় তীব্রভাবে। এমতাবস্থায় দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের পর আপাততঃ সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা স্থগিত রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত ও দ্বীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহসালার তৈরির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে দীনী ইলম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের সুমহান অভীষ্ট নিয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরী মক্কী রহ.-এর ইঙ্গিতে কাসিম নানুতবী রহ.-এর নেতৃত্বে এবং আযাদী আন্দোলনের অগ্রসেনানী যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গানেদ্বীনের হাতে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মে মোতাবেক ১৫ মুহাররম ১২৮৩ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক বস্তিতে ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদের প্রাঙ্গনে ছোট একটি ডালিম গাছের নিচে একান্ত ইলহামীভাবে বর্তমান পৃথিবীর ইসলামী প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত ঐতিহাসিক দারুল উলূমের গোড়াপত্তন করা হয়। বিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার পিছনে মূলত ছিল ছয়জন মহামনীষী, যাদেরকে আকাবিরে সিত্তা বা ছয় মনীষী বলা হয়। তারা হলেন–

নাম	ইন্তিকাল
(১) মাওলানা জুলফিকার আলী রহ.–	১৯০৪ ইং/১৩২২ হি.
(২) মাওলানা ফজলুর রহমান রহ.–	১৯০৭ ইং/১৩২৫ হি.
(৩) মাওলানা কাসিম নানুতবী রহ.–	১৮৮০ ইং/১২৯৭ হি.
(৪) মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ.–	১৮৮৪ ইং/১৩০২ হি.
(৫) হাজী আবেদ হুসাইন রহ.–	১৯১২ ইং/১৩২৮ হি.
(৬) মাওলানা রফীউদ্দিন রহ.–	১৮৯০ ইং/১৩০৬ হি.

প্রশ্ন : ৪৫ : দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রসনের মাধমে একটি দেশের ভূমি দখল করা যায়; কিন্তু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি জাতির আদর্শিক চিন্তা-চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়। তাই সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের তুলনায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি জাতির জন্য বেশি ক্ষতিকর। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত ভারতবর্ষের উলামায়ে কিরাম ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করায় ব্যস্ত ছিলেন। সিপাহী বিপ্লবের পরে ইংরেজদের সাথে সম্মুখ সমরে বিজয় লাভ করা সম্ভব নয় ভেবে তারা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিহার করে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলূম দেওবন্দ। নিচে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোপাত করা হল।

(১) শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা সৃষ্টি এবং একটি ব্যাপকতার শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন করে তোলা। শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দীনের খেদমত করা।

(২) আমল ও আখলাকের প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটানো।

(৩) ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে সমাজের চাহিদার নিরিখে যুগসম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন এবং 'খাইরুল কুরূন' (সাহাবায়ে কিরামের যুগ)-এর মতো আমলী ও আখলাকী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।

(৪) সবকারী প্রভাবমুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা-দিক্ষা ও চিন্তা-চেতনায় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা।

(৫) দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে দারুল উলূমের সাথে সংশ্লিষ্ট করা। দারুল উলূম দেওবন্দের দীর্ঘকালীন মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাইয়িব সাহেব রহ.-এর দৃষ্টিতে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

(১) মাযহাবিয়্যাত অর্থাৎ মাযহাব ও আদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা।

(২) দায়েম আযাদী বা সামগ্রিক ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা অর্জন।

(৩) পরিশ্রমী ও সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

(৪) সচ্চরিত্র ও নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন। মহান কর্মকীর্তি স্থাপন।

(৫) শিক্ষা-দীক্ষায় মনোযোগ সৃষ্টি।)

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি

কারী তাইয়িব রহ. দারুল উলূমের প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'তারীখে দারুল উলূম' গ্রন্থের শুরুতে তাঁর লিখিত দীর্ঘ ভূমিকায় দুটি মৌলিক শিরোনামের অধীনে আলোচনা করেছেন। যথা,

(এক) মারকাযিয়্যাত : সামজিকতা ও সার্বজনীনতা সৃষ্টি এবং এক কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস।

এ উদ্দেশ্যে দারুল উলূমের পাঠ্যসূচিতে প্রচলিত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংযোগ ঘটানো হয়েছে এবং সেগুলোকে যথাযথ মর্যাদায় মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(দুই) মাসলাকে ই'তিদাল : নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক ইসলামী মতাদশের প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠানে সকল হকপন্থী মাসলাকের আকীদা-বিশ্বাসের সমন্বয় সাধন ও সকল হকপন্থী মাযহাবের স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। চিশতিয়া, কাদারিয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া –এ চার তরীকার সংমিশ্রণে একটি পুর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে। কারী তৈয়ব রহ. রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ "উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনী রুখ আওর মাসলাকি মেযায"-এর মধ্যে নিম্নোক্ত সাতটি শিরোনামে দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এ সাতটি বিষয়কে سبع سنابل নামে অভিহিত করেছেন।

(১) ইলমে অহী তথা কুরআন, হাদীস, ইজমাহ ও কিয়াস থেকে আহরিত জ্ঞান অর্জন, যা নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কিরামের পাঠদান ও আধ্যাত্মিক মুরুব্বীদের সাহচর্যে অর্জন করা হয়।

(২) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর দুটি ধারা তথা মাতুরিদী ও আশআরীগণ কর্তৃক নির্ধারিত বিশুদ্ধ আকীদার অনুসরণ।

(৩) ফিকহের ক্ষেত্রে চার মাযহাবের যে কোনো একটির সুনির্দিষ্ট অনুসরণ।

(৪) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে হকপন্থী সূফীগণের অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়মের অধীনে থেকে আত্মশুদ্ধি অর্জন।

(৫) বাতিল ফিরকাগুলো সৃষ্ট ফেতনার মোকাবেলা করা এবং সমাজ থেকে সুসংস্কার ও বিদ'আত উচ্ছেদ করে সে স্থানে সুন্নতের উপর আমল এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বিশ্বাসের প্রয়াস চালানো।

৬। ইসলামের ব্যাপকতা, সার্বজনীনতা ও সামগ্রিকতার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো

৭। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পরিপালন।

উপসংহার

হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা করা এবং খাঁটি ইসলামী শিক্ষা অর্জন ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি সার্বজনীন ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে উঠেছিল দারুল উলূম দেওবন্দ।

প্রশ্ন : ৪৬ : নেজামে তা'লীম ও নেসাবে তা'লীমের ইতিহাস সম্পর্কে লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : 'নেজামে তা'লীম' অর্থ শিক্ষাব্যবস্থা আর 'নেসাবে তা'লীম' অর্থ পাঠ্যসূচি। দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি চলে আসা নেজামে তা'লীম ও নেসাবে তা'লীমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উপর নিম্নে আলোকপাত করা হল ।

সাহাবা কিরামের যুগ

পাঠ্যসূচি

(১) কুরআনে কারীম হিফয, (২) কুরআনে কারীমের তাফসীর, (৩) হাদীসে নববী, (৪) কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে আহরিত ফিকহ। (৫) ইলমুল ফারাইজ ।৬. আরবী সাহিত্য।

দ্বীনী শিক্ষার এ বুনিয়াদী বিষয়গুলো অদ্যাবধি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যসূচির মৌলিক স্থান দখল করে রয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

সাহাবায়ে কিরামের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল।

(ক) মসজিদভিত্তিক। (খ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

(ক) মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মসজিদে নবীব কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ইলমের হালকা। আহলে সুফ্ফাসহ অন্যান্য সাহাবা কিরাম ইলমে দ্বীন হাসিল করার লক্ষ্যে তাতে শরীক হতেন। পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রের ছোট-বড় সকল শহরে গড়ে উঠা জামে সমজিদই হয়ে উঠেছিল এক একটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র।

(খ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম যে কোনো সমস্যায় পড়লে তার সমাধানের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে রেসালাতে হাজির। তা ছাড়া নবীজী নিজেও কতক সাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। নবীজীর সা. ইন্তেকালের পর ফকীহ সাহাবায়ে কিরাম যেখানেই অবস্থান করেছেন, তাকে কেন্দ্র করে সেখানেই গড়ে উঠেছে দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র। খলীফাগণও নিজেরা বিভিন্ন স্থানে মু'আল্লিম প্রেরণ করতেন।

উমাইয়া খেলাফত যুগ

নেসাবে তা'লীম

দ্বীনী ইলমের হেফাজত এবং সময়ের দাবি পূরণে বিগত যুগের নেসাব তা'লীমের সাথে উমাইয়া খেলাফতকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নেসাবের আওতাভুক্ত করা হয়।

(১) আকায়িদ শাস্ত্র। (২) কিরাত শাস্ত্র। (৩) আসমাউর রিজাল। (৪) উলূমুল হাদীস। (৫) উসূলে ফিকহ। (৬) আরবি ব্যাকরণ।

নেজামে তা'লীম

প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী (৪১-১৩০হি.) উমাইয়া শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় বহু অনারব ভূখণ্ড ইসলমী খেলাফতের আওতাভুক্ত হয়। ফলে অনারবদের জন্য দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ যুগে সাহাবায়ে কিরামের যুগে প্রচালিত শিক্ষাব্যবস্থা তথা মসজিদ ভিত্তক ও ব্যক্তিকেন্দ্রীক উভয় ধারাই বহাল ছিল।

আব্বাসীয় যুগ

নেসাবে তা'লীম

আব্বাসীর শাসনামলে যুগ-চাহিদার কারণে পূর্বোল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংযোজন করা হয়।

(১) ইতিহাস। (২) বালাগাত শাস্ত্র। (৩) ফালসাফা (দশর্ন শাস্ত্র)। (৪) অভিধান শাস্ত্র। (৫) কাব্য শাস্ত্র। (৬) ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি। (৭) সৌরবিজ্ঞান, রসায়ন ও বস্তুবিদ্যা। (৮) চিকিৎসা বিজ্ঞান।

নেযামে তা'লীম

আব্বাসী শাসনামলে প্রথমার্ধ তথা চারশ হিজরী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাচীন দুটি ধারাই অব্যাহত ছিল। হিজরী পঞ্চম শতাব্দিতে মিশরের শাসনকর্তা হাকেম বিন আবদুল্লাহ সর্বপ্রথম বাগদাদে মাদরাসা রহীমিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে দীনী শিক্ষাব্যবস্থা মূলত মাদরাসাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তবে ব্যক্তিকেন্দ্রীক শিক্ষার ধারাটিও সল্পবিস্তর চালু ছিল।

মোঘল শাসন-পূর্ব ভারত উপমহাদেশের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা

পাঠ্যসূচি

ভারত উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় সপ্তম হিজরী থেকে নবম হিজরীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পাঠ্যসূচির তালিকায় যে-সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা নিম্নরূপ

তাফসীর : মাদারিক, বায়যাভী, কাশ্শাফ।

হাদীসশস্ত্র : মাশারিকুল আনওয়ার, মিসবাহুল সুন্নাহ।

আকায়িদ শাস্ত্র : শরহুস শামসিয়্যাহ, শরহুল আকায়িদ।

ফিক্হ : হিদায়া, শরহুল বিকায়াহ।

উসূলুল ফিকহ্ : আওয়ারিফ, লুম'আত।

আরবী সাহিত্য : আল-মাকামাতুল হারীরিয়্যাহ।

বালাগাত : মুতাউওয়াল, আল মুখতাসারুল মা'আনী।

নেযামে তা'লীম

মোঘল শাসন-পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশে উলামায়ে কিরাম মসজিদভিত্তিক শিক্ষা দান করতেন। সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবেকের শাসনামলে মুলতানের শাসক নাসিরুদ্দীন একটি মাদারাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম হিজরীর দিকে ভারতবর্ষে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করে।

মোঘল শাসনামলে পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর সাথে মা'কুলাত শাস্ত্র সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া এসময়ে সিহাহ সিত্তার পাঠদানও শুরু হয়। মহান সংস্কারক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. হজ্জের সফর থেকে ফিরে এসে উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দর্শনের প্রভাব দূর করে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে আরো বেগাবান করতে সিহাহ সিত্তাকে পাঠ্যভুক্ত করেন। অপর দিকে মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহনভী রহ. একটি সংস্কারমূলক নতুন পাঠ্যসূচি তৈরি করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

মোঘল শাসনামলে দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা মূলত মাদরাসা কেন্দ্রিক হয়ে পড়লেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ধারার কিছু নমুনা তখনও অবশিষ্ট ছিল। এ আমলে ব্যাপকহারে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র বাংলাদেশেই তখন আশি হাজার মাদরাসা ছিল। সরকার সে সকল মাদাসার ব্যয়ভার বহন করত। তবে অর্থবান ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মুসলিম জনতার স্বতঃস্ফূর্ত গণ চাঁদাও ছিল মাদরাসাগুলোর অন্যতম আয়ের উৎস।

দারুল দেওবন্দের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ

দারুল উলূম দেওবন্দ শিক্ষা ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা ও সার্বজনীনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর সাথে সাথে ভারসাম্য ও নিরপেক্ষ ইসলামী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করে। ফলে পাঠসূচির অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় ও শাস্ত্রের সংযোজনসহ প্রত্যেকটি বিষয়কে যথাযোগ্য মর্যাদায় মূল্যয়ন ও গ্রহণ যোগ্য করত একটি যুগোপযোগী, সামগ্রিক ও সার্বজনীন শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে।

উপসংহার : হযরত সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচিতে যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে মৌলিক বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিমার্জন ও সংস্কার হয়ে আসছে। ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচিতে এসে তা পূর্ণতা অর্জন করে। বর্তমানে ভারত উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : ৪৭ : দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ইংরেজরা মুসলমানদেরকে তাদের প্রধান শত্রু মনে করত। তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রবোধের পূর্ণ বিনাশের লক্ষ্যে ইংরেজরা মুসলমানদের

দ্বীনী ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ফলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন শিক্ষাধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ। এ মহান উদ্দেশ্যে দারুল উলূমের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল একটি সর্বজনীন ব্যাপক ও সুপরিমার্জিত পাঠসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা। নিচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল।

পাঠ্যসূচি

দারুল উলূমের পাঠ্যসূচিকে সামগ্রিক ও সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়, তাকে মোট চারটি শিরোনামে ভাগ করা যায়।

(১) পাঠ্যসূচিতে ব্যাপকতা সাধন

কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ফিকহে ইসলামীকে প্রাধান্য দিয়ে একটি সামগ্রিক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়। একটি সার্বজনীন শিক্ষাধারা তৈরির লক্ষ্যে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষাকেও দারুল উলূমের পাঠ্যসূচিতে সংযোজন করা হয়। ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রেরিত গোয়েন্দা জন পামর নিজ রিপোর্টে দাবি করেন যে, যদি কোনো অমুসলিমও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে, সেও যথার্থভাবে উপকৃত হবে।

(২) দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি

দারুল উলূমের পাঠ্যসূচিকে ছয়ভাগে বিন্যাস করা হয়।

(১) মক্তব ও নাজেরা বিভাগ।

(২) হিফজ বিভাগ।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা।

মাতৃভাষা, ফার্সি ভাষা, প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক ভূগোল, প্রাথমিক সমাজ বিজ্ঞান, আকাইদ, প্রয়োজনীয় মাসায়েল, হায়াতে সাহাবা ইত্যাদি।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা

আরবি ব্যাকরণ তথা নাহু, সরফ, বালাগাত, আরবি সাহিত্য, ফিক্‌হ, উসূল ফিক্‌হ, মানতিক, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি।

(৫) উচ্চতর শিক্ষা

আকাইদ, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উলূমুল হাদীস ইত্যাদি।

(৬) উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষা

১২৮৯ হিজরীতে তাখাসসুস ফিল হাদীস, তাখাসসূস ফিল ফিক্‌হ ও তাখাসুস ফিল আদাব নামে উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষা চালু করা হয়।

(৩) হকপন্থী মতাদর্শগুলোর সমন্বয়সাধন ও স্বীকৃতিদান

দারুল উলূম দেওবন্দ তার পাঠ্যসূচিতে সকল হকপন্থী মাযাহাবের স্বীকৃতিদান করত হানাফী মাযহাবকে প্রধান্য দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া চালু করার ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই সল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটি বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে।

পাঠ্যসূচির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রায় অর্ধশতাব্দিকালের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব সাহেব রহ. প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচির লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দারুল উলূমের নেসাবটি প্রণয়ন করা হয় নি বরং যেন সকল বিষয়ের জ্ঞান আহরণের যোগ্যতা প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে তৈরি হয়, এ উদ্দেশ্যে এ নেসাবটি প্রণীত হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রাচীন নেজামে তা'লীমের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধান করে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী নেজামে তা'লীমের প্রবর্তন করে। নিচে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হল।

(১) স্বতঃস্ফূর্ত গণচাঁদার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণভাবে সরকারী প্রভাবমুক্ত থেকে একটি স্বাধীন ও খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন।

(২) সকল শ্রেণী, সকল মত ও সব বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গঠন।

(৩) শ্রেণীভিত্তিক পাঠদানের পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক অধ্যয়নের নিমিত্তে পরীক্ষা গ্রহণের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ছাড়া এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যোগ্য আলেম নির্বাচনে সক্ষম হয়। শিক্ষার আলো ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের যাবতীয় খরচ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহনের উদ্যোগ।

(৬) পাঠ্যসূচিতে দ্বীনী বিষয়ে আত্যধিক গুরুত্ব প্রদান এবং ইলম অর্জনের সাথে সাথে আমলী মশ্‌কের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। যেন তা'লীমের

সাথে তরবিয়তের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে আদর্শবান খাঁটি দ্বীনদার রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

(৭) শিক্ষালাভের পর জীবিকার তাগিদে যেন আদর্শ বিকিয়ে দিতে না হয়, এ উদ্দেশ্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৮) বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে দারুল উলূমের শিক্ষার্থীদের মাঝে এ চেতনাকে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল, সঠিক জ্ঞান আহরণ করত সে নিরিখে নিজ জীবন গঠন করা এবং প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচলিত করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা।

(৯) লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃতিছাত্রকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা।

(১০) সামর্থ্যবানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষার সুব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার : দারুল উলূম দেওবন্দ নিজ পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী করে তোলায় অতি সল্প সময়ে তা সর্বমহলে সমাদৃত হয়ে উঠে। ফলে গোটা ভাতরবর্ষ এবং বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশসহ ইউরোপ-আমেরিকাতেও এ শিক্ষা কার্যক্রমের অনুকরণে হাজার হাজার ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

প্রশ্ন : ৪৮ : উসূলে হাশতেগানা বলতে কি বুঝ? এর রচরিতা কে? দারুল উলূম দেওবন্দ পরিচালনার মূলনীতিগুলো কি কি বর্ণনা কর।

উত্তর :

উসূলে হাশতেগানাহ বা আটটি মূলনীতি

পরাধীন ভারতে ধসেপড়া ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণচাঁদার ভিত্তিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করা হয়েছিল। সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে ধারাকে সুশৃঙ্খলভাবে টিকিয়ে রাখা এবং তার অগ্রগতিকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে এসকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য বিদগ্ধ আলেমগণের চিন্তার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছিল একটি নীতিমালা। ইতিহাসে ওই নীতিমালাটিই উসূলে হাশতেগানাহ বা মূলনীতি অষ্টক নামে পরিচিত।

উসূলে হাশতেগানাহ-র রচয়িতা

মহান শিক্ষা-সাধক ও সংস্কারক কাসেমুল উলূম ওয়াল খায়রাত হযরত কাসেম নানুতবী রহ. উক্ত উসূলে হাশতেগানাহ বা মূলনীতি অষ্টক রচনা করেন।

উসূলে হাশতেগানাহ বা মূলনীতি অষ্টক

(১) যথাসম্ভব মাদরাসার কর্মচারী ও কর্মকার্তাদেরকে অধিকহারে চাঁদা আদায়ের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজেও এর জন্য চেষ্টা করতে হবে, অন্যের মাধ্যমেও চেষ্টা করতে হবে।

(২) যেভাবেই হোক মাদরাসার ছাত্রদের খানা চালু রাখতে হবে বরং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মাদরাসার হিতকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামীদের সর্বদা সচেষ্টা থাকতে হবে।

(৩) মাদরাসার উপদেষ্টাগণকে মাদরাসার উন্নতি, অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠায় একগুয়েমী যেন কারো মাঝে সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথাসম্ভব মুক্তমনে পরামর্শ দিতে হবে এবং অগ্র-পশ্চাতে মাদরাসার শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি না থাকতে হবে।

এজন্য পরামর্শ দাতাকে মতামত প্রকশের ক্ষেত্রে তার মতামত গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই আশাবদী না হতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রোতাদেরকে মুক্তমনে ও সৎউদ্দেশ্য নিয়ে তা শ্রবণ করতে হবে। অন্যের মত যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য হলে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা গ্রহণ করার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। আর মুহতামিম বা পরিচালকের জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সম্পাদনীয় বিষয়ে উপদেষ্টাগণের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া অবশ্যই জরুরি থাকবে।

তবে মুহাতামিম সাহেব নিয়মিত উপদেষ্টাদের থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সকলের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না হওয়ার কারণে প্রয়োজন মাফিক উপদেষ্টা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করে ফেললে অন্যদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে না। তবে যদি মুহতামিম সাহেব কারো সাথেই পরামর্শ না করেন, তা হলে অবশ্যই উপদেষ্টা পরিষদ আপত্তি করতে পারবেন।

(৪) মাদরাসার সকল মুদাররিসকে অবশ্যই সমমনা ও একই চিন্তা-চেতনার অনুসারী হতে হবে। সমকালীন (দুনিয়াদার) আলেমদের মতো নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত না হতে হবে।

(৫) পূর্ব থেকে যে পাঠ্যসূচি নির্ধারিত রয়েছে কিংবা পরবর্তী সময়ে পরামর্শক্রমে যে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হবে, তা যেন সমাপ্ত হয়, সে হিসেব মতে পাঠদান করতে হবে।

(৬) এ প্রতিষ্ঠানের জন্য যতদিন কোনো স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নির্ভরতার বরকতে কদুরতীভাবে চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি কোনো স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে আল্লাহমুখী হওয়ার মূল পুঁজি হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং গায়েবী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। মাদরাসার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাঝে পরস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ দেখা দিবে। মোটকথা আমদানী ও ভবন নির্মাণের বিষয়ে অনেকটাই অনাড়ম্বরতা ও উপায়, উপকরণহীন অবস্থা বহাল রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৭) সরকার ও আমীর-উমারাদের সংশ্লিষ্টতাও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে।

(৮) যথাসম্ভব এমন ব্যক্তিদের চাঁদা প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক বরকতময় হবে বলে মনে হচ্ছে, যাদের চাঁদা দানের মাধ্যমে সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকবে না। বস্তুত চাঁদাদাতাগণের নিয়ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক স্থায়িত্বের কারণ হবে বলে মনে হয়।

উপসংহার : খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতা চলাকালে মওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার রহ. মুলনীতি অষ্টক দেখে বলেছিলেন, "এগুলো নিরেট ইলহাম ও মা'রিফাতের প্রস্রবন থেকে উৎসারিত চিন্তা"।

চতুর্থ অধ্যায়

উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

প্রশ্ন : ৪৯ : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান কি ছিল? বর্ণনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ইসলামী শিক্ষা-সাংস্কৃতি বিকাশে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অনেক। নিচে এসম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

অভিনব শিক্ষাধারা প্রবর্তন

প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষার অতি প্রাচীন ধারার সংস্কারপূর্বক তদস্থলে একটি আধুনিক, সার্বজনীন ও সংস্কারমূলক শিক্ষা ধারার প্রবর্তন করেছেন উলামায়ে দেওবন্দ। এ শিক্ষাধারার মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ।

২. আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথ ও মতাদর্শের পরিচয় লাভ।

৩. বাতিলের পার্থক্য নিরূপণ।

৪. অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে পরকালীন সফলতা অর্জন।

৫. এ শিক্ষাকে আয়-উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ না করা।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে এ শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মানোত্তীর্ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা সম্ভব হয়।

যুগসম্মত সিলেবাস প্রবর্তন

এ শিক্ষাধারার জন্য এমন একটি যুযোপযোগী ও সামগ্রিক সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে, যা অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থীর মেধা দারুণভাবে বিকশিত হয়, যে কোনো অজানা বিষয়ের জ্ঞান আহরণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া এ শিক্ষাধারার জন্য নির্বাচিত সিলেবাস এতটাই সার্বজনীন করে তৈরি করা হয়েছে, মুসলিম মিল্লাতের যে কোনো ধর্ম-মতবাদের লোকের জন্যই এ সিলেবাসের আওতায় অধ্যয়ন ও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব।

শিক্ষা সম্প্রসারণ

শিক্ষাধারার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ওলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা প্রশংসনীয়। মাত্র একশ বছরের স্বল্প সময়ে এ শিক্ষাধারা উপমাহাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি উপমাহাদেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা ও কোনোরূপ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এ ব্যাপক শিক্ষা মিশন এত দ্রুত এগিয়ে যাওয়া তাদের কর্মতৎপরতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। বর্তমানে বাংলাদেশে এধারার হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি মসজিদে গড়ে উঠা মকতবের সংখ্যা ৬০ হাজারেরও বেশি।

সংস্কৃতি বিকাশ এবং তার লালন

শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়েও তাঁদের অবদান অপরিসীম। বহু জাতি ও ধর্মের আবাসভূমি এ ভারতবর্ষ। বিভিন্ন সংস্কৃতিক ভাবধারায় গড়ে ইঠেছিল এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এ বহুবিধ সংস্কৃতির মাধ্যম ইসলামী সংস্কৃতি স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনেও উলামায়ে দেওবন্দের অবদানই সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা কারার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা যেমনি তুলে ধরেছেন, তেমনি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং দওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ-নসীহত, ইসলাহ ও ইরশাদ এবং তালিম তরবিয়তের মাধ্যমে সমাজের বহুসংখ্যক মানুষের জীবন ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়ে তাঁরা সমাজকে এ সংস্কৃতির প্রতি নীরব আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

উপসংহার : উপমাহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে জনজীবনে ইসলামী আদর্শ এবং সংস্কৃতি বাস্তবায়নে উলামায়ে দেওবান্দের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন : ৫০ : ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান কি?

উত্তর :

ভূমিকা : সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়াগোষ্ঠী ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভের পর উলামায়ে দেওবন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে উপমাহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক নবজাগরণ সূচিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষার অতিপ্রাচীন ধারাকে সংস্কার করে তদস্থলে একটি যুগোপযোগী, সার্বজনীন ও বিশুদ্ধ শিক্ষাধারা প্রণয়ন করেন। ফলে ভারত উপমাহাদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা ঘটে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানগুলো নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায়।

(ক) হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের অবদান। (খ) তাফসীর শাস্ত্রে তাঁদের অবদান। (গ) ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁদের অবদান। (ঘ) দর্শন ও তাসাউফ শাস্ত্রে তাঁদের অবদান। (ঙ) সীরাত ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁদের অবদান। (চ) আধ্যাত্মিক ও মনোস্তত্ত্বে তাঁদের অবদান। (ছ) ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের অবদান

ক. হাদীস শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

বাদশাহ আকবরের আমলে ইরানি আলেমাদের প্রভাবে এ দেশের শিক্ষাধারায় গ্রিক দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে ওই সব বিষয় তখন অধিক গুরুত্বের সাথে পড়ানো হত। এতে শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞান হতে অনেকাংশেই বঞ্চিত হত। দারুল উলূম দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম শিক্ষাধারায় কুরআন-হদীসের জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন বরং হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনকে যোগ্যতার মানদণ্ড এবং ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন। ফলে উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষাদান ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকরী অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ দেশীয় মুহাদ্দিসগণের গবেষণার ফলে হাদীস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উদঘাটিত হয়। বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিস তৈরি হন। উলামায়ে দেওবন্দ হদীস শাস্ত্রের বহু মৌলিক গ্রন্থ এবং টীকা ও তথ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁদের রচিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ

তরজমানুস সুন্নাহ, মা'আরেফুল হাদীস, যাদুত তালেবীন। এ ছাড়া আনেকেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে চল্লিশ হাদীসের সংকলন তৈরি করেছেন।

টীকা ও তথ্য গ্রন্থ : হযরত কাসেম নানুতবী রহ. কৃত বুখারী শরীফের টীকা, যা এখন পর্যন্ত বুখারী শরীফের সাথে মুদ্রিত হয়ে আসছে। হযরত মাওলানা সাম্বলী রহ.-এর আবু দাউদ শরীফের টীকা। ভাষ্য গ্রন্থের মাঝে লামিউদ্দারারী, আলকাউকাবুদ্দুররুরী, ফয়যুল বারী, বযলুল মাজহূদ, আনোয়ারুল বারী, ফতহুল মুলহিম, মা'আরিফুস সুনান, আওজাযুল মাসালিক, তা'লিকুস সবীহ, আমানিল আহবার, ই'লাউস সুনান, আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম, তাকরীরে তিরমীযী, তানযীমুল আশতাত, মা'আরিফে মাদানী, ইযাহুল বুখারী, আমানিল ইযাহ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ছোট-বড় আরো অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

খ. তাফসীর শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

আল কুরআনুল কারীম হল ইসলামের মূলমন্ত্র আর এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেই তাফসীর বলা হয়। হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও তাবেঈগণের যুগ থেকে কুরআনে কারীমের তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধারা অব্যহত থাকলেও ভারতবর্ষে এ ধারার সূচনা হয় অনেক পরে। বস্তুত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ফার্সি ভাষায় কুরআন কারীমের তরজমা করেন এবং তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল কাদের রহ. কুরআনে কারীমের ভাবানুবাদ করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশে তাফসীর বিষয়ক জ্ঞানচর্চার পথ সুগম হয়। উলামায়ে দেওবন্দ কুরআন মজীদের তাফসীর সংক্রান্ত যে-সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল :

১. তাফসীরে উসমানী– মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.।

২. বয়ানুল কুরআন– মাওলানা আশারাফ আলী থানবী রহ.।

৩. মা'আরিফুল কুরআন– মুফতী শফী রহ.।

৪. মা'আরিফুল কুরআন– মাওলানা ইদ্রিস কান্দলবী রহ.।

৫. তাফসীরে হক্কানী– মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.।

৬. তাফসীরে নুরুল কুরআন– মাওলানা আমিনুল ইসলাম রহ.।

গ. ফিক্হ শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরী'অতের দিক-নির্দেশনা ও বিবিধ বিধানসমূহের সুবিন্যস্ত বর্ণনা সম্বলিত শাস্ত্রের নাম ফিক্হ। উলামায়ে দেওবন্দ হাদীস শাস্ত্রের মতো ফিক্হ শাস্ত্রের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি ইমামগণের ফিক্হী ইখতলাফের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে বিভিন্ন মাজহাব অনুসারীদের মাঝে যে বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল, উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের উদারনীতি দ্বারা তা

নির্মূলের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি সমকালীন ও জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য তারা পৃথকভাবে "দারুল ইফতা" নামে একটি সতন্ত্র বিভাগ চালু করেন।

ফিকহ্ ও ফাতওয়া : উলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক ফিক্‌হ ও ফাতওয়া বিষয়ের বহু মৌলিক এবং টীকা ও ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মেধ্যে কয়েকটি হল :

(১) ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়াহ– মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.
(২) ইমদাদুল ফাতাওয়া– মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.
(৩) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াহ– মুফতী আবদুর রহীম রহ.
(৪) ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া– মুফতী মাহমূদুল হাসান গঙ্গুহী রহ.
(৫) আহসানুল ফাতওয়া– মুফতী রশীদ আহমদ রহ.
(৬) ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম– দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ
(৭) জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ– মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী
(৮) কিফায়াতুল মুফতী– মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ রহ.
(৯) কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ– মুফতী আমীমুল ইহসান রহ.
(১০) তা'লীমুল ইসলাম– মুফতী মুহাম্মদ কেয়াতুল্লাহ রহ.

ঘ. দর্শন ও আকাইদ শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রিক দার্শনিকদের যুক্তির ধাঁধাঁয় পড়ে সাধারণ মুসলমান তো বটেই অনেক মুসলিম চিন্তাবিদও বিভ্রান্ত হন। প্রতি যুগেই হক্কানী উলামায়ে কিরাম দার্শনিকদের ভ্রান্ত যুক্তিগুলোর সমুচিত জবাব দেন। উলামায়ে দেওবন্দ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে যুক্তি-পূজারীদের উত্থাপিত বিভ্রান্তির যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ জবাব দেন। ইলমে কালামের যে-সব বিষয় প্রাচীন দর্শন ও যুক্তির উপর ভিত্তিশীল ছিল, সেগুলোকে উলামায়ে দেওবন্দ আধুনিক যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করেছেন। তা ছাড়া যুগের পরিবর্তনের ফলে ইসলামী আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকার উদ্ভব হওয়ার কারণে তাদের যেসব বিভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোর যুগসম্মত জবাব ও ব্যাখ্যা দান করেছেন।

ঙ. সীরাত ও ইতিহাস শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

মূলত ইতিহাস হল অতীতে ফেলে আসা পৃথিবীর চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও মননশীলতার সঠিক চিত্ররূপ।

ইতিহাসের বিভ্রান্তি যেমনি ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্ম দেয়, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য ডেকে আনে অশুভ পরিণতি। এ কারণে ইতিহাসের নির্ভুল উপস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য। ওরিয়েন্টালিষ্ট ও ইউরোপীয় ইসলামবিদ্বেষী চক্র ইসলামের ইতিহাস রচনায় বহু বিভ্রান্তিকর তথ্যের অবতারণা করেছে। উলামায়ে দেওবন্দ বিভ্রান্তিগুলোর অপনোদন করেন এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেন।

তাদের লেখা ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। তন্মোধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ–

১. সীরাতুন্নবী– মাওলানা সুলায়মান নদবী রহ.

২. সীরাতে মুস্তফা– মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবী রহ.

৩. হায়াতুস সাহাবা– মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী রহ. .

৪. তারীখে দাওয়াত ও আযীমত– মাওঃ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

৫. তারীখে ইসলাম– মাওলানা আকবর শাহ নজীবাবাদী রহ.

৬. নবীয়ে রহমত– মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

চ. তাসাউফ ও মনোস্তত্ত্বে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

তাসাউফ হল, মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত ও নির্মল করার একটি প্রক্রিয়া। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে খোদামুখী করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খানকাহ তৈরি, ওয়াজ-নসীহত, পুস্তকাদি রচনা ও এ দাওয়াত নিয়ে দেশ-বিদেশে সফর ইত্যাদির পাশাপাশি উপমহাদেশে প্রচলিত আধ্যাত্ম ধারাসমূহের মাঝে যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল, উলামায়ে দেওবন্দের প্রচেষ্টায় তা নিরসন হয়ে একটি সুস্থ ও সমন্বিত আধ্যাত্ম ধারার বিকাশ ঘটে। বর্তমানে তাসাউফের যে-সকল বিশুদ্ধ সিলসিলা উপমহাদেশসহ আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো উলামায়ে দেওবন্দেরই অবদান।

ছ. ভাষা ও সাহিত্যে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

আরবী ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের ভাষা হল আরবি। এগুলোর গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাণ্ডিত্য অর্জন আবশ্যক। তাই উলামায়ে দেওবন্দ আরবি ভাষা আয়ত্ত করার লক্ষ্যে আরবি ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফ, বালাগাত, সাহিত্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করে তা সহজবোদ্ধ করার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ফার্সি ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

একসময় ফার্সি ভাষায় ইসলামের ব্যাপক চর্চা হয়েছিল। ফলে সেই ভাষায় ইসলামের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার তৈরি হয়েছিল। সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরোণের জন্য দেওবন্দী শিক্ষাধারায় ফার্সি ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এজন্য উলামায়ে দেওবন্দ ফার্সি ভাষায় বহু বই-পুস্তক রচনা করেন।

উর্দূ ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

উর্দূ ভাষা উলামায়ে কিরামের হাতেই সমৃদ্ধি লাভ করে ও মার্জিত হয়। এ ভাষাকে হিন্দুয়ানী প্রভাবমুক্ত করে ইসলামী ভাবধারায় প্রবাহিত করার পিছনে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম।

বাংলা ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষী উলামায়ে কিরামও মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছেন। এ ভাষায়ও বিশাল ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও উলামায়ে দেওবন্দ পিছিয়ে নেই বলা চলে।

উপসংহার : বহু সমস্যার কারণে স্থবির হয়ে পড়া ইসলামী জ্ঞানচর্চাকে উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। নানামুখী সংস্কার ও শুদ্ধি-অভিযানের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন।

প্রশ্ন : ৫১ : উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে লিখ।

উত্তর :

ভূমিকা : সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বেনিয়াদের কবল থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলে উলামায়ে কিরাম সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিহার করে প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম। নিম্নে তাদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক অবদান

উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক অবদানকে মোটামোটি চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।

২. দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত।

৩. ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত।

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকাল।

উলামায়ে দেওবন্দের হাতে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল :

১. জমিয়তুল আনসার	: ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ
২. আযাদ হিন্দ	: ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ
৩. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ	: ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম	: ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ
৫. নেযামে ইসলাম পার্টি	: ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ

উলামায়ে দেওবন্দের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অর্জন :

১. ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

২. ইসলামী শিক্ষা ও মুসলিম জাতিসত্তা ইংরেজদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়।

৩. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

৪. পকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

৫. লাহোর প্রস্তাবের আলোকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত রচিত হয়।

উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন রাজনীতিবিদ আলেমের রাজনৈতিক অবদান

হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. -এর রাজনৈতিক অবদান

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলমানদের উপর ইংরেজদের চালিত দমননীতির ফলে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বায়ান্ন বৎসর ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিস্তব্ধতার পর আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে বসেন হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নিরলস কর্মতৎপরতার ফলে উলামায়ে হকের মৃতপ্রায় রাজনৈতিক অঙ্গন পুনরায় সরব হয়ে উঠে। নিম্নে তার রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

(১) সাংগঠনিক তৎপরতা

শাইখুল হিন্দ রহ. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্র ও আমজনতার সমন্বয়ে ১৮৭৮ সালে "সামারাতুত তারবিয়্যাহ", ১৯০৯ সালে "জমিয়তুল আনসার" ১৯১৩ সালে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজকে কুরআন শিক্ষাদান ও তাদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগীশক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে "নাজ্জারাতুল মা'আরিফ" নামে তিনটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

(২) আন্দোলনের কেন্দ্র নির্ধারণ

সেকালে সীমান্ত অঞ্চল ও আফগানিস্তান যেহেতু সামরিক তৎপরতার জন্য উপযুক্ত ছিল, তাই তিনি সেটিকে বিপ্লবী বাহিনীর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন।

(৩) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও আযাদ হিন্দ মিশন গঠন

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম সংগঠন "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ" গঠন করেন। তিনি মূলত কংগ্রেস রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া ভারত উপমহাদেশকে ইংরেজ আগ্রাসন মুক্ত করার মানসে দলমত নির্বিশেষে "আযাদ হিন্দ মিশন" নামে একটি বিপ্লবী পরিষদ গড়ে তোলেন।

(৪) রেশমী রুমাল আন্দোলন

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন উৎখাত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা কামনা করে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তুর্কি ও আফগান সরকারের সাথে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তুর্কি বাহিনী ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে আফগান সীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। একই সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। এভাবে ইংরেজদের উৎখাত করে তুর্কি বাহিনী বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে।

ভারত আক্রমণের চুক্তিনামার বিষয়টি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. গোপনীতার সাথে একটি রেশমী রুমালে আরবিতে রূপান্তরিত করে শাইখুল হিন্দের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আফগান শাসক হাবীবুল্লাহর গাদ্দারীর ফলে ৯ জুলাই ১৯১৬ সালে গোয়েন্দা পুলিশ পত্রবাহক শায়খ আবদুর রহীমের বাড়ি থেকে রেশমী রুমালরূপী পত্রটি উদ্ধার করে। ফলে গোপন তৎপরতার খবর ইংরেজ সরকারের নিকট ফাঁস হয়ে যায়।

হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক অবদান

মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার পরিসর সুবিশাল। সংক্ষেপে তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার উপর আলোকপাত করা হল।

রাজনীতিতে হযরত মাদানী রহ.-এর পদার্পণ

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাঁর একান্ত ছাত্র হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-কে নিজ স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বাছাই করেন। মাল্টা জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ভারত পৌঁছে

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. হযরত মাদানী রহ.-কে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তা ছাড়া তাঁর নিজস্ব কর্মতৎপরতা ও দক্ষতার ফলে হযরত শাইখুল হিন্দের ইন্তেকালের পর অঘোষিতভাবেই তিনিই আযাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতায় পরিণত হন।

করাচীর খিলাফত কনফারেন্স ও কারাবন্দি হযরত মাদানী রহ.

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে করাচীর মুহাম্মদ আলী জওহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খিলাফত কনফারেন্সের সিদ্ধান্তবলী ঘোষণা করতে গিয়ে হযরত মাদানী রহ. বলেন, বৃটিশ সরকারের পুলিশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ ঘোষণার অপরাধে বৃটিশ সরকার তাকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে বৃটিশ সরকারের গড়িমসি দেখে কংগ্রেস ও হযরত মাদানী রহ.-এর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। ফলে রাজনৈতিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ ও কংগ্রেস এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়।

মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী ঐক্য

১৯৩৫ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্নার অবদানের প্রেক্ষিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও অন্যান্য দলের ঐক্যজোটের সাথে মুসলিমলীগে শরীক করা হয়। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর জিন্নাহ নির্বাচনী শর্তগুলো ভঙ্গ করেন।

দিল্লীতে হযরত মাদানী রহ.-এর বক্তৃতা ও বিভ্রান্তি

১৯৩৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একজন সভায় হযরত মাদানী রহ. বলেন, ইংরেজরা "হিন্দু-মুসলিম ভিন্ন জাতিসত্তা" এ শ্লোগানের মাধ্যমে এ দেশের হিন্দু মুসলিমের সৌহার্দ্যপূর্ণ ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়। তাই আসুন আমরা সকল ধর্মাবলম্বীরা 'ভারতবাসী' এ ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখি।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও পাকিস্তানের প্রস্তাব

ইংরেজদের "বিভেদ বাঁধাও শাসন কর" নীতির কারণে ১৯৪০ সালে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মার্চ মাসে

লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব করা হয়। হযরত মাদানী রহ. এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।

১৯৪০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামার সম্মেলনে তিনি বলেন, যদি পৃথক আবাসভূমি উদ্দেশ্য হয় নববী আদর্শের ইসলামী রাষ্ট্র পতিষ্ঠা করা, তা হলে এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই আর যদি তা হয়ে থাকে বৃটিশ বেনিয়াদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফল, তা হলে তা হবে তাদের নির্জলা প্রতারণা। তা ছাড়া মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির ফলে হিন্দুস্তানে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু মুসলমান এবং মসজিদ, মাদরাসা, খানকা ইত্যাদি সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

বৃটিশদের নমনীয়তা ও পাকিস্তানের ঘোষণা

মুসলমান ও ভারতবাসীর প্রবল আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার নমনীয়তা অবলম্বনে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতের বড় লাট "মাউন্ট ব্যাটেন" পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেন এবং ১৪ ও ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হযরত মাদানী রহ. এর কর্ম তৎপরতা

১৯৪৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নেতা মি. জিন্নাহ পাকিস্তান প্রশ্নে উলামায়ে কিরামকে আশ্বাস দেন যে, নির্বাচনে জয়ী হলে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব। ফলে উলামায়ে দেওবন্দের দুই দল; হযরত মাদানী রহ.-এর নেতৃত্বাধীন "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ" এবং শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর নেতৃত্বাধীন "জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম" মুসলিম লীগের ব্যানারে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে জিন্নাহ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে উলামায়ে দেওবন্দ একযোগে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং জমিয়ত নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেন। ফলে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়।

কাদীয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন

১৯৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জমিয়ত নেতৃবৃন্দ খতমে নবুয়ত আন্দোলনে শরীক হন এবং প্রায় দশ হাজার মুসলমানের তাজা রক্তের বিনিময়ে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়।

মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলন

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারী করলে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। এ সময় আইয়ূব খান কর্তৃক জারীকৃত "মুসলিম পারিবারিক আইন"-এর বিরুদ্ধে তারা গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

নেজামে ইসলাম পার্টির আত্মপ্রকাশ

১৯৬৭ সালে মারকাযে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেযামে ইসলাম পার্টি নামে দু'টি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে উলামায়ে দেওবন্দ রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যান।

উপসংহার : দেশ ও জাতির মুক্তি, সমৃদ্ধি ও মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম। পাশাপাশি ইসলামী আইন বাস্তবায়ন এবং খ্রিষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী, শী'আ ও মওদুদীসহ যাবতীয় ফেতনার প্রতিরোধে তারা আজ পর্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছেন।

প্রশ্ন : ৫২ : শাইখুল হিন্দ রহ.-এর পরিচয় কি? তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে তুমি যা জান লিখ।

উত্তর : শাইখুল হিন্দের পরিচয়

নাম মাহমূদ হাসান। উপাধি শাইখুল হিন্দ। পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী। তিনি ১৮৫১ সালে ভারতের বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

মিয়াজী মঙ্গোলরী ও মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র হিসেবে লেখাপড়া শুরু করেন। মাওলানা মাহমূদ হাসান তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম।

কর্মজীবন

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. ১৮৭১ সালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর দারুল উলূম দেওবন্দের সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৭৫ সালে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ সালে সদরুল মুদাররিসীন হয়ে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এ পদ অলঙ্কৃত করে রাখেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি উপমহাদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়াদের উৎখাত আন্দোলনে তিনি বিভিন্ন সময়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন।

ইন্তেকাল

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসেনানী এ মহামনীষী ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর রাজনৈতিক তৎপরতা

হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.-এর রাজনৈতিক তৎপরতাকে নিম্নোক্ত শিরোনামে সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করা যায়।

(ক) রাজনৈতিক ময়দানে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর আগমন।

(খ) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ও আমজনতাকে সংগঠিত করা।

(গ) সীমান্ত অঞ্চলে তার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা।

(ঘ) বিপ্লবী পরিষদ আযাদ হিন্দ গঠন।

(ঙ) রেশমী রুমাল আন্দোলন এবং তুর্কি ও আফগান সরকারের সাথে ঐকমত্য।

(চ) উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ।

(ছ) হিজাযের পথে শাইখুল হিন্দ রহ.।

(জ) রেশমী রুমাল আন্দোলনের ইতি।

(ঝ) হিজাযে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী।

(ঞ) খেলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা।

রাজনৈতিক ময়দানে শাইখুল হিন্দ রহ. এর আগমন

১৭৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ইংরেজদের দমননীতির ফলে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫২ বছর রাজনৈতিক অঙ্গনে উলামা কিরামের নিস্তব্ধতা ভেঙে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নিরলস কর্মতৎপরতার ফলে উলামায়ে হকের মৃতপ্রায় রাজনৈতিক অবস্থা আবার প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করে।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্র এবং আমজনতাকে সংগঠিত করা

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ১৮৭৮ সালে দারুল উলূমের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন "সামারাতুত তারবিয়্যাহ" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ সালে একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করার লক্ষ্যে উবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে দারুল উলূমের ফারেগ ছাত্রবৃন্দের সমন্বয়ে "জমিয়তুল আনসার" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর ১৯১৩ সালে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে কুরআন শিক্ষা প্রদান

এবং তার আদর্শের সাথে পরিচিত করে তোলা এবং তাদেরকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে শাইখুল হিন্দ রহ. উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে দিল্লীর ফাতেহপুরী মসজিদে "নাজ্জারাতুল মা'আরিফ" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ করেন।

সীমান্ত অঞ্চলে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা

তৎকালে আফগানিস্তান ও সীমান্ত অঞ্চল সামরিক তৎপরতার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল। এ কারণে তিনি উক্ত স্থানগুলোকে বিপ্লবী বাহিনীর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। তা ছাড়া সীমান্ত এলাকার জনপদের মধ্যে জিহাদী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি মাওলানা সাইফুর রহমান রহ., মাওলানা ফযলে রাব্বি রহ., মাওলানা ফযল মাহমূদ রহ., মাওলানা মুহাম্মদ আকবর রহ. প্রমুখ বাগ্মী ব্যক্তিবর্গদেরকে সে অঞ্চলে নিয়োজিত করেন।

বিপ্লবী পরিষদ "আযাদ হিন্দ" গঠন

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ভারতীয় মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে গড়ে তোলেন সর্বভারতীয় মুসলিম সংগঠন "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ"। তিনি মূলত কংগ্রেস রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়াদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে তিনি "আযাদ-এ-হিন্দ মিশন" নামে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান।

রেশমী রুমাল আন্দোলন, তুর্কি ও আফগান সরকারের ঐকমত্য

ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে গোপনে যোগাযোগ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি আফগান ও তুর্কি সরকারের সাথে এই ঐকমত্যে উপনীত হন যে, তুর্কি বাহিনী ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে আফগান সীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। এরই সাথে ভারতের ভিতর থেকে একযোগে বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া হবে। এভাবে ইংরেজদের উৎখাত করে তুর্কি বাহিনী বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ত্যাগ করবে।

উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইংরেজ সরকার গোপন সংগ্রামের কথা আঁচ করতে পেরে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। এ সময় বন্দি হওয়ার আশঙ্কায় শাইখুল হিন্দ উবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ করেন।

তাকে কাবুল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কাবুল সরকারকে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা এবং আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ছাত্র ও ভক্তদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা।

হিজাযের পথে শাইখুল হিন্দ রহ.

তুরস্ক কর্তৃক ভারত আক্রমণের বিষয়টি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-কে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তুরস্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন এবং মক্কা শরীফে হিজাজের গভর্নর "গালিব পাশা"র সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছ থেকে দুটি পত্র লিখিয়ে নেন। একটি গালিব পাশার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি বৃটিশবিরোধী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। অপরটি আফগান সরকারের উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আনোয়ার পাশা তাঁকে ইংরেজবিরোধী তৎপরতায় সার্বিক সহায়তা দানের আশ্বাস দেন। আনোয়ার পাশা থেকেও তিনি এ সম্পর্কে তিনটি চিঠি লেখিয়ে নেন। প্রথমটি বিপ্লবী সরকারের সাথে তুর্কি সরকারের চুক্তিপত্র, দ্বিতীয়টি মুসলিম বিশ্বের প্রতি বৃটিশবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান আর তৃতীয়টি আফগান সরকারের উদ্দেশ্যে।

রেশমী রুমাল আন্দোলনের ইতি

তুর্কি সরকার কর্তৃক ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে ভারত আক্রমণের চুক্তি নামার বিষয়টি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী গোপনীয়তার সাথে একটি রেশমী রুমালে আরবিতে রূপান্তরিত করে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আফগান শাসক হাবীবুল্লাহর গাদ্দারীর ফলে ৯ই জুলাই ১৯১৬ সালে গোয়েন্দা পুলিশ পত্রবাহক শায়খ আবদুর রহীমের বাড়ি থেকে রেশমী রুমালরূপী পত্রটি উদ্ধার করে। ফলে গোপন তৎপরতার খবর ইংরেজ সরকারের নিকট ফাঁস হয়ে যায়। সুতরাং ইংরেজ সরকার হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-কে গ্রেফতার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

হিজাযে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী ও কারামুক্তি

রেশমী রুমালের তথ্যের ভিত্তিতে হিজাযে কর্মরত ইংরেজ অফিসার কর্নেল ওয়েলসন শরীফের নিকট শাইখুল হিন্দ রহ.-কে গ্রেফতার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। মদীনা শরীফের পুলিশ শাইখুল হিন্দ রহ.-কে না পেয়ে তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্য ও আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা মাওলানা উযায়ের গুল ও মাওলানা ওয়াহিদ আহমদকে গ্রেফতার করে এ মর্মে ফরমান জারী করে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শাইখুল হিন্দ রহ. ধরা না দিলে তাঁর এ শিষ্যদ্বয়কে হত্যা করা হবে। এ ঘোষণা শুনে শাইখুল হিন্দ রহ. নিজেই পুলিশের হাতে ধরা দেন। গ্রেফতারের একমাস

পর ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে তাকে ভূ-মধ্য সাগরীয় দ্বীপ মাল্টায় নির্বাসন দেওয়া হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর চার মাস বন্দিজীবন কাটানোর পর ১৯২০ সালে ২০শে মার্চ মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই তিনি খেলাফত কনফারেন্সে যোগদান করেন। তখন তাকে শাইখুল হিন্দ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

খিলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহরের নেতৃত্বে "খেলাফত আন্দোলন" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের সকল আলেম কর্তৃক "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার : হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. ছিলেন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রাণপুরুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ অবদানের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : ৫৩ : শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর "রেশমী রুমাল আন্দোলন"-এর বর্ণনা দাও।

উত্তর : শায়খুল হিন্দের পরিচয়

নাম মাহমূদ হাসান। উপাধি শায়খুল হিন্দ। পিতা মাওলানা জুলফিকার আলী। তিনি ১৮৫১ সালে ভারতের বেরলীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা মিয়াজী মঙ্গোলরী ও মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট সমাপ্ত করেন। এরপর দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র হিসেবে লেখাপড়া শুরু করেন। উস্তাদগণের মধ্যে মাওলানা মাহমূদ হাসান অন্যতম।

কর্মজীবন

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর তিনি দারুল উলূমের সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সদরুল মুদাররেসীন পদে সমাসীন হয়ে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ পদ অলংকৃত করে রাখেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইংরেজ বিতাড়নে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন চালিয়ে যান এবং আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইন্তেকাল

চিরস্বাধীনতাকামী আপসহীন সংগ্রামী এ আধ্যত্ম সাধক স্বাধীনতার স্বপ্ন বক্ষে ধারণ করে অবশেষে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

রেশমী রুমাল আন্দোলন

তুরস্কের যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা রওযা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসলে শায়খুল হিন্দ আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাৎ করে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তাদানের আশ্বাস দেন। তাদের মাঝে এ মর্মে একটি চুক্তিও সাক্ষরিত হয়। সে সময় আনোয়ার পাশা থেকে তিনটি পত্র লিখিয়ে নেন। এর তৃতীয় পত্রটি আফগান সরকারের প্রতি, যার মর্ম ছিল "আফগান সরকারের সম্মতি থাকলে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তুর্কিবাহিনী আফগান সীমান্ত দিয়ে বৃটিশ-ভারতে আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে।"

কথা ছিল আফগান সরকার কর্তৃক এ চুক্তি অনুমোতদিত হলে অনুমোদন পত্রটি মদীনায় অবস্থানরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান রহ.-এর মাধ্যমে তুর্কি সরকারের হাতে পৌঁছানো হবে। অনুরূপভাবে তুর্কি সরকারের যুদ্ধের নির্দেশনামাটিও ১৯১৭ সালের ১লা জনুয়ারির মধ্যে কাবুলের সদর দফতরে পৌঁছানো হবে। এরপর কাবুলের সদর দফতর দিল্লীর সদর দফতরকে ১৯১৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এই সংবাদটি সরবরাহ করবে। এসব কিছু চূড়ান্ত হলে ৯ই ফেব্রুয়ারি ভারতে অভিযান শুরু করবে। মাওলানা মাহমূদুল হাসান রহ. এ সময় আফগানিস্তানে অবস্থান করবেন।

এ পত্রটি মাওলানা হাদী হাসান রহ. কর্তৃক উবায়দুল্লাহ সিন্ধির হাতে পৌঁছলে তার নেতৃত্বে এ চিঠি আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহর কাছে পৌঁছায় প্রথমে তিনি এ পত্রটির আবেদনপত্র গ্রহণ না করলেও অবশেষে বাধ্য হয়ে যুদ্ধের সম্মতি দেন। এরপর এ সম্মতির ভিত্তিতে মাওলানা সিন্ধি রহ. ও আমীর নসরুল্লাহ খান রহ. উক্ত চুক্তিনামার বিষয়বস্তু যুদ্ধের তারিখসহ আরবিতে রূপান্তর করেন। এরপর একজন দক্ষ কারিগর দ্বারা রেশমী রুমালে তা অঙ্কন করা হয়। একপর্যায়ে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথমে শায়খুল হিন্দ রহ.-এর একনিষ্ঠ উক্ত নওমুসলিম শায়খ আবদুল হক রহ.-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি লোক মারফত এ পত্রটি শায়খ আবদুর রহীম রহ.-এর নিকট পৌঁছে দেন। এদিকে শাসক হাবীবুল্লাহ খান ইংরেজদের থেকে টাকা খেয়ে বিষয়টি ফাঁস করে দিলে গোয়েন্দা পুলিশ শায়খ আবদুর রহীম রহ.-এর কাছ থেকে রেশমী রুমালরূপী পত্রটি উদ্ধার করে। ফলে আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে শায়খুল হিন্দের বৃটিশবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে ইংরেজরা বেখরবর ছিল না। প্রথমদিকে সন্দিগ্ধ থাকলেও এ পত্রটি উদ্ধারের পর থেকে

শায়খুল হিন্দ রহ.-কে গ্রেফতারের জন্য ইংরেজ গোয়েন্দা পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠে এবং একপর্যায়ে গ্রেফতারে সক্ষম হয়। এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় রেশমী রুমাল আন্দোলন।

প্রশ্ন : ৫৪ : হিজাজে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী এবং তাঁর কারাজীবন ও মুক্তি লাভের পর স্বদেশে প্রত্যবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : শাইখুল হিন্দ রহ. ছিলেন ইংরেজ বিতাড়ন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক। ভারতবাসীকে বাঁচাতে গিয়ে জেল-জুলুম, হুলিয়াসহ অনেক কিছুই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। নিম্নে হিজাজে শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী, কারামুক্তি ও স্বদেশে প্রত্যবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

হিজাজে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর গ্রেফতারী

হিজাজে ১৯১৬ সালে ১০ই জুন তুর্কিশাসনের অবসান ঘটে শরীফ হুসানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে শাইখুল হিন্দ রহ. এবং তাঁর সাথীরা কোনো মতে পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন। ভারতীয় মুসলমানদের অন্তরে তুর্কিদের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ফতওয়া প্রণয়ন করে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাতে স্বাক্ষর না করায় শরীফ হুসাইন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অপরদিকে ইংরেজ অফিসার “কর্ণেল ওয়েলসন” রেশমী রুমালের তথ্যের ভিত্তিতে শরিফকে নির্দেশ করে মাওলানা মাহমূদ রহ.-কে বন্দি করে জিদ্দায় পাঠাতে। ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এবং তাঁর সাথীরা আত্মোগোপন করেন। কিন্তু শরীফ হুসাইন এর পুলিশ শাইখুল হিন্দ রহ.-কে না পেয়ে, তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্য মাওলানা ওজায়ের গুল রহ. এবং ওয়াহীদ আহমদ রহ.-কে গ্রেফতার করে এই ফরমান জারী করে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে উপস্থিত করতে না পারলে, ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে তাদের দুজনকে হত্যা করা হবে। এ ঘোষণা শুনে শায়খুল হিন্দ রহ. নিজেই এসে পুলিশের হাতে ধরা দেন। ১৯২৬ সালে শরীফের পুলিশ তাকে ধরে হিজাজে বন্দি করে।

শাইখুল হিন্দ রহ.-এর কারাজীবন

শাইখুল হিন্দ রহ. ছিলেন বৃদ্ধ। কারাগারে তাঁর উপর ভয়াবহ নির্যাতনের আশংকা করে তাঁর ছাত্র হুসাইন আহমদ বৃদ্ধ উস্তাদের সাথে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন এবং লোক মারফতে শরীফকে জানান যে, হুসাইন আহমদ মূল অপরাধী,

তাকে বন্দি করা হোক। এ সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকেও বন্দি করে জীদ্দায় পাঠানো হয়। গ্রেফতারের একমাস পর ১৯১৭ সালে ১২ই জানুয়ারি তাঁদেরকে জিদ্দা থেকে মিশরে প্রেরণ করা হয়। এরপর সুয়েজ প্রণালীতে, সেখান থেকে নীলনদের অপর প্রান্তে জীযা'র কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

(ক) শাইখুল হিন্দ রহ.-কে জিজ্ঞাসাবাদ

জিযা'র কারাগারে নেওয়ার পর থেকে শুরু হয় পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সর্বপ্রথম শাইখুল হিন্দ রহ.-কে সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় "ট্রেম ওয়ে নগরীতে" নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই ছিল ইংরেজদের পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক হেড কোয়ার্টার। তিন জন ইংরেজ অফিসারের উপস্থিতিতে জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হয়। শাইখুল হিন্দ রহ. অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এবং কর্কশ কণ্ঠে তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। অবশেষে তারা নিজেরা বলাবলি করে যে, আমাদের নিকট যে রিপোর্ট রয়েছে, তাতে তার ফাঁসি অনিবার্য। কিন্তু রেকর্ডপত্র পর্যাপ্ত না থাকায় আমরা সে নির্দেশ দিতে পারছি না। এক এক করে শাইখুল হিন্দ রহ., মাদানী রহ., মাওলানা উযায়ের গুল রাহ., মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ রহ. এবং হাকীম নুসরত হুসাইন ফতেহপুরী রহ. প্রমুখ বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরাম সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

(খ) মাল্টায় নির্বাসন

এক মাস ফাঁসির আসামীর মতো অন্তরীণ রাখার পর ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁদেরকে আসবাবপত্র গুছিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ১৯১৭ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁদেরকে ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ মাল্টায় নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকাল চারটায় তারা মাল্টায় অবতরণ করেন এবং এখানেই তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের স্ট্রীমরুলার চালানো হয়। তাঁরা সেখানে তিন বৎসর চার মাস বৃটিশদের পক্ষ থেকে নির্মম শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন ভোগ করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শায়খুল হিন্দ খেতাবে ভূষিত করণ

দীর্ঘ তিন বৎসর চার মাস কাল নির্মম শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনের পর ১৯২০ সালের ২০শে মার্চ তাঁরা মাল্টা ছেড়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর তিন মাস পর বোম্বাই বন্দরে এসে পৌছান। জাহাজ থেকে নামার সাথে সাথে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত খেলাফত কনফারেন্সে তাঁকে "শাইখুল হিন্দ" খেতাবে ভূষিত করা হয়।

ইহধাম ত্যাগ

মাল্টা থেকে ফেরার পর শাইখুল হিন্দ রহ. মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এ আধ্যাত্মিক সাধক পরপারে পাড়ি জমান।

উপসংহার : ভরত উপমহদেশের রাজনীতিতে শাইখুল হিন্দ রহ. ছিলেন একজন অনন্য পথিকৃত। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

প্রশ্ন : ৫৫ : শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রহ.-এর পরিচয় কি? তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার বিবরণ দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : ভারত উপমহাদেশকে বৃটিশ আগ্রাসনমুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন এবং যাদের অক্লান্ত মেহনত ও মুজাহাদার বরকতে বিজাতীয়দের অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পরেও ইসলাম নিজ স্বকীয়তায় অক্ষুণ্ন রয়েছে, সেইসব মহা মনীষীগণের অন্যতম হলেন শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও রাজনৈতিক তৎপরতার উপর আলোকপাত করা হল।

জন্ম ও পরিচয়

নাম হুসাইন আহমদ। উপাধি শাইখুল ইসলাম। তিনি ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৯৬ হিজরীর ১৯শে শাওয়াল ভারতের ফয়েযাবাদ জেলার ট্যাণ্ডায় বিখ্যাত সাইয়েদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাইয়েদ হাবীবুল্লাহ ছিলেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তার পিতা-মাতা উভয়ই হযরত হুসাইন রাযি.-এর বংশধর।

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৪ বৎসর বয়সে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে এসে মিজান জামাতে ভর্তি হন। তখন থেকেই তিনি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর সাহচর্যে আসেন। ১৩১৫ হিজরী দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

পরিবারের সাথে মদীনা শরীফে হিজরত ও আধ্যাত্মিক সাধনা

হযরত মাদানী রহ.-এর পিতা স্বপরিবারে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। তবে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর পরামর্শে তিনি ও তাঁর বড় ভাই হিজরতের

নিয়ত করেন নি। মদীনা শরীফে যাওয়ার পর তিনি হযরত ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং হযরত গঙ্গুহী রহ. থেকে খেলাফত লাভ করেন।

মসজিদে নববীতে দরসে হাদীসের খেদমত ও ভারত প্রত্যাবর্তন

মদীনা শরীফে অবস্থানকালে তিনি দীর্ঘ আঠার বছর দরসে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. রেশমী রুমাল আন্দোলন উপলক্ষে মদীনা শরীফে গমন করলে তিনি আপন উস্তাদের খেদমত ও রাজনৈতিক তৎপরতায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯১৬ সালে ডিসেম্বর মাসে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে উস্তাদের সাথে মাল্টায় যান। ১৮২০ সালের মার্চ মাসে মাল্টা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শাইখুল হিন্দ রহ.-এর নির্দেশে তিনি ভারতবর্ষেই থেকে যান এবং দারুল উলূম দেওবন্দসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ইলমে নববীর খেদমতের পাশাপাশি উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান।

ইন্তেকাল

এ মহামনীষী ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে ৭৯ বছর বয়সে দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন।

হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক তৎপরতা

হযরত মাদানী রহ. ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। এ অঙ্গনে তার অবদান অপরিসীম। নিম্নে তার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

হযরত মাদানী রহ.-এর রাজনীতিতে পদার্পণ

হযরত মাদানী রহ. ছিলেন হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর একান্ত আস্থাভাজন ছাত্র। তাঁর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। উপমহাদেশের নেতৃত্বের জন্য তিনি তাঁকে পূর্ব থেকে মনোনীত করে রেখেছিলেন। তাই পিতা-মাতার সাথে মদীনা শরীফ গমনের পরামর্শ দিলেও স্থায়ীভাবে সেখানে থাকার অনুমতি প্রদান করেন নি। রেশমী রুমাল আন্দোলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর শাইখুল হিন্দ রহ. মদীনা শরীফে গমন করে তিনি তাঁর একান্ত শাগরিদ মাদানী রহ.-এর নিকট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সাথে সাথে তাঁকে ঘিরে তার আশার কথা ব্যক্ত করেন।

হযরত মাদানী রহ. উস্তাদের আহবানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকেন। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর

সাথে তিনি মাল্টায় স্বেচ্ছায় কারা বরণ করেন। মুক্তি লাভের পর ভারত ফিরে এসে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাঁকে হাতে কলমে রাজনীতির দিক্ষা দেন এবং ভারতের নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ব্যক্তিগত যোগ্যতা, কর্মতৎপরতা ও দক্ষতার বলে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ইন্তেকালের পর অঘোষিতভাবেই তিনি আযাদী আন্দোলনের প্রধান মসনদে সমাসীন হন।

করাচীর কনফারেন্সের ঘোষণা ও কারাবন্দি মাদানী রহ.

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে করাচিতে মুহাম্মাদ আলী জওহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খেলাফত কনফারেন্সের সিদ্ধান্তবলী ঘোষণা করতে গিয়ে হযরত মাদানী রহ. বলেন, "বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকরি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।" এ ঘোষণার অপরাধে বৃটিশ সরকার তাঁকে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯২২ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান।

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও অসহযোগ আন্দোলন

হযরত মাদানী রহ. ও উলামায়ে দেওবন্দ শুরু থেকেই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস কেবল স্বায়ত্তশাসনেই সন্তুষ্ট ছিল। অবশেষে বৃটিশ সরকারের গড়িমসি দেখে কংগ্রেসও হযরত মাদানীর রহ.-এর পূর্ণ স্বাধীনতার দর্শন গ্রহণ করে এবং ১৯৩০ সালে লাহোর সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। ফলে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক দিয়ে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও কংগ্রেস এক প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনে হযরত মাদানী রহ. কংগ্রেসকে সমর্থন দানের প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও পেশ করেন। তখন হযরত মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের সমর্থনে প্রস্তাবটি গৃহিত হয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে জমিয়ত ও কংগ্রেস একযোগে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং সাথে সাথে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী ঐক্য

১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নেতা মি. জিন্নার অবদানের প্রেক্ষিতে জমিয়ত ও অন্যান্য দলের ঐক্যজোটের সাথে মুসলিম লীগকে শরীক করা হয়। শর্ত ছিল– দেশ, জাতি ও ঐক্যজোটের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর জিন্নাহ শর্তগুলো ভঙ্গ করেন। তিনি বলেন,

সেসব ছিল নির্বাচনী ঐক্যের শর্ত। নির্বাচনের পর সেগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। জিন্নাহর এ আচরণে মাদানী রহ. খুব মর্মাহত হন এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে।

দিল্লীতে হযরত মাদানী রহ.-এর বক্তৃতা ও জাতীয়তার প্রশ্নে বিভ্রান্তি

১৯৩৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় হযরত মাদানী রহ. ইংরেজদের DIVID AND RULE পলিসির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ইংরেজরা "হিন্দু-মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন দুই জাতিসত্তা"–এ শ্লোগানের মাধ্যমে এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়। তাই আসুন! আমরা সকল ধর্মাবলম্বীরা 'ভারতবাসী' এ ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাই।

মুসলিম লীগের কতিপয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর এ বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে প্রচার করেন, হযরত মাদানী রহ. বলেছে: "জাতীয়তার ভিত্তি ভৌগলিক ভূখণ্ড; ধর্ম নয়।" হযরত মাদানী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক রচনা করে এ মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার জবাব দেন।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও পাকিস্তান প্রস্তাব

ইংরেজদের "বিভেদ বাধাও শাসন কর" নীতির কারণে ১৯৪০ সালে হিন্দু মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য পৃথক ভূ-খণ্ডের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু হযরত মাদানী রহ. এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন।

১৯৪০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামার সম্মেলনে তিনি বলেন, "যদি পৃথক আবাসভূমি উদ্দেশ্য হয় নববী আদর্শের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, তা হলে এ প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু তা যদি বৃটিশদের DIVID AND RULE পলিসির গোপন চাল হয়ে থাকে, তা হলে তা বৃটিশদের প্রতারণামাত্র। তা ছাড়া পৃথক ভূমির কারণে হিন্দুস্তানে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু মুসলমান এবং মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন হবে।"

বৃটিশদের নমনীয়তা এবং পাকিস্তানের ঘোষণা

মুসলমান ও ভারতবাসীর প্রবল আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার নমনীয় হতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ৩রা জুন ভারতের বড় লাট মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেন এবং ১৪ ও ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হযরত মাদানী রহ. এর কর্মতৎপরতা

ভারতে অবশিষ্ট সংখ্যালঘু মুসলমান, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদির স্বার্থে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাইখুল ইসলাম মাদানী রহ. আমৃত্যু পাকিস্তানের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। সাথে সাথে পাকিস্তানে বসবাসকারী তাঁর অনুসারীদের পাকিস্তানের উন্নতি অগ্রগতি বিধান এবং তাতে কুরআন-সুন্নাহের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

উপসংহার : ইলমে নববীর মহান খাদেম ও উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্বত্যাগী মহামনীষী শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর বর্ণাঢ্য জীবন পরবর্তীদের জন্য চিরকালই এক অনুপম আদর্শ।

প্রশ্ন : ৫৬ : করাচী খিলাফত কনফারেন্সে হযরত মাদানী রহ.-এর ঘোষণা আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং মুসলিম জাতির হিফাজতে হযরত মাদানী রহ. ছিলেন আপসহীন নেতা। এ বিষয়ে কোনো শাসক বা জেল-জুলুম, হুলিয়া ইত্যাদি কোনোকিছুর ভয় করতেন না। তিনি মরণকে হাতের মুঠোয় রেখেই প্রকাশ্যে ভাষণ প্রদান করতেন। এর একটি দৃষ্টান্ত হল করাচীর খিলাফত কনফারেন্সে তাঁর ঘোষণা। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

করাচীর খিলাফত কনফারেন্সে হযরত মাদানী রহ. এর ঘোষণা

১৯২১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর করাচীর মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্সের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তবলী ঘোষণা করেন হযরত মাদানী রহ.। তিনি প্রকাশ্যে জনসভায় ঘোষণা করেন যে, "বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকরি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।" এ ফতওয়ার উপর স্বাক্ষর করেন মাওলানা নেছার আলী রহ. ও পীর গোলাম মুজাদ্দিদ রহ. এবং সমর্থন পেশ করেন মুহাম্মদ আলী জওহর রহ. ও মাওলানা শওকত আলী রহ.। এরপর এ ফতওয়া ছাপিয়ে সারা দেশে প্রচার করা হয়।

মাদানী রহ.-কে বন্দি করণ

করাচীর সম্মেলনের আড়াই মাস পর ১৮ই সেপ্টেম্বর মাদানী রহ.-কে রাতের বেলায় শায়খুল হিন্দের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

বন্দিকালীন সময়ে জনগণের অবস্থা

মাদানী রহ.-কে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশকে যথেষ্ট ধকল পোহাতে হয়। এমনকি জনসাধারণের হাতে কিল-ঘুষিও খেতে হয়। অবশেষে সাহারানপুর থেকে রিজার্ভ ফোর্স এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সকালে গ্রেফতারের সংবাদ শুনে সারা দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়।

উকীল বেশে মাদানী রহ.

করাচীতে নিয়ে যাওয়ার পরে ২৬শে সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক মামলার শুনানি শুরু হয়। তখন মাদানী রহ. উকীল বেশে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, মাননীয় আদালতের সকল প্রশ্নের জবাব আমি নিজেই লিখিতভাবে পেশ করব।

বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে

বৃটিশ সরকার যে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে, তা আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন : আমি একজন মুসলমান এবং আলেমও। মুসলমান হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস রাখা আমার দায়িত্ব। আর আলেম হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর বাণী সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য। এরপর এ বিষয়ে তিনি কুরআন হাদীসের বহু দলীল-প্রমাণ পেশ করেন এবং বলেন, ইসলামী ফিকহ বিশেষজ্ঞ মাওলানা আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী রহ., শাহ আবদুল আযীয রহ., মাওলানা থানবী রহ. প্রমুখ মনীষীগণও ইংরেজ সরকারের অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করা হারাম বলে ফতওয়া দিয়েছেন। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এ সিদ্ধান্ত নতুন কোনো বিষয় নয়। এটা ইসলামী আকীদার চিরন্তন ফয়সালা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামের এ বিধানকে প্রচার করা আমি আমার ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করি। আর এর প্রচারে বাধা প্রদানকে আমি আমার ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করি।

জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ

বক্তৃতার শেষ প্রান্তে এসে মাদানী রহ. বলেন, আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নস্যাৎ করাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হোক। তখন সাত কোটি মুসলমান চিন্তা করে দেখবে, তারা মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকবে, নাকি সরকারের প্রজা হিসেবে বেঁচে থাকবে? অনুরূপভাবে বাইশ কোটি হিন্দুরাও চিন্তা করে দেখবে, তাদের কি করা উচিত? কারণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা যখন হনন করা হবে, তখন সব ধর্মেরই করা হবে। আর যদি "লর্ড বেডংগকে" ভারতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হয় তার দ্বারা কুরআন-সুন্নাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তা হলে ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম প্রাণদানকারী হব আমিই।

উপসংহার : আপসহীন সিপাহসালার হযরত মাদানী রহ.-এর এ ঘোষণা ও ভাষণ যুগ যুগ ধরে মুসলমানরা স্মরণ করবে এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে ইসলামের জন্য পেশ করবে। সকল মুসলমানের মাদানী রহ.-এর মতো ধর্মানুরাগী হওয়া চাই।

প্রশ্ন : ৫৭ : জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ কর।

উত্তর : ভূমিকা : জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেযামে ইসলাম দেশ ও জাতির কল্যাণে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে। তা ছাড়া বহু ধর্মীয় ও সামাজিক খিদমতও আঞ্জাম দিয়েছে। নিম্নে তাঁদের তৎপরতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বেশকিছু তৎপরতা চালিয়েছে। যেমন :

(১) লাহোরে মুচী দরওয়াজায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্স

১৯৬৮ সালের ৩, ৪, এবং ৫ই মে লাহোরে মুচী দরওয়াজায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের কনফারেন্সে মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী রহ., জমিয়তের সভাপতি মুফতী মাহমূদ রহ. সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

(২) ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯ সালের নির্বাচন

৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকার ইডেন হোটেলের সম্মুখস্থ মাঠে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়ত কাউন্সিল অধিবেশনে পীর মোহসিন উদ্দীন দুদু মিয়াকে সভাপতি ও মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী রহ. সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পীর সাহেব সভাপতির পদ ত্যাগ করলে আব্দুল করিম কৌড়িকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

(৩) ১৯৭০ সালের নির্বাচন

১৯৭০ সালের ইয়াহইয়া খানের সাধারণ নির্বাচনে মুফতী মাহমূদ রহ. সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এরপর ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর হটকারী সিদ্ধান্ত এবং শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কারণে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় এবং ৯মাস পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ব্যতীত অনেক ইসলামী দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসাগুলো খুলে দেওয়ার ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

(৪) ১৯৭৪ সালের নির্বাচন

১৯৭৪ সালে যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় অনুষ্ঠিত উলামা সম্মেলনে মাওলানা তাজাম্মুল আলী জালালাবাদীকে সভাপতি ও মুফতী আহরারুজ্জামান হবিগঞ্জীকে সাধারণ সম্পাদক করে "জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ" গঠন করা হয়। এরপর ২৯শে অক্টোবর ১৯৭৪ সালে যাত্রাবাড়ী মাদরাসার সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল করিম কৌড়িকে সভাপতি ও মাওলানা শামুসুদ্দীন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট "জমিয়তের মজলিসে আমেলা" গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালে ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর পাটুয়াটুলি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মাওলানা আজিজুল হককে সভাপতি এবং মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' পুনঃগঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাধারণ সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করায় মজলিসে শুরার সভায় মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

(৫) কওমী মাদরাসার শিক্ষাবোর্ড গঠন

১৯৭৮ সালে লালবাগ শায়েস্তা খান হলে কওমী মাদরাসাসমূহের এক সম্মেলন আহ্বান করে "বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়াহ কওমিয়া বাংলাদেশ" নামে বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড গঠন করা হয়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থেকে
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

(মুহাম্মদ আবদুল জব্বার)
মহাসচিব. বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ' নামে বর্তমানে যে সংস্থা বিদ্যমান আছে, তার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা আবশ্যক মনে করি।

পাকিস্তান আমলে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান ছিল একটি ঐতিহাসিক ইসলামী সংগঠন। ১৯৫৪ সনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম তার রাজনৈতিক শাখা নেজামে ইসলাম পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তখন তিন দলীয় একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম পার্টি। নাম দেওয়া হয় যুক্তফ্রন্ট। এ যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব আসনই দখল করে যুক্তফ্রন্ট। পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি ৩৬টি আসন পায়।

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী হন নেজামে ইসলাম পার্টির জনাব আশরাফুদ্দীন চৌধুরী। কেন্দ্রীয় যুবমন্ত্রী হন এডভোকেট জনাব ফরিদ আহমদ চৌধুরী। জাতীয়

সংসদের স্পীকার হন জনাব আবদুল ওহ্হাব। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার পর নেজামে ইসলাম পার্টি তার ভাবমূর্তি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। এমনকি অস্তিত্বহীন অবস্থার সম্মুখীন হয়।

এ সময়ে আমরা কতিপয় যুবক ঢাকার এমদাদুল উলূম মাদরাসা ফরিদাবাদে শিক্ষকতা করি। আমাদের অন্যতম নেতা ছিলেন হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। প্রথম মিটিং হয় ঢাকার ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন মসজিদের দোতলায়। তখন এ মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন হযরত মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব। তাঁর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব উদ্বোধনী ভাষন দেন। তাঁর ভাষণে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরে পূর্ব পাকিস্তানে সেটার শাখা গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং একটি শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

তখন এ কমিটিতে যারা সদস্য হলেন, তারা হলেন হযরত মাওলানা ছফিউল্লাহ সাহেব, হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব, হাফেজ মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ সাহেব, হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা মাহফূযুর রহমান সাহেব, হযরত মাওলানা শামসুল আলম সাহেব, হাফেয ফয়জুর রহমান সাহেব, হাফেয তাজুল ইসলাম সাহেব এবং নগণ্য আবদুল জব্বারসহ বহু নবীন উলামায়ে কিরাম। অস্থায়ী অফিস করা হয় ফরিদাবাদ মাদরাসায়। ফরিদাবাদ মাদরাসার তৎকালীন মোহতামেম হযরত মাওলানা বজলুর রহমান সাহেব থাকলেন প্রধান উপদেষ্টা।

কাজ আরম্ভ হল। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ হতে থাকল। হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পত্র আসল যে, আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে ঢাকা আসছি। তখন আমরা জানতে পারলাম যে, সিলেটের উলামায়ে কিরাম আমাদের থেকে আরো বহু আগেই পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়তের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসছেন। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ঢাকা আসলেন। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন হাফেযে হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ দরখাস্তী সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ সাহেব, হযরত মাওলানা গোলাম গাওস হাজারভী সাহেব ও হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ গুল বাদশাহ সাহেব রহেমা হুমুল্লাহ।

ঢাকায় কয়েকটি প্রোগ্রাম হল। ঢাকা মহানগর জমিয়ত গঠন করা হল। জেলায় জেলায় কমিটি হতে থাকল। যা হো'ক, সর্বত্র জমিয়ত গঠিত হতে থাকল। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর প্রথম সভাপতি হলেন শায়খে কৌড়িয়া হযরত মাওলানা আবদুল করিম সাহেব, সেক্রেটারী জেনারেল

হলেন মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব। ঢাকা মহানগর জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি হলেন মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেব। আর সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হল আমি অধম মুহাম্মাদ আবদুল জব্বারকে। ১৯৭১ ঈঃ সন পর্যন্ত এ পদে আমি বহাল ছিলাম। এ ছাড়া আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং জমিয়তের অফিস সেক্রেটারীও ছিলাম।

তা ছাড়া ছাত্র সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনেরও মূল পরিচালক ছিলাম আমি। ১৯৬৮ সনে লাহোর সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গিয়েছিলেন ১১জন বিজ্ঞ আলেম। আমি নগণ্য সেই দলে ছিলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৬ সনে যখন নতুনভাবে জমিয়ত গঠন করা হয়, তখন এ জমিয়তের সভাপতি করা হয় হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবকে, সহ-সভাপতি করা হয় মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেবকে, সেক্রেটারী জেনারেল করা হয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবকে এবং আমি অধমকে করা হয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ১৯৭৬ সনে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন আমি যে সমস্ত প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, তার মধ্যে অন্যতম প্রস্তাব ছিল- কওমী মাদরাসাসমূহের একটি বোর্ড গঠন করা হোক। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং হযরত মাওলানা রেজাউল করিম ইসলামাবাদীকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অপর দুই সদস্য হলেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব ও হযরত মাওলানা তাফাজ্জুল হক সাহেব মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জ।

উল্লেখ্য, জমিয়তের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব। তিনি তখন ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে এডভোকেট হয়ে প্রাকটিস করতেন। বর্তমানে তিনি জীবিত নাই। মুফতী ওয়াক্কাস সাহেব ছাত্র নেতা ছিলেন। শ্রমিক সংগঠনের সেক্রেটারী ছিলেন চাঁদপুরের আলী মিয়া পাটোয়ারী।

একাত্তরের সংগ্রামের সময় জমিয়তের সভাপতি ছিলেন ফরায়েজী জামায়াতের হযরত মাওলানা পীর মুহসেন উদ্দীন সাহেব দুদুমিয়া। আর সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী সাহেব।

বেফাক প্রতিষ্ঠা : আবার জমিয়ত গঠন উপলক্ষ্যে ১৯৭৬ সনে অনুষ্ঠিত ২দিনব্যাপী উলামা সম্মেলনে কওমী মাদরাসার বোর্ড গঠনের প্রস্তাব আমিই পেশ করেছিলাম। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং হযরত মাওলানা রেজাউল করিম সাহেবের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অপর দুই সদস্য হলেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব ও হযরত মাওলানা তাফাজ্জুল হক সাহেব মুহাদ্দিসে হবিগঞ্জ।

প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর এ আহ্বায়ক কমিটি কোনো উদ্যোগ নেয় নাই এবং জমিয়তও তাদেরকে ডেকে কাজটি করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও কিছু বলে নাই। এভাবে প্রায় একবছর চলে যায়। আমি তখন যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় পড়াই। একদিন বিকেল বেলা ফরিদাবাদ মাদরাসায় বেড়াতে গেলাম। গিয়ে দেখি মাদরাসার মসজিদে অনেক লোক। একটা মিটিং হচ্ছে। আমি মসজিদে না গিয়ে মাদরাসার দফতরে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিসের মিটিং? বলা হল যে, কওমী মাদরাসা বোর্ড গঠনের মিটিং হচ্ছে। মূল উদ্যোক্তা কে? বলা হল মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব। একটু পরে টের পাই তুমুল হৈ চৈ। এরপর মিটিং ভেঙ্গে গেল। উলামায়ে কিরাম এক এক করে সব চলে গেলেন। ইতোমধ্যে মাদরাসার অফিসে তাশরীফ নিয়ে আসলেন মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব। তিনি আমাকে দেখে বললেন, হুযূর! আপনারা জমিয়ত গঠনের সময় প্রস্তাব পাশ করলেন কওমী মাদরাসার বোর্ড গঠন করার। তা কেন করলেন না? আমি কোনো জবাবই দিলাম না।

পরে তিনি বললেন যে, এখানে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা সফল হবে না। খুব গোলমাল লেগে গেছে। আপনারা খুব শীঘ্র উদ্যোগ নিন। আমি তখন বাংলাবাজার চলে গেলাম মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেবের নিকট। তিনি জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক। তাকে ঘটনাটি বললাম। তারপর তাঁকে মিটিং ডাকতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, এ বিষয়টাতো আপনাদের। আপনিই তো প্রস্তাব পেশ করে পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। মিটিং আপনিই ডাকুন। আমি বললাম, আপনি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকলে আমি মিটিং ডাকতে পারি। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি মিটিং ডাকলাম। ঢাকার প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম অনেকেই উপস্থিত হলেন। শাইখুল হাদীস সাহেবও উপস্থিত হলেন। তার সভাপতিত্বে সভা হল।

অনেক আলাপ আলোচনার পর সাব্যস্ত হল উদ্যোগ নিতে হবে। পূর্ব গঠিত আহ্বায়ক কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হল এন্তেজামিয়া কমিটি গঠন করে সম্মেলন আয়োজন করার জন্য। সেমতে আহ্বায়ক হযরত মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব ৬০ সদস্য বিশিষ্ট সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করলেন। বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বন্টন করা হল। আমার উপর দক্ষিনাঞ্চলের মাদরাসা সমূহে দাওয়াত পৌছান, মুদ্রিত কাগজ পত্রের প্রুফ দেখা ইত্যাদি দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রায় প্রতি দিনই মিটিং হত। সব মিটিংয়েই আমি উপস্থিত থাকতাম।

এরপর ১২,১৩,১৪ এপ্রিল, ১৯৭৮ ঈঃ সনে তিনদিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল লালবাগস্থ শায়েস্তা খান হলে। সেখানে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া

কওমিয়া বাংলাদেশ নামে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসা সমূহের একমাত্র জাতীয় সংস্থা বা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হল। পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মোহতামেম হযরত মাওলানা হাজী ইউনুস সাহেবকে সভাপতি করা হল। আর হযরত মাওলানা আজিজুল হক শাইখুল হাদীস সাহেবকে সেক্রেটারী জেনারেল করা হল। এতে মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব খুব ক্ষুব্ধ হলেন। আমি বিষয়টি আঁচ করে সহ-সভাপতি হিসেবে মাওলানা রেজাউল করিম সাহেবের নাম প্রস্তাব করলাম। প্রস্তাবটি গৃহীত হল। কিন্তু মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি এটা গ্রহণ করলেন না। তার আগ্রহ ছিল সেক্রেটারী জেনারেল-এর দায়িত্ব নেওয়ার। এ কারণে তিনি সহ-সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না। কোনো দিন মিটিংয়েও যোগদান করেন নাই।

পটিয়ার স্বনামধন্য মোহতামেম হযরত মাওলানা হাজী ইউনুস সাহেব হুযূর-এর নামে সভাপতির প্রস্তাব যখন পেশ করা হল, তখন তিনি জানতে চাইলেন যে, জমিয়তের লোকদের উদ্যোগে গঠিত বেফাক কি জমিয়তের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, না কি স্বাধীন সত্তা নিয়ে কাজ করবে? সেখানে আমরা যারা জমিয়তের লোকজন উপস্থিত ছিলাম, তারা সবাই একবাক্যে ওয়াদা করেছি যে, বেফাক স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে, জমিয়তের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে না। যদিও আমরা বেশীর ভাগ লোকেরা এটা জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু জমিয়তের কোন কোন নেতা মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ ভাবেই বেফাক গঠিত হয় এবং তখন থেকে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

(মহাসচিবের লেখা সমাপ্ত)

(৬) ১৯৮১ সালের নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ১৯৮১ সালের নির্বাচনে জমিয়ত হাফেজ্জী হুজুরের সাথে মিলিত হয়ে নির্বাচন করে এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে। তাঁর ইরান সফরকে কেন্দ্র করে মতনৈক্য দেখা দিলে ১৯৮৪ সালে জমিয়ত তার সমর্থন প্রত্যাহার করে। মাওলানা আব্দুল করিমকে সভাপতি ও মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে কর্মকাণ্ড শুরু করে।

(৭) ১৯৯১ সালের নির্বাচন : ১৯৯১ সালের ১১, ১২, এবং ১৩ই ডিসেম্বর আরজাবাদ মাদরাসায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের কাউন্সিলে মাওলানা আব্দুল করিম কৌড়িকে সভাপতি আর মুফতী ওয়াক্কাসকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

(৮) জমিয়তের কার্যক্রম : জমিয়ত তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে কুরআন এবং সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা, খ্রিষ্টান মিশনারী, কাদীয়ানী, বাহায়ীদের মুকাবেলায় এবং শী'আ ও মওদুদী ইত্যাদি ফিতনা প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত রাখেন।

উপসংহার : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.-এর চিন্তাধারার অনুসারী এ কাফেলা উপমহাদেশের মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত ও রাজনৈতিক সংকট মুকাবেলায় যে অনন্য অবদান রেখেছেন, ইতিহাসে তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : ৫৮ : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে পাকিস্তান প্রস্তাবের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের উন্নতি অগ্রগতি ও মুসলমানদের সমৃদ্ধির জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. পাকিস্তানে বসবাসকারী তাঁর অনুসারীদেরকে পাকিস্তানের উন্নতি, স্থায়িত্ব ও কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। নিম্নে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার উপর আলোকপাত করা হল:

ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

১৯৪৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ নেতা মি. জিন্নাহ পাকিস্তান প্রশ্নে উলামায়ে কিরামকে এ আশ্বাস দেন যে, নির্বাচনে জয়ী হলে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব। ফলে উলামায়ে দেওবন্দের দুই দল হযরত মাদানী রহ. নেতৃত্বাধীন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' এবং হযরত শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর নেতৃত্বাধীন "জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম" মুসলিম লীগের ব্যানারে প্রচারণা চালায়।

কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হয়ে মি. জিন্নাহ উলামায়ে কিরামকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ফলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উলামায়ে দেওবন্দ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একযোগে আন্দোলন শুরু করেন। এর অংশ হিসেবে ১৯৫০ সালের ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ শাসকদের ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে উদাসীনতা উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে উক্ত সম্মেলনে মুসলিম লীগ থেকে জমিয়তের সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ ছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে ১৯৫০ সালে হযরত আল্লামা সুলায়মান নদভী রহ.-এর সভাপতিত্বে সিলেটে এক উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করা হয়। এরপর ১৯৫১

সালেই করাচীতে আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদভী রহ.-এর সভাপতিত্বে সকল দলমতের উলামায়ে কিরামের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে শাসনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ২২ দফা মূলনীতি প্রণীত ও অনুমোদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হাতে তা অর্পণ করা হয় এবং সারা দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন আরো জোরদার করা হয়।

তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে ২দিন ব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এমনিভাবে উলামায়ে দেওবন্দ ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সালে সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলিম লীগ কর্তৃক জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদাখেলাফীর কারণে পূর্বে গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমিয়ত নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেন। ফলে ১৯৫৪ সালের উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়।

কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন

১৯৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জমিয়ত নেতৃবৃন্দ খতমে নবুয়ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ., মাওলানা গোলাম গাউছ হাজরভী রহ. প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আহবানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে লাহোরে বিক্ষোভ মিছিল করে। ওই বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। দশ হাজারের অধিক মুসলমান লাহোরের রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দের আন্দোলন

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারী করলে রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এ সময় আইয়ূব খান কর্তৃক প্রণিত শরী'অতবিরোধী "মুসলিম পারিবারিক আইন"-এর বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দ আন্দোলন করেন।

নেযামে ইসলাম পার্টির আত্মপ্রকাশ

১৯৬৭ সালে মারকাযে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বা নেযামে ইসলাম পার্টি এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে দু'টি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে উলামায়ে দেওবন্দ রাজনৈতিক তৎপরতা চালান।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতা

১৯৬৮ সালের মে মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্ত রহ.-কে সভাপতি এবং মাওলানা মুফতী মাহমূদ হাসান রহ.-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। অপরদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শায়খে কৌড়িয়া রহ.-কে সভাপতি এবং শামসুদ্দীন কাসেমী রহ.-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে সারাদেশে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর তৎপরতা শুরু হয়।

নেযামে ইসলাম পার্টির তৎপরতার রিপোর্ট

১৯৬৯ সালের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে নেযামে ইসলাম পশ্চিম পাকিস্তান মুফতি শফী রহ.-কে প্রধান উপদেষ্টা, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ.-কে সভাপতি এবং মাওলানা আতহার আলী রহ.-কে কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নেযামে ইসলাম পার্টি জোর প্রতিবাদ জানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবিগুলো আদায়ের সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর জমিয়ত নেতৃবৃন্দের সহায়তায় হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং তাতে তৃতীয়স্থান অধিকার করেন।

উপসংহার

পাকিস্তান প্রস্তাবে উলামায়ে দেওবন্দের একাংশের বিরোধিতা থাকলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দলমত নির্বিশেষে উলামায়ে দেওবন্দ সংঘবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের উন্নতি অগ্রগতি ও ইসলাম মুসলমানদের সার্থে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখেন।

প্রশ্ন : ৫৯ : উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান সম্পর্কে আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : একটি সুস্থ সমাজ গঠনের পূর্ব শর্ত হল, সুস্থ চিন্তার অধিকারী আদর্শবান নাগরিক তৈরি ও অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ। আর এজন্য অপরিহার্য হল, আদর্শ শিক্ষা এবং সৎ ও পরিমার্জিত জীবনের প্রশিক্ষণ। প্রতিটি নাগরিকের মাঝে

আদর্শ সচেতনতা, নৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মহৎ গুণগুলো সৃষ্টি করতে পারলে এবং অসদাচার, অনৈতিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারলে একটি সুস্থ সমাজ গঠনের পথ সহজেই উন্মুক্ত হয়। আদর্শ প্রশিক্ষণ ও তারবিয়তের মাধ্যমে চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মাঝেও যে একটি আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব– উলামায়ে দেওবন্দ তা তাঁদের কালজয়ী অবদানের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। নিম্নে তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক অবদান

উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের শিক্ষাধারার ধর্মীয় আদর্শকে শিক্ষার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কুরআন ও সুন্নায় যে সমাজ গঠনের পয়গাম শুনানো হয়েছে, ছাত্রদেরকে তারই শিক্ষা প্রদান করা হয়।

শিক্ষা দানের পাশাপাশি আহরিত জ্ঞানের কতটুকু নিজের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার প্রতিও তীক্ষ্দৃষ্টি প্রদান করা হয় এ শিক্ষা ধারায়। এ শিক্ষা ধারায় তা'লীমের প্রতি যতটুকু গুরুত্বারোপ করা হয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয় তরবিয়ত ও আমলী প্রশিক্ষণের প্রতি। একজন ছাত্র লেখা-পড়ায় যতই ভালো হোক, কিন্তু যদি সে আমলীভাবে গড়ে না উঠে অর্থাৎ শিক্ষার সাথে যদি তার দীক্ষা লাভ না হয়, তা হলে তার শিক্ষার স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে।

যে ছাত্র লেখা-পড়া এবং নৈতিক ও চারিত্রিক উভয়দিক দিয়েই ভালো, কেবল তাকেই একজন ভালো ছাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়, যাতে একজন ছাত্র নৈতিকতা বিরোধী কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা; আমলী ক্ষেত্রেও কোনো দুর্বলতা প্রকাশ হলে সে নিজেই নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। ফলে শরী'অতের প্রত্যাশা মোতাবেক নিজের জীবন গঠন করা তার জন্য সহজ হয়।

এভাবে একজন শিক্ষার্থীকে ব্যক্তি জীবনে সৎ চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, পরিমার্জিত জীবনবোধ নিয়ে বেড়ে উঠে। এরা যে শুধু তাদের কর্মময় জীবনে আদর্শ নাগরিক হিসেবে জীবন-যাপন করে, তাই নয় বরং যারা তাদের সংস্পর্শে আসে, তাদেরকেও সৎ ও পরিমার্জিত জীবন বোধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে আদর্শবান মানুষ রূপে গড়ে তোলে।

তা ছাড়া এ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নৈতিক আদর্শিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সমাজে এমন একটি চিত্র অঙ্কন করেছে যে, এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া কোনো শিক্ষার্থী আমলী দিক থেকে সামান্য ত্রুটি-অলসতা করলে সুন্নতের

সামান্য খেলাপ চললে, যারা নিজেরাই সৎজীবন যাপন করে না তারাও তাদেরকে সুনজরে দেখে না। সুতরাং সমাজ আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেই নিয়েছে, এ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো শিক্ষার্থী উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতার মূর্তপ্রতীক হয়ে থাকে।

সুতরাং নির্দ্বিধায়ই বলা যায়, উন্নত সমাজ গঠনে নৈতিকতার দীক্ষায় উত্তীর্ণ যে নাগরিকের প্রয়োজন, উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের শিক্ষা ধারার মাধ্যমে তাই তৈরি করে যাচ্ছেন।

তা ছাড়া ওয়াজ-নসীহতসহ পীর-মুরীদী, আদর্শ মানুষ তৈরির লক্ষ্যে অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে তারা আদর্শ নাগরিক তৈরির যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আমাদের সামাজিক জীবনে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় সম্প্রীতির বন্ধন, যা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নেহাৎ দুর্লভ।

উলামায়ে দেওবন্দের অর্থনৈতিক অবদান

অর্থ মানুষের জীবনে যেমন স্বাচ্ছন্দ আনে, তেমনি অর্থ মানুষের জীবনে অনর্থও সৃষ্টি করে প্রচুর। জীবনে চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন যেমনি অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অর্থ-সম্পদের প্রতি অন্ধমোহজনিত অনিষ্টতাকেও এড়িয়ে চলা যায় না। তাই ইসলাম অর্থের মোহ ও সম্পদের লালসাকে কোনো ক্রমেই অনুমোদন করে নি বরং অর্থ-সম্পদের আসক্তি থেকে উম্মতকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। উলামায়ে দেওবন্দ এ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেই অগ্রসর হয়েছেন।

তাই অল্পেতুষ্টি, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রমী জীবনকে এ শিক্ষা ধারার অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে খুব অল্প সম্পদ নিয়ে বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তাঁদের পক্ষে। বলতে গেলে অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ ও সমৃদ্ধ অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উলামায়ে দেওবন্দ অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নে তাঁদের অর্থনৈতিক অবদানের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোকপাত করা হল:

এক. অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের পূর্ব শর্ত হল, সম্পদের নিরাপত্তা। নিরাপত্তা না থাকলে শত উপার্জনের পরও কেউ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। অন্যায় আত্মসাৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই তার পথ রুদ্ধ করতে ইসলাম হুকূকুল ইবাদের যে গুরুত্ব দিয়েছে, উলামায়ে কিরাম সমাজের সামনে তা তুলে ধরেন এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা চালান। ফলে অন্যের হক আত্মসাৎ করাকে মানুষ পাপ জ্ঞান করে নিজেই তা থেকে বিরত থাকতে আত্মচেতনা লাভ করে।

দুই. অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অন্যতম জরুরী বিষয় হল, চাহিদার নিয়ন্ত্রণ। কারণ, লাগামহীন চাহিদা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক দুরাচারের জন্ম দেয়। ফলে সুষ্ঠু অর্থনীতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ, সম্পদের যতই প্রাচুর্য ঘটুক; চাহিদা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তা হলে অভাব-অনটন কখনই শেষ হবে না। মানুষের চাহিদা হয়ে উঠবে বল্গাহীন।

আর বল্গাহীন চাহিদা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, আত্মসাৎ, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি অর্থনৈতিক দুরাচারের জন্ম দেয়। উলামায়ে দেওবন্দ নিজের জীবনে যেমনিভাবে চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনিভাবে অন্যদেরকেও চাহিদার নিয়ন্ত্রণের জন্য করেন অনুপ্রাণিত। ওয়াজ-নসীহত পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, সুদ, ঘুষের ইহ-পরকালীন ক্ষতির দিকসমূহ সমাজের সামনে তুলে ধরেন। তাঁদের এ কর্মতৎপরতার ফলে সমাজের বহু মানুষ অর্থনৈতিক সততা রক্ষা করে চলতে সক্ষম হচ্ছে।

তিন. সম্পদ যতই অর্জন করা হোক, কিন্তু ব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ মিতাচারী না হয়, তা হলে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হবে না। এ কারণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অপচয় রোধ করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতাচারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য। ইসলাম অপচয়রোধ এবং মিতাচারের যে বিধান দিয়েছে, তা সমাজের সামনে তুলে ধরছেন উলামায়ে দেওবন্দ। তারা নিজেরা যেমনি মিতাচারী জীবন এবং অপব্যয় ও অপচয়মুক্ত জীবনকে বেছে নিয়েছেন, তেমনি সমাজকেও সে পথে আহবান জানাচ্ছেন।

চার. অর্থ যদি কোনো ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে, তা হলে অর্থ-সম্পদের আবর্তন বাধাগ্রস্ত হয় এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এতে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠলেও সমাজের বৃহত্তর জনেগোষ্ঠী হয়ে পড়ে চরম দারিদ্র্যের শিকার। ফলে অর্থব্যবস্থা জটিল রূপ ধারণ করে। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গুটি কয়েক মানুষের হাতে অর্থনৈতিকভাবে জিম্মি হয়ে পড়ে।

ইসলাম অর্থনৈতিক আবর্তনকে স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং সম্পদ কারো হাতে আটকে না পড়ার জন্য যে বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, উলামায়ে দেওবন্দ তা সমাজের সামনে তুলে ধরেন সব সময়। কৃপণতার পরিণার্ম, দান-খয়রাতের ফযিলর্ত এবং যাকাত-ফিতরার বিধান সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা চালান। তারা নিজেরা যেমনি কৃপণতা ও অর্থ-সঞ্চয় করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রবণতা থেকে কঠোরভাবে বেঁচে চলেন, সমাজকেও এজন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলে অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক আবর্তন অব্যাহত রয়েছে।

পাঁচ. প্রতারণা, শোষণ এবং মধ্যসত্তভোগীদের দৌরাত্ম্যও সুষ্ঠু অর্থনীতি বিকাশের পথে অন্তরায়। এসব প্রবণতা রোধ করার জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, তা বড়ই অভিনব। যাবতীয় প্রতারণা ও মধ্যসত্তভোগী লেনদেন ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে। শোষণের যাবতীয় পথ রোধ করার জন্য ইসলাম সর্বপ্রকার সুদী লেনদেন হারাম করেছে। উলামায়ে দেওবন্দ ইসলামের এ শাশ্বত বিধান সমাজের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করে যাচ্ছেন। নিজেরা যেমনি যাবতীয় সুদী লেনদেন থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেন, সমাজকেও বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা দেন। এভাবে উলামায়ে দেওবন্দ সুষ্ঠু অর্থনীতির বিকাশের পথে সকল অন্তরায়কে দূরীভূত করে একটি সুষ্ঠু অর্থনীতি বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে তুলছেন।

তা ছাড়া উলামায়ে দেওবন্দ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি করে এতিমখানা খুলে সমাজের অগণিত এতিম, অসহায় ও দুস্থ মানুষকে থাকা-খাওয়া এবং সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। কোনোরূপ সরকারী সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই সমাজের অগণিত অসহায় মানুষ আদর্শ মানুষ হিসেবে পুনর্বাসনের যে খেদমত তারা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তা সত্যিই তুলনাহীন। সমাজের মানুষ থেকে যৎসামান্য অনুদান নিয়ে উলামায়ে দেওবন্দ যে বৃহৎ খেদমত আঞ্জাম দিতে পারছেন, এটা তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছতা ও মিতাচারিতার দৃষ্টিভঙ্গি ও আমানতদারীর কারণেই সম্ভব হচ্ছে।

উপসংহার : উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপক অবদানের ফলে সমাজের বড় একটি অংশ সততার জীবন যাপন করতে সক্ষম হচ্ছে। গোটা সমাজ যদি তাঁদের নির্দেশিত পথে চলত, সামাজিক সুখ-সমৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেত এবং অচিরেই একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক অকাঠামো বিশিষ্ট সমাজ গঠন সম্ভব হয়ে উঠত।

প্রশ্ন : ৬০ : দাওয়াত ও তাবলীগ তথা ইসলাম প্রচার ও প্রসারে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের উপর আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। কেয়ামত পর্যন্ত তাই টিকে থাকবে। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের বিকল্প নেই। দাওয়াতের বিপুল গুরুত্ব ও ফযীলতের কারণে রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগ থেকেই এ মহৎকর্ম আঞ্জাম দিয়ে আসছেন সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে উলামায়ে কিরাম। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আগ্রাসনের ফলে উপমহাদেশে প্রায় দু'শ

বছর সুপরিকল্পিত দাওয়াতী মেহনত ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে উলামায়ে দেওবন্দ একটি সুচিন্তিত ও সার্বজনীন দাওয়াতী পক্রিয়া প্রবর্তন করেন। একান্তই ইখলাসের ভিত্তিতে সূচনা হওয়ার ফলে তা এখন বিশ্ববাসীর সামনে সার্বজনীনতা লাভ করেছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে উলামায়ে দেওবন্দের বহুমুখী কর্মতৎপরতার কয়েকটি দিক নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

(ক) সহীহ তা'লীম ও তরবিয়তের (শিক্ষা-দীক্ষার) ব্যবস্থা। (খ) ওয়াজ-নসীহত ও ধর্মীয় সভার আয়োজন। (গ) ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ। (ঘ) দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার। (ঙ) পীর-মুরীদী ও খানকাহ স্থাপনের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার।

ক. সহীহ তা'লীম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা

দ্বীনের প্রসারের জন্য উলামায়ে দেওবন্দের সর্ববৃহৎ অবদান হল, বিশ্বব্যাপী দ্বীনী শিক্ষা সম্প্রসারণের আন্দোলন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যে অবদান রেখে যাচ্ছেন, তা বিস্ময়করই বটে। সংক্ষেপে তাদের কর্মতৎপরতাগুলো এরূপ:

১. ভারতবর্ষের সর্বত্র এমনকি উপমহাদেশের বাইরেও তারা উচ্চ পর্যায়ের বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যেখান থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার আলেমে দ্বীন শিক্ষা সমাপন করে দ্বীনের খেদমতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে।

২. কুরআনে কারীমের হিফযের জন্য তারা অগণিত হিফযখানা স্থাপন করেছেন। যেখান থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র হাফেযে কুরআন হয়ে দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করছে।

৩. কুরআনে কারীমের বিশুদ্ধ ও সুললিত তিলাওয়াত শিক্ষার জন্য বহু কিরাতিয়া মাদরাসা তাঁরা স্থাপন করেছেন।

৪. দেশের প্রতিটি গ্রামে, মহল্লায় ও মসজিদে তারা অসংখ্য মক্তব গড়ে তুলেছেন। যেখানে শিশুদেরকে দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বুনিয়াদী বিষয়ের শিক্ষা দান করা হয়। ফলে শিশুকাল থেকেই দেশের নাগরিকদেরকে যতটুকু সম্ভব ইসলামমুখী করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে।

৫. শিক্ষার মান অক্ষুণ্ন রাখতে এবং উত্তরোত্তর তার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে তাঁরা শিক্ষাবোর্ড গঠন করেছেন।

৬. আহরিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর নিজের জীবনে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে তা'লীমের সাথে সাথে তরবিয়তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ।

এভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে উলামায়ে দেওবন্দ দ্বীন প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

খ. ওয়াজ-নসীহত ও ধর্মীয় সভার আয়োজন

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলের যে ব্যবস্থা তারা করে যাচ্ছেন, তাতেও দ্বীন প্রচার ও প্রসারের বিরাট কাজ হচ্ছে। বহু মানুষ এতে হেদায়েত লাভ করছে; দ্বীনী অনুপ্রেরণা পেয়ে ধন্য হচ্ছে ধন্য।

গ. ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ

মাতৃভাষাসহ বহু ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দ বহু গ্রন্থ সংকলন ও রচনা করছেন। দ্বীনের এমন কোনো দিক নেই, যে বিষয়ে তাদের রচিত গ্রন্থ বিদ্যমান নেই। বর্তমানে উপমহাদেশের নিজস্ব ভাষাসমূহে ইসলামী ভাবধারায় রচিত গ্রন্থাবলীর এতটাই সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যে, অন্য ভাষার সহযোগিতা না নিয়েও এ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। তাঁদের রচিত বই-পুস্তক এখন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া এসব দেশে প্রচলিত মাতৃভাষায় অসংখ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলো মানুষের হেদায়েত ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ. দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার

দাওয়াত ও তাবলীগের যে মেহনত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলছে, তা উলামায়ে দেওবন্দের একক প্রচেষ্টার ফসল। হযরত ইলিয়াস রহ. প্রবর্তিত এ সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছার একটি চমৎকার পথ বেরিয়ে এসেছে। ফলে লাখ লাখ মুসলমান ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং নিজেদের ব্যক্তিজীবনকে ইসলামী আদর্শের আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে অসংখ্য অমুসলিম নারী-পুরুষ। এভাবে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

ঙ. পীর-মুরীদীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার

পীর-মুরীদীর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার এবং মানুষের আত্মশুদ্ধির কারণে ও উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম। এ পন্থায় তাঁরা যে কেবল মানুষের হেদায়েতের কাজ করছেন, তাই নয় বরং পীরবেশী অসংখ্য ভণ্ড-প্রতারকদের খপ্পর থেকে মানুষকে রক্ষা করে বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও তাঁরা অনন্য ভূমিকা পালন করছেন।

উপসংহার : উলামায়ে দেওবন্দ দ্বীনের বিশুদ্ধ ধারাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে এবং বদদ্বীনের যাবতীয় পথ বন্ধের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। দ্বীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পন্থায়ই তাঁরা তাঁদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অন্যান্য খেদমতকে কবুল করুন এবং তাদের কর্মতৎপরতাকে আরো বেগবান করুন।

প্রশ্ন : ৬১ : বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের বর্ণনা দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এক চিরন্তন বিষয়। আদম আ. ও শয়তানের সংঘাত থেকে শুরু করে প্রতিযুগেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। এমন কিছু ফিতনা কালে কালে ভারতের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, যদ্দরুন ইসলাম হয়তো চিরতরে উপমহাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত কিংবা ইসলাম তার স্বকীয় রূপ হারিয়ে নতুন কোনো ভ্রান্ত রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছুত। বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতার ইতিহাস অতি দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তাঁদের প্রতিহতকৃত ফিতনাগুলো হল:

(ক) শী'আদের ফিতনা। (খ) খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা। (গ) হিন্দু আর্য সমাজীদের ফিতনা। (ঘ) ইনকারে হাদীসের ফিতনা। (ঙ) কাদিয়ানী ফিতনা। (চ) বিদ'আতী ফিতনা। (ছ) প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে প্রভাবিতদের বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফিতনা।

নিম্নে এ সকল বাতিল ফিতনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের গৃহিত কর্মসূচির উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হল।

ক. শী'আদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ

শী'আদের উদ্ভব হয় হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফত আমলের শেষ দিকে। ইহুদি বংশোদ্ভূত মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে। শী'আদের ভ্রান্ত আকীদার মধ্যে কয়েকটি হল:

(১) আকীদায়ে ইমামত ও ইছনা আশারিয়্যাহ। (২) আকীদায়ে তাহরীফে কুরআন। (৩) আকীদায়ে রুজ'আত। (৪) আকীদায়ে ইরতিদাদে শাইখাইন।

বিচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষে শী'আদের অনুপ্রবেশ পূর্ব থেকে ঘটলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের শাসনামলে। তারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ

ব্যাপকভিত্তিক প্রচার-প্রসারের সুযোগ পায়। উলামায়ে দেওবন্দ শী'আদের ফিতনা প্রতিরোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. শী'আদের স্বরূপ উন্মোচন করে 'ইযালাতুল খফা" ও "কুররাতুল আইনাইন" নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. শী'আদের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করে "তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতবী রহ. রচনা করেন "হাদিয়াতুশ শী'আ" নামক গ্রন্থ। হযরত গঙ্গুহী রহ. শী'আদের স্বরূপ তুলে ধরে রচনা করেন, "হিদায়েতুশ শী'আ" নামক গ্রন্থ।

শী'আদের তৎপরতা রোধ করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ বহু সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তন্মধ্যে হযরত মাদানী রহ., মাওলানা হাবীবুর রহমান রহ. ও মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা "মজলিসে তাহাফফুজে নামূসে সাহাবা" নামক সংগঠনটি অন্যতম।

এভাবে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা শী'আদের তৎপরতা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শী'আদের বিভ্রান্তিকর ধর্মবিশ্বাস থেকে উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেন।

খ. খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা ও তার প্রতিরোধ

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়ারা ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে একদিকে যেমন তারা রাজ্য সম্প্রসারণের অপচেষ্টায় মেতে উঠে, তেমনি এ দেশের মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরও তারা জঘন্য হামলা শুরু করে। এ দেশের মানুষকে খ্রিষ্টবাদের অনুসারী বানানোর জন্য তারা নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করে।

(১) এ দেশের সম্পদ শোষণ করে নিয়ে জনগণকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার পর দরিদ্র জনগণকে অর্থনৈতিক প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। (২) খ্রিষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। (৩) তাদের অধীনে চাকরিরত কর্মচারীদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে।

বিভিন্নভাবে ইংরেজরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করলে উলামায়ে দেওবন্দ তাদের মুকাবেলায় অবতীর্ণ হন। তাদের সাথে বিভিন্ন স্থানে তর্কযুদ্ধ ও বিতর্ক অনুষ্ঠান করেন; তাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন তাদেরকে। পাশাপাশি গণসচেতনতা সৃষ্টি করেন। রচনা করেন বহু গ্রন্থ। তন্মধ্যে হযরত কাসেম

নানুতবী রহ. রচিত "হুজ্জাতুল ইসলাম", মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী রহ. রচিত 'তাকাবুলে সালাসাহ", "ইসলাম আওর ঈসাইয়্যাত", "তাওহীদ ওয়াত তাসলীস" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা শরফুল হক রহ. এ বিষয়ে প্রায় ১০টি গ্রন্থ রচনা করেন। মাওলানা আবুল মানসূর দেহলবী রহ.-ও এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে উলামায়ে দেওবন্দের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁদের অক্লান্ত মেহনত ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই খ্রিষ্টান পোপ-পাদ্রীদের আক্রমণ থেকে ইসলামের চিরন্তন আকীদাহ বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে এবং রক্ষা পায় এ দেশের মুসলিম উম্মাহ এর ঈমান আকীদা।

গ. হিন্দু আর্য সমাজীদের ফিতনা

১৮৭২ সালে স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করে আক্রমণাত্মক ভাষায় "স্বতীর্থ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে এবং উগ্র হিন্দুবাদী সংগঠন "আর্য সমাজ" প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অনেকেই হিন্দু ধর্মে দিক্ষিত হতে শুরু করে। ইতিহাসে হিন্দুদের এ আন্দোলনকে "শুদ্ধি আন্দোলন" নামে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯২৩ সালে এ ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

উলামায়ে দেওবন্দ এ ফিতনার প্রতিরোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হযরত কাসেম নানুতবী রহ. তাদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। উক্ত বিতর্কে স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও স্বামী লালানন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। হযরত কাসেম নানুতবী রহ. মুসলমানদের আকীদার উপর আরোপিত বিভিন্ন অভিযোগের মুকাবেলায় "জবাবে তুর্কী ব-তুর্কী" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন।

উলামায়ে দেওবন্দের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এ ফিতনা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা তাদের ঈমান-আকীদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

ঘ. ইনকারে হাদীসের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ

হাদীসকে শরী'অতের প্রামাণ্য ভিত্তি হিসেবে স্বীকার না করার নাম হল ইনকারে হাদীস। انكار حديث। মূলত انكار حجية حديث। এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ইনকারে হাদীসের ফিতনার সূচনা মূলত খারেজী সম্প্রদায় দ্বারা হয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলভী চেরাগ আলী, আহমদুল্লাহ চক্রালভী, আসলাম জয়লাসপুরী ও গোলাম আহমদ পারভেজ প্রমুখ ভারতে এ ফিতনার জন্ম দেয়। তাদের বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি পাঁচটি মৌলিক দাবি বের হয়ে আসে। যথা–

(১) রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন কুরআনের মুবাল্লিগ তথা বার্তাবাহক মাত্র। তাই তাঁর আনীত কুরআন অবশ্য অনুসরণীয় বটে। তবে বার্তাবাহক হিসেবে তার নিজের কথার কোনো গুরুত্ব নেই। কাজেই তা আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়।

(২) রাসূলুল্লাহ সা.-এর কথা অনুসরণের অপরিহার্যতা তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত সময়ের জন্য সীমিত ছিল। কেননা তিনি ছিলেন সেই সময়ের শাসনক্ষমতার মালিক। সাহাবীদের জন্য তা অবশ্য পালনীয় ছিল বটে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর উম্মতের জন্য তা পালনীয় নয়।

(৩) যেহেতু কুরআন পৌঁছে দেওয়া তথা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তা উম্মতের নিকট পৌঁছে দেওয়া নবীর দায়িত্ব ছিল, তাই কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কীয় তার সকল কথা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় বটে। কিন্তু অন্যান্য হাদীসগুলো উম্মতের অনুসরণীয় নয়।

(৪) হাদীস অবশ্য অনুসরণীয় ছিল; কিন্তু যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় নি বলে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে এগুলো অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।

(৫) হাদীস যুক্তিগ্রাহ্য হলে অনুসরণীয়, যুক্তিগ্রাহ্য না হলে অনুসরণীয় নয়।

এ ফিতনার মুকাবেলার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ হাদীসের গুরুত্ব ও তার প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি কুরআন-সুন্নার আলোকে সমাজের সামনে বিভিন্ন পন্থায় তুলে ধরেন এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে সমাজকে তাদের বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেন।

তা ছাড়া হাদীসের দরসদান কালে উলামায়ে দেওবন্দ এ বিষয়ে প্রমাণসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তাঁরা এ বিষয়ে বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে মুফতী ওয়ালী হাসান রহ. রচিত "ফেতনায়ে ইনকারে হাদীস" অন্যতম। এভাবে ইনকারে হাদীসের এ হীন তৎপরতা সচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং শরী'অতের প্রথমিক ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের দ্বিধা-সংশয় কেটে যায়।

৬. কাদিয়ানী ফিতনা ও তার প্রতিরোধ

ইংরেজদের পরোক্ষ মদদে এ দেশের ধর্মীয় অঙ্গনে যেসব ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, কাদিয়ানী ফিতনা হল তার মাঝে অন্যতম। এ ফিতনার জনক গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১২৫২ হিজরী মুতাবেক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে আর ১৯০৯ সালে তার অপমৃত্যু ঘটে। পূর্ব থেকেই তার পরিবার ইংরেজদের তল্পিবহনের জন্য খ্যাত

ছিল। গোলাম আহমদ লেখাপড়া শেষ করে এক অফিসে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করে। পারিবারিক তাঁবেদারীর সূত্রে ইংরেজরা গোলাম আহমদকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা দিয়ে তাকে তাদের তাঁবেদারীতে নিয়োগ করে। সে পর্যায়ক্রমে নিজেকে সংস্কারক, ইমাম মাহদী, প্রতিশ্রুত মাসীহ, জিল্লী নবী বা ছায়া নবী বলে দাবি করে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আত্মপ্রকাশের পর তার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সর্বপ্রথম লুধিয়ানার আলেম-উলামাদের দৃষ্টি পড়ে। তাঁরা তার লেখা বই-পুস্তক ও বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করে ১৮৮৯ সালে তাকে কাফের বলে ফাতওয়া প্রদান করেন। উলামায়ে দেওবন্দ তাকে প্রথম দিকে বদদ্বীন আখ্যায়িত করেন। এরপর ১৩৩১ হিজরীতে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এবং তাঁর শিষ্য আল্লামা কাশ্মিরী রহ. সহ অন্যান্য আলেমগণ তাকে দ্বীনের গণ্ডি বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গভীর অনুসন্ধানের পর তার ভণ্ডামী সম্পর্কে দেওবন্দের আলেমগণ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হন এবং ১৩৩৬ হিজরীতে দারুল উলূমের ইফতা বিভাগ থেকে তাকে কাফির ফাতওয়া প্রদান করা হয়। শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহ.-কে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের আমীর নিযুক্ত করে তাদের বিভ্রান্তিমূলক কাজ প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

চ. বিদ'আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিকার

তাবেঈগণের যুগে ইসলাম যখন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভারতেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতের সাথে সাথে ইলমে নববী তথা ইসলামী শরী'অতের যথাযথ জ্ঞানের সম্প্রসারণ না ঘটার কারণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও দ্বীনের প্রকৃতরূপ সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করতে পারে নি। তাই মুসলিম সমাজ পূর্ব রুসম-রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। মাযারে আসা-যাওয়া, ওরশে অংশগ্রহণ, মাযারে সিজদা করা, মাযারে মান্নত করা, নজর-নেওয়াজ পেশ করা, কাওয়ালী ও শ্যামা সংগীত গাওয়া এবং এর আয়োজন করাকে ইসলাম বলে মনে করা হত।

মানুষের এ অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর অর্থলিপ্সু মানুষ পীর-বুযুর্গদের মাযার নিয়ে ধর্মব্যবসায় মেতে উঠে এবং ধর্মের নাম ভাঙিয়ে মানুষের ঈমান-আকীদা ও অর্থ-সম্পদ লুট করতে শুরু করে। এরাই মূলত বিদ'আত ও কুসংস্কারকে লালন করে এবং নতুন পন্থায় মানুষের পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কুসংস্কারের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে ইংরেজ মদদপুষ্ট আহমদ রেজা খান ছিল অন্যতম।

বিদ'আতের মৌলিক কারণ হল অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থপরতা। অজ্ঞতা নিরসন হলে বিদ'আত এমনিতেই নির্মূল হয়ে যায়। এ কারণে উলামায়ে দেওবন্দ দ্বীনকে ইলমীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দ্বীনী শিক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য স্থানে স্থানে দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এ সকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সাথে সাধারণ মানুষকে ব্যাপক হারে সংশ্লিষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে করে সাধারণ জনগণের মাঝে দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে আলেম উলামার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের সংস্পর্শে এসে সমাজ বিশুদ্ধ চেতনা লাভ করে। এভাবে অতি সহজেই উলামায়ে দেওবন্দ বিদ'আত উচ্ছেদের আন্দোলনকে তরান্বিত করেন। উপমহাদেশে শিরক ও বিদ'আত উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.। এরপর পর্যায়ক্রমে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ., শাহ আবদুল আযীয রহ., হযরত ইসমাইল শহীদ রহ., সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ., হযরত নানুতবী রহ., হযরত গঙ্গুহী রহ., হযরত থানবী রহ., হযরত খলীল আহমদ সাহারানপপুরী রহ. প্রমুখ বিদ'আত বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রসেনানী ছিলেন।

ছ. পাশ্চাত্যের চিন্তা ধারায় প্রভাবিতদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ও তার মুকাবেলা

কুরআনে কারীম হল দুনিয়ার মানুষের জন্য আসমানী দিকনির্দেশনা। এরই নির্দেশিত আদর্শের আলোকে পরিচালিত হবে মানুষের জীবন। এটাই মহান স্রষ্টার কাম্য। কুরআনে কারীমের মর্ম উদ্ধার সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা এ কিতার প্রেরণের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সা.-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে বর্ণনা, ব্যাখ্যা, কর্মে ও অনুমোদনে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সা.-এর সান্নিধ্য লাভ করে দ্বীন সম্পর্কে যে উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, তা ব্যক্ত করে গেছেন তাবেঈগণের সামনে। সাহাবায়ে কিরামের সান্নিধ্যলব্ধ ধর্মীয় উপলব্ধি তাবেঈগণ ব্যক্ত করেছেন তাবে তাবেঈগণের কাছে। এভাবে দ্বীন সাহচর্য ও উপলব্ধির ক্রমধারায় এসে পৌঁছেছে আমাদের পর্যন্ত। এখানে আভিধানিক অর্থগত দিকটির চেয়ে কালক্রমে দ্বীনের যে ব্যাখ্যা ও আদর্শিক রূপ আজ পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেটিই মূল ও প্রকৃত রূপ হিসেবে পরিগণিত হবে।

কিন্তু যুগে যুগে জ্ঞানপাপী প্রবৃত্তির পূজারীরা নিজেদের প্রবৃত্তিজাত চিন্তা-ভাবনাকে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যার নামে চালিয়ে দেওয়ার হীন প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। উম্মতের মাঝে এ ধরনের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম মু'তাযিলা সম্প্রদায়

থেকে প্রকাশ পায়। ভারতীয় উপমহাদেশে এ হেন জঘন্যতা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় স্যার সৈয়দ আহমদ থেকে। সে ছিল মূলত পাশ্চাত্যের জীবনধারা ও আদর্শ তথা ন্যাচরিয়াল বা প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী। সে বিজ্ঞানীদের সূত্রগুলোকে অকাট্য বলে মনে করত। এ কারণে কুরআন-সুন্নাহর সর্বজন স্বীকৃত বহু বিষয় তার কাছে অবৈজ্ঞানিক, অপ্রাকৃতিক ও স্বভাববিরোধী মনে হয়েছে। কাজেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সকল অদৃশ্য বিষয়কেই সে অস্বীকার করেছে। যেমন : জান্নাত, জাহান্নাম, ওয়াহী, ফিরিশতা, জ্বীন, শয়তান, হুর-গিলমান, মিরাজ, মু'জিযা, কেরামত ইত্যাদি। সাথে সাথে কুরআনে কারীমে ব্যবহৃত এসব শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে। তা ছাড়া শূকর-কুকুরকে সে পবিত্র মনে করত এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে অযৌক্তিক মনে করত। এ ক্ষেত্রে তার যুক্তি ছিল একটি –এগুলো প্রকৃতি ও স্বভাবের দাবি। সুতরাং স্বভাবধর্ম ইসলাম তা নিষিদ্ধ করতে পারে না।

দ্বীনকে সকল প্রকার বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে উলামায়ে দেওবন্দ সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে গেছেন। তারা কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের যে কোনো ব্যাখ্যাকে কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহর ভিত্তিতে মেপে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন আক্ল ও নকলের সমন্বয়ের মাধ্যেমে।

দ্বীন সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তৎপরতার কথা জানতে পারলেই তাঁরা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। কোথাও কোনো অসুবিধা পরিদৃষ্ট হলে তা গভীরভাবে পরখ করে দেখেছেন। কারো বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট হলে জনগণকে সে সম্পর্কে সচেতন করেছেন। বিভ্রান্তগুলো চিহ্নিত করে তা নির্মূল করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে দ্বীনের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে, তা-ও তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ওয়াজ-নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে যেমন তারা এ সকল বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছেন, অনুরূপভাবে বই-পুস্তক রচনা করেও তারা এ বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করেছেন।

উপসংহার

উলামায়ে দেওবন্দ যাবতীয় বাতিল, কুসংস্কার ও ভ্রান্তির বেড়াজালকে ছিন্ন করার লক্ষ্যে যুগে যুগে বলিষ্ঠ ও সফল সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের অক্লান্ত মেহনত ও কর্ম তৎপরতার ফলে দ্বীন আজ নিজ স্বকীয়তা ও নির্মলতা বজায় রেখে উপমহাদেশে বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য এক অনুপম আদর্শ।

প্রশ্ন : ৬২ : বাংলাদেশে দেওবন্দের অনুসারী উলামায়ে কিরামের অবদানের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : বাংলাদেশের মুসলিম উম্মার জীবন ধারনের সার্বিক দিক তথা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সুস্থ চিন্তা-ভাবনার বিকাশ, দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে দেওবন্দের অনুসারী বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অনেক অবদান রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার বিবরণ দেওয়া হল।

(১) ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান। (২) ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদান। (৩) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান। (৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান। (৫) ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাদের অবদান। (৬) বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাদের অবদান।

ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান

উলামায়ে দেওবন্দ যে অভিনব শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তার বিকাশ ও লালন এবং প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশী মানুষকে সু-শিক্ষা ও অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে রক্ষা করে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি শিক্ষা দেন এবং শত শত মাদরাসা ও হাজার হাজার মক্তব তৈরি করেন। এটা বাংলাদেশী উলামায়ে দেওবন্দের অবদান।

ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদান

দারুল উলূম দেওবন্দ ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে নবদিগন্তের সূচনা করে, সে ভিত্তিতে বাংলাদেশী মানুষকে গড়ে তোলার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ হাদীস শাস্ত্র অধ্যায়ন ও অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলেন এবং হাদীসের জ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট পৌছানোর জন্য হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন।

অনুরূপভাবে কুরআনের তাফসীর করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি তৈরির জন্য স্বতন্ত্র তাফসীর বিভাগ খোলেন এবং এটার বার্তা সর্বসাধারণের নিকট পৌছানোর জন্য মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখেন এবং ওয়াজ মাহফিল ও পুস্তকাদি রচনার মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট কুরআন হাদীসের বাণী পৌছে যাচ্ছে। যুগসম্মত মুফতী তৈরির জন্য তারা ইফতা

বিভাগ এবং সমকালীন প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধানের জন্য ইফতা বিভাগ খুলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও পুস্তকাদির মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান দেন। বাংলাদেশী উলামায়ে কেরাম দর্শন ও আকাইদ শাস্ত্রে ও অনেক অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাসাওউফের ময়দানেও তারা কাজ করে যাচ্ছেন। পীর-মুরীদি সাধারণ মানুষের মাঝে প্রভাব ফেলায় এ দ্বারা অনেক ফায়দা অর্জিত হচ্ছে। এ কাজকে অগ্রসর করানোর জন্য তারা অনেক বইও লিখেছেন। ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশী উলামায়ে দেওবন্দ পিছিয়ে নেই।

রাজনৈতিক ময়দানে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামের অবদান

(১) ১৯৬৯ সালে নেযামে ইসলামী পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ঢাকায় ও নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরের জোর দাবি জানায়।

(২) ১৯৭০ সালে ইয়াহইয়া খানের সাধারণ নির্বাচনে জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতী মাহমূদ সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইয়াহইয়া ও ভূট্টোর হঠকারিতার কারণে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। স্বাধীনতার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসাসমূহ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে জমিয়তের নেতৃবৃন্দ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

(৩) ইসলামী শিক্ষার বিশুদ্ধ ধারাকে উত্তর উত্তর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে উলামায়ে কিরাম ১৯৮৭ সালে শায়েস্তা খান হলে সকল কওমী মাদরাসার এক সম্মেলনে "বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়্যাহ আর আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ" নামে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন।

(৪) ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল উলামা এক ফ্লাটফর্মে এসে নির্বাচন করেন এবং হাফেজ্জী হুজুর তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

(৫) ধর্মবিরোধী প্রবর্তনের বিরুদ্ধে (যেমন– মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে) গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে ধর্ম নিরোপেক্ষতার নামে এ দেশে যখন ধর্মহীনতার জোরতৎপরতা শুরু হয়, তখন তার বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

অনুরূপভাবে ধর্মদ্রোহীরা যখন ইসলামের উপর আক্রমণ চালায় যেমন– দাউদ হায়দার, সালমান রুশদী, আহমদ শরীফ, তাসলীমা নাসরিনসহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেও গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

(৬) ১৯৯১ সালে শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক-এর নেতৃত্বে বাবরী মসজিদ ভাঙার কারণে লংমার্চ করেন।

বাংলাদেশী উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশী উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম। একটি সুস্থ সমাজের জন্য পূর্বশর্ত হল আদর্শ নাগরিক। আদর্শবান নাগরিক ছাড়া সুস্থ সমাজের কল্পনা করা যায় না। আর আদর্শবান নাগরিক তৈরির জন্য অপরিহার্য হল আদর্শ শিক্ষা। তাই বাংলাদেশী উলামায়ে কিরাম আদর্শ মানুষ গঠনের জন্য আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছেন এবং তাদের মাঝে নৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা বোধ সৃষ্টি করে অনৈতিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অনুরূপভাবে তাদেরকে তা'লীমের সাথে তারবিয়তের শিক্ষা দিচ্ছেন। ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, এর মাধ্যমেই আদর্শ সমাজের বিকাশ সম্ভব।

অর্থনৈতিক অবদান

অর্থ যেমন মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করে তেমনি অর্থ অনর্থও ঘটায়। এমনকি সম্পদের লালসা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে ফেলে। তাই শরী'অত সম্পদের লালসাকে কোনোক্রমেই অনুমোদন করে নি বরং নিরুৎসাহিত করেছে। যেমন বলা হয়েছে, ধন-সম্পদ ফিতনার উপকরণ। দুনিয়া হল মৃত প্রাণীর মতো আর তার অন্ধ অনুসন্ধানকারীরা কুকুরের মতো। তাই সম্পদের লিপ্সা থেকে এভাবে উলামারা ফিরিয়ে রেখেছেন।

অনুরূপভাবে বান্দার হক নষ্ট করলে পরকালীন ক্ষতির কথা তুলে ধরেছেন। বল্গাহীন চাহিদার ফলে মানুষ দুর্নীতি, আত্মসাৎ, কালোবাজারী, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত। উলামায়ে কিরাম ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, ঘুষ ইত্যাদির পরকালীন ক্ষতি তুলে ধরেন। ফলে এ সকল খারাপ কাজ থেকে সংযত থাকছে। অনুরূপভাবে অপব্যয় ও অপচয়ের ক্ষতি তুলে ধরেন এবং শোষণের পথ রুদ্ধ করার জন্য সুদী লেন-দেন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে সরকারী কোনো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া এতিম-অসহায় ও দুস্থদের অবৈতনিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা ও খাওয়া, পরা, থাকার ব্যবস্থা করে বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। এগুলো আলিম সমাজের বিরাট অর্থনৈতিক অবদান।

ইসলাম প্রচার-প্রসারে তাদের অবদান

মাদরাসা-মক্তব তৈরি, ওয়াজ-নসীহত, পত্র-পত্রিকা রচনা, সংকলন ও পুস্তকাদি রচনার মাধ্যমে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে, পীর-মুরিদীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাদের অবদান

বাংলাদেশী উলামায়ে দেওবন্দ খ্রিষ্টান মিশনারী, কাদিয়ানী, বাহায়ী, শী'আ, মওদুদী, ইনকারে হাদীস, আহলে হাদীস (গায়রে মুকাল্লিদ), বিদ'আত কুসংস্কার ও পাশ্চাত্যের ধারায় প্রবাহিত বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলো মুকাবেলা করে দ্বীন ইসলামের সঠিক বিধান রক্ষায় বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছেন।

উপসংহার : সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরাম যে অবদান রেখে যাচ্ছেন, তা ইতিহাসে চির ভাস্বর এবং পরবর্তীদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : ৬৩ : শী'আ কারা? শী'আ ফিতনা মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের বর্ণনা দাও।

উত্তর : শী'আদের পরিচয়

হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতের শেষ দিকে ইহুদি বংশোদ্ভূত ষড়যন্ত্রের নায়ক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বে একদল লোক মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ঐক্যকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে হযরত উসমানের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তোলে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর চাচাত ভাই ও জামাতা হযরত আলী রাযি.-ই খেলাফতের বেশি হকদার –এ দাবি উত্থাপন করে এবং রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়।

তারা হযরত আলী রাযি-কে হযরত মু'আবিয়াহ রাযি.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষ সমর্থন করত হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর বিরোধিতা ও কুৎসা বর্ণনায় অতি বাড়াবাড়ি শুরু করে এবং নিজেদেরকে "শিয়ানে আলী" বা আলীর দল বলে পরিচয় দিতে থাকে। এ দল রাসূলুল্লাহ সা.-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি অতিভক্তি জাহির করতে গিয়ে যেসব সাহাবী ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে হযরত আলী রাযি.-এর মতবিরোধ ছিল, তাদেরকে কাফির ও মুরতাদ বলে সর্বসাধারণের সামনে প্রচার-প্রচারণা চালাত। হযরত আলী রাযি. তাদের এ বাড়াবাড়িকে মোটেই প্রশ্রয় দেন নি বরং তাদেরকে এ হেন আচরণের জন্য কঠোর ভর্ৎসনা করেন। ফলে তারা আফ্রিকার কিছু অঞ্চল নিয়ে "খেলাফতে বনী ফাতেমী" নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। এদের বহু দল-উপদল রয়েছে। কারো কারো মতে এদের উপদলের সংখ্যা ২২টি। আবার কারো কারো মতে ৩২টি। ইতিহাসে এরাই শী'আ নামে প্রসিদ্ধ।

শী'আদের বিভ্রান্তিকর আকীদাসমূহ

(১) আকীদায়ে ইমামতে ইছনা আশারিয়্যাহ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের অপরিহার্য তাগিদে নবুওয়ত রিসালাতের ধারাকে চালু করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. হলেন এ ধারার সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর অন্য কোনো নবী বা রাসূলের প্রয়োজনীয়তা নেই। আর রাসূলগণ হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। অন্য কোনো মানুষ যত বড় আল্লাহওয়ালা হোক না কেন, তিনি নবীগণের সমকক্ষ হতে পারবেন না। এটাই হল আহলে হকের আকীদা-বিশ্বাস। কিন্তু শী'আ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওফাতের পর উম্মতের পথপ্রদর্শনের জন্য ইমামতের সিলসিলা জারি করে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বারজন ইমাম নির্ধারণ করেছেন। দ্বাদশতম ইমামের পরে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

এ বারজন ইমাম নবীগণের মতই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত, হুজ্জত, নিষ্পাপ ও আনুগত্যশীল। তারা মর্যাদায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সমান এবং অন্যান্য নবীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও ঊর্ধ্বে। নবীগণের নবুয়তের মতো এ ইমামগণের ইমামত স্বীকার করা নাজাতের জন্য পূর্বশর্ত। এ সকল ইমামগণ মুজেযাসম্পন্ন এবং আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। নবীগণের মতই তাদের কাছে ফিরিশতা আসা-যাওয়া করে। তাদের মেরাজ হয়। তারা অতীত-ভবিষ্যত ও নিজের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে অবগত। যে কোনো বস্তু হালাল বা হারাম করার অধিকার তাদের রয়েছে। তাদের মৃত্যু স্বয়ং তাদের ক্ষমতাধীন।

(২) আকীদায়ে তাহরীফে কুরআন

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার আসমানী কিতাব। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণকারী বলে নিজেই ঘোষণা প্রদান করেছেন। নাযিল হওয়ার পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কুরআন মাজীদ অবিকৃত অবস্থায় অক্ষুণ্ন থাকবে। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা কারো নেই। যুগ যুগ ধরে আহলে হক অন্তরে এ আকীদাই পোষণ করে আসছে।

কিন্তু শী'আদের আকীদা হল, বর্তমানে বিদ্যমান কুরআন সেই অবিকৃত কুরআন নয়, যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল বরং এতে যথেষ্ট পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পর যারা জোর করে খেলাফত ও হুকুমত দখল করে নেয়, তারা কুরআন থেকে ওইসব শব্দ বা বাক্য ছাটাই করে ফেলেছে, যেগুলোতে হযরত আলী রাযি. ও পরবর্তী ইমামগণের ইমামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল। এমনকি সেখানে ইমামদের নাম পর্যন্ত বর্ণিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন, যা হযরত আলী রাযি. লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা দ্বাদশ ইমামের নিকট রয়েছে। তিনি প্রায় ১১৫০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে চার/পাঁচ বছর বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে কোনো গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামতের পূর্বে কোনো এক-সময়ে সেই অবিকৃত কুরআন নিয়ে তিনি জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

(৩) আকীদায়ে রুজ‘আত

রুজ‘আতের আকীদা শী‘আদের অন্যতম একটি আকীদা। এর অর্থ হল, তাদের দ্বাদশতম ইমাম যখন গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন রাসূলুল্লাহ সা. আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি., হযরত ফাতেমা রাযি., হযরত হাসান রাযি., হযরত হুসাইন রাযি. এবং অন্যান্য ইমামগণ জীবিত হয়ে কবর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবেন এবং এদের মধ্যে সর্বপ্রথমম রাসূলুল্লাহ সা. এবং আলী রাযি. ও অন্যান্যরা সেই ইমামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তাদের সাথে সাথে আবু বকর, উমর, উসমান এবং অন্যান্য কাফির মুনাফিকরাও উত্থিত হবে। তারপর উক্ত ইমাম তাদের সবাইকে শাস্তি দিবেন। তাদের মতে রুজ‘আতের আকীদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব।

(৪) আকীদায়ে ইরতেদাদে শাইখাইন

আহলে হক উলামায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরেই বিশ্বাস করে আসছেন, সকল সাহাবায়ে কিরামই সত্যের উপর পূর্বাপর সব সময় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই সত্যের মাপকাঠি ও অনুসরণযোগ্য। কিন্তু শী‘আদের আকীদা হল, তিন-চারজন সাহাবী ছাড়া বাকী সকল সাহাবীই রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (নাঊযুবিল্লাহ)। বিশেষ করে শাইখাইন তথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও হযরত উমর রাযি.।

উভয়েই হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সা. মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলী রাযি.-কে খলীফা নিযুক্ত করে শাইখাইনকে হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতের বাইয়াত নিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওফাতের পর তারা অন্যায়ভাবে ও প্রহসনমূলক ক্ষমতা দখল করে নেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তাঁরা মুরতাদ হয়ে গেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। এ ব্যাপারে তারা কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকে :

ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا

لم يكن الله ليغفر لهم

শী'আদের কিতাব "উসূলে কাফী"-তে আছে, ইমাম জাফর সাদেক এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন : এ আয়াতটি হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. ও হযরত উসমান রাযি. সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তিনজনই শুরুতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এরপর তাদের সামনে হযরত আলী রাযি.-এর ইমামত পেশ করা হলে তারা তা অস্বীকার করে কাফির হয়ে যান। তারপর রাসূলুল্লাহ সা.-এর কথায় আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযি.-এর বাইয়াত কবুল করে পুনরায় ঈমান আনে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওফাতের পর তারা পুনরায় হরত আলী রাযি.-এর ইমামত অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায় এবং তাদের কুফরী আরো বাড়তে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। এগুলো হল শী'আদের মূল আকীদা, যার কারণে আহলে হক উলামায়ে কিরাম তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

ভারতবর্ষে শী'আদের প্রভাব

ভারতবষে শী'আদের অনুপ্রবেশ বহু পূর্বে ঘটলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্বকালে। শের শাহের সাথে ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন ইরান গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পারস্যের শী'আ সম্রাট নিম্নোক্ত শর্তে তাকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়।

(ক) হুমায়ূনকে শী'আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

(খ) ভারতে শী'আ মতবাদ প্রচারের সুযোগ করে দিতে হবে।

(গ) কান্দাহার অঞ্চল তাকে দিয়ে দিতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুমায়ূন শর্তগুলো মেনে নিয়ে সম্রাট তাহামানের সহযোগিতায় তার হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শী'আরা হুমায়ূনের দরবারে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তারা উপমহাদেশে শী'আ মতবাদ প্রচারের সুযোগ লাভ করে এবং বহু লোককে এ মতাদর্শে দীক্ষিত করে ফেলে। মীর জাফর, মীর সাদেক, সূজা-উদ্দৌলা, নযফ খান প্রমুখ উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ দুর্ভাগ্যক্রমে শী'আ মতাবলম্বী ছিল। যারা ইংরেজদের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। এ ছাড়া অভিনব কায়দায় প্রচারণা চালিয়ে তারা ইসলাম সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস ও অনাচার সমাজে চালু করে। এমনকি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তাদের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শী'আদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতা

শী'আদের প্রতিরোধে এ দেশের উলামায়ে হক সর্বদাই তাঁদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। তবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর যুগ থেকে শী'আদের জোরদার মোকাবেলা শুরু হয়।

উলামায়ে হক শী'আদের বিভ্রান্তি প্রতিরোধে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের সঠিক আকীদা ও শী'আদের বিভ্রান্তিকর আকীদা ও আচার-অনুষ্ঠান সমাজের সামনে তুলে ধরেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল :

১. ইযালাতুল খফা -শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.
২. কুররাতুল আইনাইন -শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.
৩. তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ -শাহ আবদুল আযীয রহ.
৪. আয়াতে বাইয়েনাত -জনাব মুহসিনুল মুলুক রহ.
৫. হাদিয়াতুশ শী'আ -মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.
৬. হিদায়াতুশ শী'আ -মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.
৭. শীয়াইয়্যাত কিয়া হায় -মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.
৮. ইরানী ইনকিলাব আওর ইমাম খমেনী -মাওঃ মনজুর নোমানী রহ.

তা ছাড়া উলামায়ে হক শী'আদের অপতৎপরতা রোধকল্পে বহু সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালে লক্ষ্ণৌতে ইংরেজ সরকারের স্থানীয় প্রশাসন শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় কোনো সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তখন উলামায়ে দেওবন্দ হযরত মাদানী রহ., মাওলানা হাবীবুর রহমান রহ. ও মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মাওলানা আবদুছ ছবুর রহ.-এর নেতৃত্বে "মজলিশে তাহাফ্‌ফুজে নামূসে সাহাবা" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এভাবে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা শী'আদের অপতৎপরতা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শী'আদের বিভ্রান্তিকর ধর্ম-বিশ্বাস থেকে উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেন।

উপসংহার

এখন পর্যন্ত শী'আদের কিছু কিছু রুসম-রেওয়াজ উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার "হোসেনী দালান" নামে একটি কেন্দ্র রয়েছে। আশুরা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিনে সেখানে তারা শী'আ মতাদর্শ

অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ইরানে খোমেনী বিপ্লব সফল হওয়ার পর ইরানী দূতাবাসের উদ্যোগে এ দেশে শী'আ মতাদর্শের প্রচার-প্রসারের জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। উলামায়ে দেওবন্দ এ ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক করে যাচ্ছেন। তবে তাঁদেরকে এ ব্যাপারে আরো কঠোর ও বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন : ৬৪ : খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর :

ভারত উপমহাদশে সর্বপ্রথম বৃটেন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি খ্রিষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে একদিকে যেমন তারা রাজ্য সম্প্রসারণের অপচেষ্টায় মেতে উঠে, তেমনি এদেশের মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরও তারা জঘন্য হামলা শুরু করে। বিজাতির উপর স্বভাবজাত ঘৃণার কারণে এ দেশের মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা তাদেরকে সুনজরে দেখত না। এ দেশের মানুষকে ধর্ম ও কৃষ্টি-কালচারের দিক থেকে খ্রিষ্টবাদের অনুসারী বানাতে পারলে অনেকাংশেই সেই বিদ্বেষ হ্রাস পাবে এবং তাদের ক্ষমতা সুসংহত হবে –এ লক্ষ্যে তারা এ খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা চালায়। এ উদ্দেশ্যে তারা নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১। এ দেশের সম্পদ শোষণ করে জনগণকে সহায় সম্বলহীন করে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে অধিক প্রলোভন দেখিয়ে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে প্রকারান্তরে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়।

২। খ্রিষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, শিক্ষার্থিদেরকে একাডেমিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে খ্রিষ্টবাদের প্রতি অনুরক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা মিশনারী স্কুল, মিশনারী হাসপাতাল, বাইবেল সোসাইটি ইত্যাদি তৎপরতা শুরু করে।

৩। ১৮৩৭ সালে সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা এ সুযোগে বহু অসহায় দরিদ্র মানুষকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালায়। তা ছাড়া চাকরি-বাকরি ও বিভিন্ন ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে তারা দরিদ্র মানুষকে আকৃষ্ট করত। আর এসব সুযোগ-সুবিধার জন্য যে ইন্টারভিউ নেওয়া হত, তাতে প্রশ্নাবলির উত্তরগুলো যারা খ্রিষ্টধর্মের অনুকূলে প্রদান করত, তাদেরকেই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হত।

৪। সরকারী কর্মচারীদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হত। ১৮৫৫সালে পাদ্রী এ. এডম্যান কলকাতার অফিস থেকে সরকারের অধীনস্থ সকল কর্মচারীদের প্রতি ফরমান জারী করেন : আমাদের সরকারের ইচ্ছা হচ্ছে, ভারতবর্ষ যেভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, সেভাবে দেশের নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা দূরীভূত করে সকলকেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী বানিয়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একটি বৃহৎ ঐক্য গড়ে তোলা। সুতরাং এ ব্যাপারে সকল কর্মচারীকে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য জোর তৎপরতা চালাতে হবে।

অবস্থার এ বিবরণ থেকে মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য কি বলিষ্ঠ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ে ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

খ্রিষ্টান মিশনারী ফিতনা মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের কৌশল

এ ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দ নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করেন।

ক. মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা

উলামায়ে দেওবন্দ মুসলমানদের ঈমানী চেতনা সংরক্ষণ এবং তাদের বিশুদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে উপমহাদেশের সর্বত্র দ্বীনী মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।

খ. ধর্মীয় পুস্তক পুস্তিকা রচনা

খ্রিষ্টান পাদ্রীরা নিজ ধর্মের সমর্থনে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুৎসা রটনা করে অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করে বিনামূল্যে বিতরণ করে। তাদের মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দ অসংখ্য মূল্যবান বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা খ্রিষ্টান পাদ্রীদের উত্থাপিত ভিত্তিহীন আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন। হযরত হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী রহ.-এর রচিত "ইযহারে হক" নামক গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া হুজ্জাতুল ইসলাম, তাকাবুলে সালাসা, ইসলাম আওর ঈসাইয়্যাত ইত্যাদি গ্রন্থ এ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়।

গ. বিতর্ক অনুষ্ঠান

ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারীদের নানা আপত্তি ও মিথ্যা প্রচারণার উপযুক্ত জবাব দিতে হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. বিভিন্ন সময়ে বিতর্কে

অংশগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে শাহজাহান পুর, চাঁদপুরে ভণ্ড 'পিয়ার-লাল' এর উদ্যোগে "মাওলায়ে খোদা সেনাসী" শিরোনামে এক বিতর্ক সভার আয়েজন কারা হয়। হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ফলে বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণকারী হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মের পণ্ডিতরা তাঁর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। হযরত নানুতুবী রহ. স্বয়ং বিতর্ক করার পাশাপাশি নিজ শাগরেদগণকেও পাদ্রীদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার পরামর্শ প্রদান করতেন।

হযরত গঙ্গুহী রহ. এর বিশিষ্ট শিষ্য হযরত মাওলানা শরফুল হক রহ. ছিলেন পাদ্রীদের জন্য রিতিমত মহা আতঙ্ক। তিনি তাদের মুকাবেলা করার জন্য হিব্রু ভাষা রপ্ত করেন এবং খ্রিষ্টবাদের উপর ব্যাপক পড়াশোনা করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি মুনাযারা করতেন।

তা ছাড়া মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ রহ., মাওলানা মনসুর রহ., মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসারী রহ., মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী রহ. এবং মাওলানা হিফজুর রহমান রহ. প্রমুখ দেওবন্দী আলেমগণ খ্রিষ্টবাদ ও পাদ্রীদের মুকাবেলায় জীবন কুরবান করে দিয়েছেন। তাঁদের অব্যাহত তৎপরতার ফলেই সারা দেশে মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং ইংরেজবিরোধী তৎপরতা চরম আকার ধারণ করে।

উপসংহার : উলামায়ে দেওবন্দের অক্লান্ত মেহনত ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই খ্রিষ্টান পাদ্রীদের নগ্ন হামলা থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের চিরন্তন আকীদা-বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রয়েছে। তবে বর্তমানে আবার নতুন করে মিশনারী ফিতনা বিশেষভাবে বাংলাদেশে বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে উলামায়ে হককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এগুলোর মুকাবেলায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন : ৬৫ : হিন্দু আর্যসমাজীদের ফিতনা ও তার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান বর্ণনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ১৮৭২ সালে স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী এবং লালানন্দ লাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উগ্র হিন্দুবাদী সংগঠন আরিয়া সমাজই ইতিহাসে হিন্দু আর্যসমাজ বা আর্যসম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইসলাম ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি, মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা এবং নানা কৌশলে মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিই ছিল এ সমাজের মূল লক্ষ্য। উলামায়ে দেওবন্দ কঠোর হস্তে তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

হিন্দু আর্যসম্প্রদায়ের তৎপরতা

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও স্বামী লালানন্দ লাল মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, নবী-রাসূল এবং কুরআন মাজীদের উপর বহু মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে। এজন্য স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী "স্বতীর্থ" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে। ১৯২৩ সালে এ ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম থেকে অনেক মানুষ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। ইতিহাসে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক এ আন্দোলনকে শুদ্ধি আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়।

ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

আর্যগোষ্ঠী তথা শুদ্ধিদের দ্বারা সৃষ্ট এ ফিতনার মুকাবেলা করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর্যগোষ্ঠীরা ইসলামের অসারতা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশ আহবান করে এবং তাদের বক্তব্যের অকাট্যতা চ্যালেঞ্জ করে উলামা সমাজকে মুনাজারায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম ননুতুবী রহ. তাদের এ চ্যালেঞ্জ লড়ার জন্য সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হন। আর্যগোষ্ঠীর দুই জাঁদরেল পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও স্বামী লালানন্দ লালের সাথে তাঁর তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বিতর্কে হযরত নানুতুবী রহ. অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাদের আপত্তিসমূহ খণ্ডন করেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করেন। বিতর্কে তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণগুলো পরে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হয় "হুজ্জাতুল ইসলাম" এবং "কিবলাতুনা" গ্রন্থদ্বয়ে।

আর্যগোষ্ঠীরা মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসকে আক্রমণ করে যে পুস্তক রচনা করেছিল, তার বিরুদ্ধে হযরত নানুতুবী রহ. "জওয়াবে তুর্কী-বতুর্কী" নামক একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের দাঁতভাঙ্গা জবাবের পাশাপাশি পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে ইসলামে শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়।

১৯২৩ সালে আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণ এবং আর্যগোষ্ঠীকে প্রতিরোধ করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ৫০জন মুবাল্লিগকে সে অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। এ হেন জটিল পরিস্থিতিতে দেওবন্দের হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ. দাওয়াতী মিশন নিয়ে স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের প্রচেষ্টায় সেখানে একটি দাওয়াতী কেন্দ্র এবং বেশ কিছু মাদরাসা গড়ে উঠে।

উপসংহার : উলামায়ে দেওবন্দের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এ ফিতনা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা তাদের ঈমান-আকীদা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন : ৬৬ : ইনকারে হাদীসের ফিতনা ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের উপর আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : হাদীসকে শরী'অতে প্রামাণ্য ভিত্তিরূপে স্বীকৃতি জ্ঞাপন না করার নাম ইনকারে হাদীস। এটা মূলত انكارحجية حديث এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটা ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একটি ফিতনা। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে প্রত্যেকের জন্য নিজস্ব খেয়াল-খুশি মতো কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অবকাশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ কারণে যুগে যুগে প্রবৃত্তি পূজারীরা হাদীসকে শরী'অতের অন্যতম দলীল বলে অস্বীকার করেছে।

ইনকারে হাদীসের সূচনা

ইনকারে হাদীসের ফিতনা মূলত খারেজী সম্প্রদায় থেকে শুরু হয়েছে। জঙ্গে সিফফীনের সালিশের ফায়সালা না মেনে যারা "আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানি না" শ্লোগান দিয়ে হযরত আলী রাযি.-এর দল ত্যাগ করেছে, তারাই মূলত হাদীস অস্বীকার করার প্রবণতার সূচনা করে। তবে তাদের হাদীস অস্বীকারের ধরণ ছিল ভিন্ন। তাদের ধারণা ছিল, যারা এ সালিশের ফয়সালা মেনে নিয়েছে, তারা মূলত কুরআনে কারীমের বিধান লঙ্ঘন করে কাফের হয়ে গেছে এবং তাদের (সালিশ মান্যকারী সাহাবীদের) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। অতএব সেই হাদীসগুলো আর গ্রহণীয় হতে পারে না। বস্তুত খারেজীরা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে এহেন বিভ্রান্তিকর চিন্তার শিকার হয়েছিল এবং সালিশ মান্যকারী সাহাবা কিরামের বর্ণিত হাদীসসমূহকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে ছিল।

হাদীস অস্বীকার করার কারণ

ইনকারে হাদীসের ইতিহাস থেকে জানা যায়, যুগে যুগে প্রবৃত্তির পূজারীরা নানা ধরনের খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে হাদীস অস্বীকারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তাদের দাবি প্রমাণের জন্য যতটুকু অস্বীকার করার প্রয়োজন। ততটুকু অস্বীকার করেছে। তাদের ব্যক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে মৌলিকভাবে পাঁচটি দাবি বেরিয়ে আসে।

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কুরআনে কারিমের মুবাল্লিগ বা বর্তাবহক। তাই তাঁর আনীত কুরআন মাজীদ অবশ্যই অনুসরণীয় বটে, তবে বার্তাবাহক হিসেবে তাঁর নিজের কথার কোনো গুরুত্ব নেই। সুতরাং আমাদের জন্য তা অনুসরণীয় নয়।

২। নবীর কথা অনুসরণের অপরিহার্যতা তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ সীদ্ধান্ত ছিল। কেননা তিনি ছিলেন সে সময়ের শাসনক্ষমতার অধিকারী। সাহাবীদের জন্য তা অবশ্যই পালনীয় ছিল বটে। কিন্তু তাঁর ওয়াফাতের পর উম্মতের জন্য তা পালনীয় নয়।

৩। যেহেতু কুরআন মাজীদ মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উম্মতকে বুঝিয়ে দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব ছিল, তাই কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কীয় তাঁর সকল কথা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় বটে; কিন্তু অন্যান্য হাদীসগুলো অনুসরণীয় নয়।

৪। হাদীস অবশ্য অনুসরণীয় ছিল; কিন্তু তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় নি বলে সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে এগুলো অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

৫। একদল প্রবৃত্তিপূজারী যৎসামান্য লেখাপড়া করেই শরী'অতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে নিজেকে মুজতাহিদ ভাবতে শুরু করে। ফলে নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা-ভাবনাগুলোকেই তার শরী'অতের বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। এমনকি তাদের এ মতামতকে শরী'অতের প্রমাণসমৃদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায়। যদি কোনো হাদীস তাদের এ চিন্তাগুলোকে নাকচ করে দেয়, তখন সেই হাদীসটিকে যে কোনো খোঁড়া যুক্তি দিয়ে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা করে।

ভারত উপমহাদেশে ইনকারে হাদীসের সূচনা

ভারত উপমহাদেশে হাদীস অস্বীকার কারার প্রথম সূচনা করে স্যার সৈয়দ ও তার অনুসারী মৌলবী চেরাগ আলী। কিছুকাল পর তার সমর্থক গোষ্ঠী আব্দুল্লাহ চক্রালভীর নেতৃত্বে আহলে কুরআন নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করে। এদের একজন অন্যতম নেতা আসলাম জয়লাসপুরী আহলে কুরআনদের দল ত্যাগ করে স্বতন্ত্র আরেকটি দল গঠন করে। এ দল সরাসরি হাদীস অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায়। পরে গোলাম পারভেজের নেতৃত্বে ইনকারে হাদীসের এ প্রবণতা পূর্ণতা লাভ করে। সে বিষয়টিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

মূলত পারভেজের আমলেই এ ফিতনাটা বেশি বিস্তার লাভ করে। এ পারভেজ ছিল স্যার সৈয়দ এর একজন কট্টর সমর্থক। সে তার চিন্তাধারার আলোকে একটি নয়া তাফসীর রচনা করে। তাতে সে প্রমাণ করতে চায়, কুরআনে আল্লাহ ও রাসূল শব্দ ব্যবহার করে মূলত একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাশীল

শক্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং 'উলুল আমর' বলে সেই কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

পারভেজ তার তাফসীরে আরও লিখেছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দায়িত্ব ছিল কেবল এতটুকু যে, তিনি আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মানুষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবেন। সুতরাং কোনো মানুষকে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার ছিল না। সে আরো দাবি করে, কুরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধানাবলী তথা উত্তারাধিকারী আইন, লেনদেন, করজে হাসানা, যাকাত ও দান-সাদকার বিধানসমূহ শুধু প্রথম যুগের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার মতে আখেরাত বলতে ভিন্ন কোনো জগতকে বুঝায় না বরং এর অর্থ হল, অনন্ত ভবিষ্যত আর জান্নাত-জাহান্নাম বলতে মূলত মানুষের সুখ-দুঃখকে বুঝানো হয়েছে।

আদম বলতে নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে বুঝানো হয় নি। মিরাজ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি স্বপ্ন মাত্র। নামাযের বর্তমান রূপও ইসলামের নিজস্ব কোনো রূপ নয় বরং এ রূপটি অগ্নিপূজারীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। যাকাত বলতে মুসলিম সরকারের করকে বুঝানো হয়েছে; এর কোনো নির্ধারিত নেসাব নেই। তার মতে হজ্ব কোনো ইবাদত নয়। এটি মুসলিম মিল্লাতের একটি সম্মেলন। এ সম্মেলনে আগত লোকদের খাবারের যোগান দেওয়ার জন্যই সেখানে কুরবানীর বিধান দেওয়া হয়েছে। অতএব অন্যত্র কুরবানি করার প্রয়োজন নেই। এ সকল বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা সমাজে প্রচার করার জন্য সে বহু বই-পুস্তক রচনা করে। পরবর্তীকালে সে "তুলূয়ে ইসলাম" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

ইনকারে হাদীসের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ

এ ফিতনার প্রতিরোধের জন্য উলামায়ে দেওবন্দ হাদীসের গুরুত্ব ও তার প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহের আলোকে জনগণের সামনে তুলে ধরেন এবং হাদীস অস্বীকার কারীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে সমাজকে তাদের বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। এ ছাড়া যেসব যুক্তির আলোকে তারা হাদীসকে অস্বীকার করে ছিল, সে-সব যুক্তি যে ভিত্তিহীন এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী, তাঁরা তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরেন। তাদের এসকল বিভ্রান্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের জন্য তাঁরা বহু বই-পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করেন।

মুফতী শফী রহ. এবং ইউসুফ বিন্নৌরী রহ. পারভেজের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করে "ফতওয়ায়ে পারভেজ" নামাক পুস্তক রচনা করেন।

মুফতী ওয়ালী হাসান টুংকী রহ. রচিত "ফিতনায়ে ইনকারে হাদীস" এ বিষয়ে একটি সুবিদিত কিতাব। মুফতী রশীদ আহমদ রহ. রচিত 'আহসানুল ফাতওয়ায়' –এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া উলামায়ে দেওবন্দ হাদীসের দরসদানকালে এ বিষয়ের উপর প্রমাণসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন। এভাবে ইনকারে হাদীসের এ হীন তৎপরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং হাদীস শরী'অতের প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের দ্বিধা-সংশয় কেটে যায়।

উপসংহার : ইনকারে হাদীসের এ ফিতনার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ বহুমুখী সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফলে তাদের অপপ্রচারের কারণে উম্মতের মধ্যে আকীদাগত বিষক্রিয়া প্রবেশ করতে শুরু করছিল, তা দূর হয় এবং হাদীস শরী'অতের অন্যতম দলীল হওয়ার বিষয়টি উম্মতের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে।

প্রশ্ন : ৬৭ : কাদিয়ানী ফিতনা ও তার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের অবদান সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর :

ভূমিকা : ইংরেজদের পরোক্ষ মদদে উপমহাদেশের ধর্মীয় অঙ্গনে যে-সব ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, কাদিয়ানী ফিতানা হল তার মাঝে অন্যতম। নবী মুহাম্মাদ সা.-ই সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কেয়ামত পর্যন্ত নবী হয়ে কেউ আসবেন না। এটাই হল আহলে হকের বিশ্বাস। ভারতের মাটিতে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী দাবির ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। নিম্নে কাদিয়ানী ফিতনার উৎপত্তি এবং তা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান তুলে ধরা হচ্ছে।

কাদিয়ানী ফিতনার উৎপত্তি

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১২৫২ হিজরী মুতাবেক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৯ সালে তার অপমৃত্যু হয়। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান ও মেধাবী প্রতিভাবান। লেখাপড়া সমাপ্ত করে সে পাঞ্জাবের এক অফিসে কেরানীর চাকরি গ্রহণ করে। চাকরিজীবনের প্রথম দিকে সে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে তার পরিবার পূর্ব থেকেই ইংরেজদের তল্পিবাহক হিসেবে খ্যাত ছিল।

দেশে যখন ইংরেজবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে, উলামায়ে কিরাম ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে জিহাদ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন, ফলে সারা দেশের

মানুষ ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে জিহাদের পবিত্র দায়িত্ব জ্ঞান করে মারমুখো হয়ে উঠে। তখন ইংরেজরা এ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে 'জিহাদের বিধান রহিত হয়ে গেছে' মর্মে ফাতওয়া প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করল। আর যেহেতু শরী'অতের স্বীকৃত বিধান রহিত করার জন্য নতুন নবীর প্রয়োজন হয়, তাই তারা পূর্ব তল্পিবহনের সূত্রে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে এ কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করল এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাকে তাদের পূর্ণ তাঁবেদারীতে নিয়োগ করল আর তাকে নতুন নবী বলে প্রচার করতে লাগল।

গোলাম আহমদের অপতৎপরতা

ইংরেজদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলার হীন উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে নিজেকে সংস্কার, ইমাম মাহদী, প্রতিশ্রুত মাসীহ, জিল্লি নবী বা ছায়া নবী বলে দাবি করে। ১৯০১ সালে সে নিজেকে পূর্ণ নবী দাবি করে এবং কুরআন মজীদের কতিপয় আয়াতের অর্থ বিকৃত করে তার আগমনের কথা কুরআন মজীদে রয়েছে বলে দাবি করে। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের যেসব স্থানে রাসূলুল্লাহ সা.-কে 'খাতামুন্নাবিয়ীন' বা শেষনবী বলা হয়েছে, সেসব স্থানের 'খাতাম' শব্দের অর্থ বিকৃত করে এর দ্বারা মোহরাঙ্কিত নবী বা শ্রেষ্ঠনবী বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করে। সে দাবি করে, তার নিকট বিভিন্ন ভাষায় ওয়াহী আসে এবং সেসব ওয়াহিতে জিহাদ রহিতকরণসহ অন্যান্য বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়াও দ্বীন-শরী'অত সম্পর্কে মিথ্যা, আজগুবি ও উদ্ভট মন্তব্য সে করেছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে
কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর কাদিয়ানীরা পশ্চিম পাকিস্তানের 'রাবওয়া' অঞ্চলে ও তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বি.বাড়িয়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকার বকশী বাজারে এসে নব্য আস্তানা গড়ে তোলে। সে সময় তাদের সংখ্যা খুব কম থাকলেও পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে দায়িত্বরত কতিপয় কাদিয়ানী কর্মকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় তারা যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পায়। আইয়ূব খানের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দৌহিত্র এম. এম. আহমদের মাধ্যমে তারা পঞ্চগড়ে প্রায় দুইশ একর জমি বরাদ্দ লাভ করে এবং সেখানে তাদের একটি বৃহৎ কেন্দ্র গড়ে তোলে। অপর কর্মকর্তার সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গায়ও একটি বিশাল কেন্দ্র গড়ে তোলে।

ঢাকাস্থ মিরপুর দুই নম্বর ও ছয় নম্বর সেকশনে, কল্যাণপুর ও বাড্ডায় তাদের আস্তানা রয়েছে। বাংলাদেশে তাদের পরিকল্পনা হল প্রতিটি জেলা-উপজেলা ও বড় বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থলে জমি ক্রয় করে একটি করে কেন্দ্র গড়ে তোলা। ইতঃমধ্যে তাদের এ পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তাদের প্রকাশিত "আহমদ শত বার্ষিকী"তে উল্লেখ করা হয়েছে, সারা বাংলাদেশে তাদের মোট ৯৩টি কেন্দ্র রয়েছে। ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায়, এ কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০টিতে উন্নীত হয়েছে।

পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কারণে তারা বাংলাদেশকে তাদের কার্যক্রম চালানোর উর্বর ভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্যপীড়িত এ দেশের মুসলিম জনগণকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিদেশী প্রভুদের থেকে আনা শত শত কোটি ডলার তারা এ দেশে ব্যয় করছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগ কবলিত এলাকায় এসব অর্থ ব্যয় করে ধর্মচ্যুত করছে হাজার হাজার মানুষকে। তাদের একাধিক অঙ্গসংগঠনও রয়েছে। যেমন–

১. **মজলিশে আনসারুল্লাহ :** চল্লিশোর্ধ বয়সের ব্যক্তিবর্গ এর সদস্য। ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও উচ্চপর্যায়ের আমলাদের দলে ভেড়ানোর জন্য কাজ করে এ সংগঠন।

২. **মজলিসে খুদ্দামে আহমদী :** ১৬ থেকে ৪০ বৎসর বয়সের মানুষ এর সদস্য। যুব সমাজ, বিশেষ করে বেকার যুবকদের পিছনে এ সংগঠনের কর্মতৎপরতা চলে।

৩. **মজলিসে আতফালে আহমদী :** অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসরের কিশোরদের মাঝে এ সংগঠন তার কর্মতৎপরতা চালায়।

৪. **লাজনাতু আমাইল্লাহ :** ১৫ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের মাঝে কর্মতৎপরতা চালায় এ সংগঠনটি।

৫. **নাসেরাত :** ১৫ বৎসরের কম বয়সী শিশু-কিশোরীদের মাঝে এ সংগঠনটির কর্মতৎপরতা পরিচালিত হয়।

এমনিভাবে বিভিন্নমুখী তৎপরতার মাধ্যমে অত্যন্ত সুসংহতভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে।

কাদিয়ানী ফিতনার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আত্মপ্রকাশের পর তার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সর্বপ্রথম লুধিয়ানের উলামায়ে কিরামের নজর পড়ে। তাঁরা তার লেখা বই-পুস্তক

ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ১৮৮৯ সালে তাকে কাফির ফতওয়া প্রদান করেন। গোলাম আহমদের সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দে ফাতওয়া তলব করা হলে দারুল উলূম থেকে লিখে দেওয়া হয়, যেহেতু বিষয়টি ব্যক্তির কুফুরী সম্পর্কীয়, তাই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। অতএব প্রথম পর্যায়ে তাকে বদদ্বীন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এরপর গোলাম আহমদ সম্পর্কে তারা গভীর অনুসন্ধান চালাতে থাকেন। একপর্যায়ে ১৩৩১ হিজরীতে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এবং তাঁর শিষ্য আল্লামা কাশ্মিরী রহ. সহ অন্যান্য আলেমগণ তাকে দ্বীনের গণ্ডি-বহির্ভূত বলে মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে উলামায়ে দেওবন্দ তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানের পর তার ভণ্ডামী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হন এবং ১৩৩৬ হিজরীতে দারুল ইফতা বিভাগ থেকে স্পষ্ট বলা হয়, সে কাফির। দারুল উলূমের এ ফাতওয়ার ফলে মানুষ সচেতন হয় এবং কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কাদিয়ানী মতবাদের প্রচারকরা এটিকে একটি মাযহাবী মতবিরোধের মতো একটি বিরোধ বলে অপপ্রচার চালাতে থাকলে উলামায়ে দেওবন্দ গোলাম আহমদের বই-পুস্তকের উদ্ধৃতিসহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে জাতির সামনে তার মিথ্যাচার ও গোমরাহীকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। গোলাম কাদিয়ানীর মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি, মিথ্যা নবুয়তের দাবি ও খতমে নবুয়ত বিষয়ক উলামায়ে দেওবন্দ রচিত পুস্তকাদির সংখ্যা প্রায় দুইশতের কাছাকাছি।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত মাসিক “আর-রশীদ” পত্রিকায় আল্লামা লুধীয়ানবী রহ. এ ধরনের প্রায় দেড়শত পুস্তকের নাম ও পরিচয় তুলে ধরেন। ১৯২৫ সালে মির্জা বশির নামে এক ব্যক্তি গোলাম কাদিয়ানীর নবুয়তীর সমর্থনে “আল-ফযল” নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করলে মাওলানা মুরতজা হাসান দেওবন্দী রহ. তার জবাবে “কাদিয়ান কে কিয়ামত খীজ ভূ-চাল” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি রচনা করে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ও গোলাম কাদিয়ানীর কুফুরী ও খতমে নবুয়তের উপর বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যদেরকে এ ফিতনার মুকাবেলার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লামা কাশ্মিরী রহ., শাব্বির আহমদ উসমানী রহ., মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ., মুফতী মুরতজা হাসান রহ. প্রমুখ মনীষী কাদিয়ানী ফিতনা বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এ সকল ব্যক্তিবর্গের মাঝে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে নিজ জীবনের অন্যতম সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ শাগরিদদের মাঝে মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী রহ., মাওলানা মুরতজা হাসান চাঁদপুরী রহ., মাওলানা মুনাজির আহসান গিলানী রহ., মুফতী শফী রহ., মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে এ কাজে বিশেষভাবে নিয়োগ করে ছিলেন।

তিনি তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'মজলিসে আহরার"-কেও খতমে নবুয়তের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন এবং মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ রহ.-কে এর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এ আন্দোলন যথেষ্ট গতিশীল হয়ে উঠে। একপর্যায়ে ১৯৩০ সালে শাহ বুখারী রহ. তাঁর কর্মীবৃন্দ থেকে জিহাদের বাই'আত গ্রহণ করতে শুরু করলে হযরত কাশ্মিরী নিজেও শাহ বুখারীর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। এভাবে সারাদেশে কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

কাদিয়ানীদের পক্ষ থেকে দু'টি চ্যালেঞ্জ ও তার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দ

১৮৯১ সালে গোলাম কাদিয়ানী ঘোষণা দেয়, সে "হায়াতে মাসীহ" প্রসঙ্গে মুনাযারা করতে প্রস্তুত। তার দাবি ছিল, হযরত ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেছেন। উলামায়ে দেওবন্দ তার ঘোষণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন এবং বলেন, আপনার সাথে মুখোমুখী আলোচনায় বসার জন্য আমরা দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষায় আছি। তবে হায়াতে মাসীহ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, আপনি নিজে মুসলমান। এতে সে পিছপা হয়ে যায়। মৃত্যু পর্যন্ত আর সে মুনাযারায় আসতে সাহস করে নি।

১৯৩৫ সালে কাদিয়ানীরা নিজেদের হক্কানিয়াতের চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের হক্কানিয়াতকে স্বীকার না করলে মুবাহালায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। উলামায়ে দেওবন্দ তাদের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করার জন্য মুবাহালায় অংশগ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন। স্থান ও দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত স্থানে উলামায়ে দেওবন্দ উপস্থিত হলেও মুবাহালা আহ্বানকারী মাহমূদ কাদিয়ানী সে অঞ্চল থেকে পালিয়ে যায়। মুবাহালার জন্য নির্ধারিত মঞ্চ থেকেই উলামায়ে দেওবন্দ কাদিয়ানীদের মিথ্যাচার ও খতমে নবুয়তের গুরুত্বের উপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করে জনগণকে সতর্ক করে দেন এবং সেই মঞ্চ থেকেই তারা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবি উত্থাপন করেন।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কাদিয়ানী ফিতনার বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতা

১৯৫৩ সালে উলামায়ে দেওবনন্দের নেতৃত্বে পাকিস্তানে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠে যায় এবং সারাদেশে উত্তাল তরঙ্গের অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। তীব্র এ আন্দোলনে দশ হাজার নবীপ্রেমিক শাহাদাত বরণ করেন। লাহোরের রাজপথ তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয় এবং নেতৃত্ব প্রদানের অপরাধে উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে মামলা মোকাদ্দমা করে তাঁদেরকে হয়রানী করা হয়। পাকিস্তান সরকার মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ., মাওলানা গোলাম গাউছ হাযারভী রহ., মাওলানা আবদুস সাত্তার রহ. প্রমুখ আলেমদের বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম জারী করে। তবে গণদাবির চাপে সরকারের পক্ষে তা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

১৯৭৪ সালে আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী রহ.-এর নেতৃত্বে এ আন্দোলন আরো ব্যাপকরূপ লাভ করে। ফলে পাকিস্তান আরো একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময়ে সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সালের হস্তক্ষেপের ফলে তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণা করে।

বাংলাদেশে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃত্বে কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা চলতে থাকে। ১৯৮৯ সালের ২রা ও ৩রা মার্চ আরজাবাদ মাদরাসা মিরপুর ঢাকায় হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমীর সভাপতিত্বে দুদিন ব্যাপী “খতমে নবুয়ত মহা সম্মেলন” আহ্বান করা হয়। এতে দেশের সকল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানানো হয়। এতে উপস্থিত সহস্রাধিক উলামায়ে কিরাম ও সুধীজনের উপস্থিতিতে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, খতমে নবুয়ত আন্দোলনকে গণমুখী করার লক্ষ্যে এবং দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯৮৯ সালের ২৬শে অক্টোবর দেশের গণ্যমান্য উলামায়ে কিরাম ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে “খতমে নবুয়ত আন্দোলন পরিষদ” নামে একটি সংগঠন করা হয় এবং মাওলানা শামসুদ্দীন রহ.-কে সভাপতি ও মুফতী নূরুল্লাহ রহ.-কে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ফলে সারা দেশে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের গণজোয়ার সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মাঝে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে

সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ৫০ টি জেলায় এ সংগঠনের জিলা সংগঠন গড়ে উঠে। দেশের আলেমসমাজ এতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেন। অদ্যাবদি এ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

উপসংহার : মুসলিম সমাজের আকীদা বিধ্বংসী এ কাদিয়ানী ফিতনার মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দ শুরু থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছেন। তাঁদের বহুমুখী পদক্ষেপের কারণে পাকিস্তানসহ পৃথিবীর আরো বহু দেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আন্দোলনকে আরো বেগবান এবং সফল করুন।

প্রশ্ন : ৬৮ : বিদ'আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের উপর আলোকপাত কর।

উত্তর :

ভূমিকা : সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেনিয়াদের শাসনামলে যে সকল ফিতনা উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল, সেগুলোর মধ্যে বিদ'আত অন্যতম। অন্যান্য ফিতনার মতো এ ফিতনার প্রতিরোধকল্পেও উলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বিকৃতি হওয়ার হাত থেকে দ্বীনকে রক্ষা করেন। নিম্নে বিদ'আত ও বিদ'আতীদের ফিতনা এবং তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

বিদ'আতের সংজ্ঞা

আল্লামা শাতিবী রহ. লিখেছেন: বিদ'আত হল, সাওয়াবের প্রত্যাশায় ইবাদত কিংবা ইবাদতের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে নবী করীম সা., সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের পরবর্তী যুগে এসে এমন নতুন কিছুর উদ্ভাবন করা, যার প্রমাণ কুরআন মজীদ, সুন্নাহ কিংবা সাহাবীগণের কথায়, কাজে, ইশারা ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনোভাবেই বিদ্যমান নেই। অথচ সেই বিষয়গুলো এমন, যার কার্যকারণ ও প্রয়োজন সে যুগেও বর্তমানের মতোই বিদ্যমান ছিল।

বিদ'আত যে কারণে ও যেভাবে সৃষ্টি হয়

শরী'অতের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা বা জ্ঞান সল্পতাই বিদ'আত সৃষ্টির মূল কারণ। শরী'অত সম্পর্কে অজ্ঞ বা জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের মাত্রাতিরিক্ত আবেগ থেকেই বিদ'আতের সূচনা হতে দেখা যায়। ইমাম মালিক রহ. বলেন, "যারা ইলম অর্জন করে, অথচ আধ্যাতিক উৎকর্ষতা লাভ করে না তারা সাধারণত যিন্দীক হয়ে থাকে আর যারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করে, অথচ তাদের

ইলম থাকে না তারাই মূলত বিদ'আতের জন্ম দিয়ে থাকে।" আবার জ্ঞান সল্পতার কারণে শরী'অতের ভুল ব্যাখ্যা থেকেও অনেক সময় বিদ'আতের সূচনা হয়। পারিপার্শিকতার প্রভাব ও বিজাতীয়দের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণপ্রবণতা থেকেও অনেক সময় বিদ'আতের জন্ম হয়।

ভারত উপমহাদেশে বিদ'আতীদের ফিতনা

তাবেঈগণের যুগে ইসলাম যখন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভারতেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতের সাথে সাথে ইলমে নববী তথা ইসলামী শরী'অতের যথাযথ জ্ঞানের সম্প্রসারণ না ঘটার কারণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও দ্বীনের প্রকৃতরূপ সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করতে পারে নি। তাই মুসলিম সমাজ পূর্ব রুসম-রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে প্রাচীন কুসংস্কারসমূহ মিশ্রিতভাবে চলতে থাকে। ইসলামের মৌলিক বিধান যেমন– নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির প্রতি মানুষের উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মাযারে গমন, ওরশে অংশগ্রহণ, কাওয়ালী ও শ্যামা সংগীত গাওয়া এবং এর আয়োজন করা ইত্যাদি কাজকে মানুষ শরী'অতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে সেগুলোর প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

মানুষের এ অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর অর্থলিপ্সু মানুষ পীর-বুযুর্গদের মাযার নিয়ে ধর্মব্যবসায় মেতে উঠে এবং ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের ঈমান-আকীদা ও অর্থ-সম্পদ লুট করতে শুরু করে। এরাই মূলত বিদ'আত ও কুসংস্কারকে লালন করে এবং নতুন নতুন পন্থায় মানুষের পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কুসংস্কারের জন্ম দেয়।

আহমদ রেজা খানের অপতৎপরতা

উলামায়ে হক্কানী যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা বিদ'আতী শ্রেণীকে তাদের স্বপক্ষে টেনে নেয়। ইংরেজদের মদদপুষ্ট এ দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিদ'আতীদের বিশিষ্ট নেতা আহমদ রেজা খান অন্যতম। বহু বিদ'আত উদ্ভাবনকারী এ লোকটি বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করে। এ দেশের গণমানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ইংরেজবিরোধী জিহাদী চেতনাকে অবদমিত করার জন্য ইংরেজরা যে-সব লোককে জিহাদের বিধান রহিত হয়ে গেছে বলে অপপ্রচার চালানোর জন্য ভাড়াটে হিসেবে নিয়োগ করেছিল, আহমদ রেজা খান তাদেরই একজন।

"ইংরেজ কর্তৃক দখলকৃত ভারতবর্ষ দারুল হরব" –উলামায়ে হকের প্রদত্ত এ ফাতওয়ার বিপরীতে আহমদ রেজা খান ভারতকে 'দারুল ইসলাম বলে ফাতওয়া দেয়। সাথে সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম ঘোষণা করে। এতেও

তার হীন উদ্দেশ্য হাসিল না হলে সে এক নতুন চাল চালে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রেমের নামে নতুন নতুন বিদ'আতের জন্ম দিয়ে মানুষকে তাতে লিপ্ত করে তাদেরকে জিহাদ থেকে বিমুখ করার অপচেষ্টা চালায় আর এর বিরোধীতাকারী আলেমসমাজ ও সাধারণ জনগণকে কাফির ফাতওয়া প্রদান করে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বে মানুষ তার ফাতওয়া গ্রহণ করবে না বুঝতে পেরে উলামায়ে হকের বক্তব্য বিকৃতি করে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়াহ এর উলামায়ে কিরামের নিকট প্রেরণ করে তাদের দ্বারা উক্ত ফাতওয়া প্রদানের চেষ্টা করে। সেখানকার আলেমগণ তার কুটচাল বুঝতে না পেরে শুধু উক্ত বক্তব্য দেখে উক্ত বক্তব্য প্রদানকারীদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া প্রদান করেন।

ওয়াহাবী অপবাদের নেপথ্য কাহিনী

আঠার শতকের মধ্যভাগে জাযিরাতুল আরবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব রহ. কর্তৃক বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলন বলা হয়।

ভারতে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. এর নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, তখন বৃটিশরা এ আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আন্দোলনকারীদেরকে "ওয়াহাবী" বলে প্রচারণা চালানোর জন্য আহমদ রেজা খানকে নিয়োগ করে। সে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদেরকে ওয়াহাবী, কাফির এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর শত্রু বলে ফতওয়া জারী করে।

বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দ

অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থান্বেষীদের শঠতা ও স্বেচ্ছাচারিতা হল বিদ'আত সৃষ্টির মূল কারণ। সুতরাং অজ্ঞতার নিরসন হলে বিদ'আত এমনিতেই নির্মূল হয়ে যায়। কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান এবং দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই বিদ'আত নির্মূলের একমাত্র উপায়। এ কারণে উলামায়ে দেওবন্দ দ্বীনকে ইলমীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দ্বীনী শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য স্থানে স্থানে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এ সব দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সাথে সাধারণ মানুষকে ব্যাপক হারে সংশ্লিষ্ট করার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে করে সাধারণ জনগণের মাঝে দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে আলেম উলামার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের সংস্পর্শে এসে সমাজ বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা লাভ করে। এভাবে অতি সহজেই বিদ'আত উচ্ছেদের আন্দোলন তরান্বিত করা সম্ভব হয়।

উপমহাদেশে শিরক ও বিদ'আত উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.। তিনি বিদ'আতের

বিভাজনকে অস্বীকার করে ঘোষণা করে বলেন, 'হাসানা' বলতে কোনো বিদ'আত নেই। সকল বিদ'আতকেই হাদীস শরীফে ভ্রান্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দের সুদীর্ঘ কালের মুহতামিম হাকীমুল উম্মাহ হযরত কারী তৈয়ব সাহেব রহ. বলেছেন, শিরক ও বিদ'আত নির্মূলের জন্য আকাবিরে উলামায়ে কিরামের তৎপরতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর যুগে ইলমী সচেতনা সৃষ্টির আকারে শুরু হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. এটিকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এরপর হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. ও সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর মাধ্যমে বিদ'আত বিরোধী এই চেতনা ব্যাপকভাবে গণ-মানুষের মাঝে সম্প্রসারিত হয়েছে। হযরত নানুতবী রহ. এ চেতনাকে উচ্চতর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দৃঢ়তা দান করেছেন।

হযরত গঙ্গুহী রহ. এটিকে ফিকাহ শাস্ত্রের যুক্তি-প্রমাণের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর হযরত থানভী রহ. ও হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী বিদ'আত বিরোধী আন্দোলনকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এভাবে বিদ'আত বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত চলতে থাকে। ফলে উপমহাদেশে পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বিদ'আত মুক্ত হয়। শিক্ষামূলকভাবে বিদ'আত সম্পর্কে সচেতন করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক বিদআতের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ ও তার পরিণাম সম্পর্কে বহু বই পুস্তক রচনা করেন। মূল্যবান সেসব গ্রন্থসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটির তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

১. আল বালাগুল মুবীন– শাহওয়ালী উল্লাহ রহ.
২. সীরাতুল মুস্তাকিম– হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.
৩. হিফজুল ইসলাম– হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.
৪. আশরাফুল জওয়াব– হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.
৫. আল-মুহান্নাদ আলমুফান্নাদ– হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.
৬. আল-বারাহিনুল কাতে'আহ– হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.
৭. আস-শিহাবুস সাকিব– শায়খুল ইসলাম মাও. হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.
৮. ফায়সালা কুন মুনাযারাহ– হযরত মাওলানা মনযুর নোমানী রহ.
৯. রাহে সুন্নাত– হযরত মাওলানা মুফতী সরফরাজ খান রহ.
১০. আস-সুন্নাহ ওয়াল বিদাআহ– হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.
১১. শিরক ওয়া বিদাআত– মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

এ ছাড়া উলামায়ে দেওবন্দ ওয়াজ-নসীহত ও বিবৃতির মাধ্যমে সর্বদা উম্মাহকে বিদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। প্রয়োজনে বিদ'আতীদের সাথে তর্ক-বিতর্কে অংশ নিয়েও তাঁরা বিদ'আত প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন।

উপসংহার : উলামায়ে দেওবন্দ কোনো অবস্থাতেই বিদআত কুসংস্কারের সাথে আপস করেন নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা তা প্রতিরোধ করে গেছেন। বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম উলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের এ বলিষ্ঠ অবদানের ফলে সমাজের বৃহৎ অংশই বিদ'আত-কুসংস্কার চিহ্নিত করতে সক্ষম।

প্রশ্ন : ৬৯ : পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় প্রভাবিতদের বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা ও তার প্রতেরোধে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : কুরআন মাজীদ হল দুনিয়ার মানুষের জন্য আসমানের দিক নির্দেশনা। এর নির্দেশিত আদর্শের আলোকে পরিচালিত হবে মানুষের জীবন, এটাই স্রষ্টার কাম্য। কুরআনের ভাষা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভাব ও মর্ম ব্যাপক। তাই তার উদ্দেশ্য নির্ণয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের ভাব-মর্ম ও ব্যখ্যা প্রদান করে গিয়েছেন। সাহাবা কিরাম, তাবেঈন ও তৎপরবর্তীগণ ধারাবাহিকভাবে এ অপরিবর্তনীয় ব্যাখ্যা সংরক্ষণ করেছেন।

উক্ত ব্যাখ্যা ব্যতীত কুরআন মাজীদের অন্য কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত কতিপয় ব্যক্তি উম্মতের সর্বজন অনুসৃত নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে কুরআন মাজীদের মনগড়া ও অভিধানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে কিতাবুল্লাহ ও ইসলামের অপব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং সমাজে নানামুখী ফিতানা জন্ম দেয়। উলামায়ে দেওবন্দ উক্ত ফিতনাকে প্রতিরোধ করার জন্য বহুমুখী কার্যকর ও সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও শরী'অত সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাদীদের বিভিন্ন বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা

পাশ্চাত্যের জীবনধারার আদর্শে মারাত্মকভাবে প্রবাহিত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদের অপব্যাখ্যায় দুঃসাহস প্রদর্শন করে স্যার সৈয়দ আহমদ। তার ধারণা ছিল, মুসলমানরা যতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত তারা পশ্চাৎমুখীতা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। এ কারণে সে ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। তার অনুসরণে আরো যারা এ হেন জঘন্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ চকরালভী, গোলাম পারভেজ, আবুল আলা মওদুদী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা মূলত পাশ্চাত্যের জীবনধারা তথা ন্যাচারিয়াল বা প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ছিল। বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে অকাট্য মনে করত। পাশ্চাত্যের

চিন্তাধারাকে মানবীয় স্বভাবের প্রতিকৃতি জ্ঞান করত। ফলে কুরআন ও সুন্নাহর অনেক সর্বজন স্বীকৃত বহু বিষয় তাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক, অপ্রাকৃতিক ও স্বভাববিরোধী মনে হয়েছে। এ কারণে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত অনেক বিষয়কে অস্বীকার করেছে। আবার কিছু বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত করার লক্ষ্যে সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। নিম্নে তাদের বিভ্রান্তিকর কিছু ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হল :

১। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত সকল অদৃশ্য বিষয় অবাস্তব। যেমন : জান্নাত, জাহান্নাম, জ্বীন, ফেরেশতা, শয়তান, হুর, গিলমান, ইত্যাদি।

২। কুকুর, শূকর পবিত্র এবং বাণিজ্যিক সুদ ও মৃত জন্তু হালাল।

৩। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়া অযৌক্তিক।

৪। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা. বলতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শাসক বুঝায়।

৫। আখেরাত হল ভবিষ্যত আর হজ্ব হল মুসলিম বিশ্বের কনফারেন্স।

৬। হজ্বে অবস্থানরত ব্যক্তিদের খাদ্য সরবরাহ করার জন্যেই কুরবানির বিধান। সুতরাং অন্য কোথাও কুরবানি করার প্রয়োজন নেই।

৭। যাকাত হল সরকারী কর আর নামায হল ফৌজী প্রশিক্ষণ।

৮। জান্নাত মূলত মানুষের সুখ-শান্তি আর জাহান্নাম হল দুঃখ-দুর্দশা।

৯। কুরআন বুঝার জন্য পূর্ববর্তী আলেমদের ব্যাখ্যা পড়ার প্রয়োজন নেই।

১০। মিরাজ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি স্বপ্ন ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যবাদীদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা

দ্বীনকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যার বেড়াজাল থেকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ সবসময় অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে গেছেন। তাঁরা দ্বীনের যে-কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করেন:

ক. দ্বীনের যে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবশ্যই কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহর ভিত্তিতে পরিমাপ করে গ্রহণ করতে হবে।

খ. আকল ও নকল এ উভয়ের সমন্বয়ে ইসলামের সকল বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁরা কুরআন-সুন্নাহকে গ্রহণ করেছেন যুক্তির আলোকে আবার যুক্তিকে গ্রহণ করেছেন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে।

গ. কুরআন-সুন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে ইশক ও আবেগের সাথে। আর ইশক ও আবেগকে মূল্যায়ণ করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দ্বীনের যে উপলব্ধি সাহাবা কিরাম লাভ করেছিলেন, সেই রূপ অবিকল ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

এ মূলনীতিগুলোকে সামনে রেখেই তাঁরা সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে কেউ ইসলাম সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করলেই তাঁরা এ মূলনীতিতে আলাদাভাবে পরখ করে দেখেছেন। উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে যেহেতু পাশ্চাত্যবাদীদের চিন্তাধারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই উলামায়ে দেওবন্দ তাদের প্রতিরোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে গৃহিত তাঁদের পদক্ষেপগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল:

দ্বীন সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তৎপরতার কথা জানতে পারলেই তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কারো বিভ্রান্তি নজরে পড়লে এবং তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলে জনগণকে সে সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন এবং চিহ্নিত বিভ্রান্তিগুলোকে নির্মূলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ওয়াজ-নসীহত, বক্তৃতা ও বিবৃতি এবং পুস্তক রচনা ও প্রকাশের মাধ্যমে এ ফিতনার প্রতিরোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

স্যার সৈয়দের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার জবাবে হযরত নানুতুবী রহ. "তাসফিয়াতুল আকাইদ" নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালে প্রকাশিত "আল-বুরহান" পত্রিকার প্রকাশক মাওলানা মুহাম্মদ আলী বিছরামনী স্যার সৈয়দ রচিত তাফসীরের দুইশতাধিক স্থানে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা চিহ্নিত করত প্রত্যেকটির জবাব প্রদান করেন। তা ছাড়া এমদাদুল ফাতওয়ার ৬ষ্ঠ খণ্ডে, হযরত ইউসুফ বিন্নৌরী রহ. রচিত "ইয়াতিমাতুল বয়ান" গ্রন্থে, মাওলানা আব্দুল হক হকানী রহ. রচিত আল-বয়ান ফি উলূমিল কুরআন গ্রন্থে, মাওলানা তকী উসমানী রচিত "উলূমুল কুরআন" গ্রন্থে এ সকল আধুনিকতাবাদী ও প্রকৃতিবাদীদের বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উপসংহার

উলামায়ে দেওবন্দের অব্যাহত তৎপরতার ফলেই স্যার সৈয়দ ও তার অনুগামীদের বিভ্রান্তি থেকে সমাজের মানুষ রক্ষা পায়। এমনকি স্যার সৈয়দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলীগড়ে লেখা-পড়া করেও বহু ব্যক্তি স্যার সৈয়দের চিন্তাধারা গ্রহণ না করে উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তা-চেতনাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

কুরআন মাজীদ হাদীস শরীফে ও শরী'অত সম্পর্কে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১ : আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন?
উত্তর : রাজা দাহির।

প্রশ্ন : ২ : সিন্ধু অভিযান প্রেরণ করেন কে?
উত্তর : হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

প্রশ্ন : ৩ : সিন্ধু অভিযানে মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর : মুহাম্মদ বিন কাসিম।

প্রশ্ন : ৪ : মুহাম্মদ বিন কাসিম কখন সিন্ধু জয় করেন?
উত্তর : ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৫ : মুহাম্মদ বিন কাসিম কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : দামেস্কের কারাগারে।

প্রশ্ন : ৬ : গজনি বংশের শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন?
উত্তর : খসরু মালিক।

প্রশ্ন : ৭ : মুহাম্মদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর : কুতুবুদ্দীন আইবেক।

প্রশ্ন : ৮ : কুতুবুদ্দীন আইবেক মৃত্যুবরণ করেন কবে?
উত্তর : ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৯ : কুতুবুদ্দীন এর মৃত্যুর পর দিল্লীর সালতানাতে আরোহণ করেন কে?
উত্তর : আরাম শাহ।

প্রশ্ন : ১০ : ইলতুৎমিশ কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন?
উত্তর : ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ১১ : ইলতুৎমিশের উপাধি কি ছিল?
উত্তর : সুলতান-এ-আযম।

প্রশ্ন : ১২ : ইলতুত মিশের রাজত্বকাল কত বছর ছিল?
উত্তর : ২৫ বছর।

প্রশ্ন : ১৩ : দিল্লীর সিংহাসনে প্রথম মুসলিম নারী কে?
উত্তর : সুলতানা রাজিয়া।

প্রশ্ন : ১৪ : নাসির উদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর : গিয়াস উদ্দীন বলবন।

প্রশ্ন : ১৫ : নাসির উদ্দীনের মৃত্যু হয় কত সনে?
উত্তর : ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ১৬ : নাসির উদ্দীন বলবনের উপাধি কি ছিল?
উত্তর : উলুঘ খান।

প্রশ্ন : ১৭ : সুলতান মাহমূদ ভারতবর্ষে মোট কতবার অভিযান করেন?
উত্তর : ১৭ বার।

প্রশ্ন : ১৮ : খলজি বংশের প্রথম শাসক কে?
উত্তর : জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর।

প্রশ্ন : ১৯ : আলাউদ্দীনের প্রিয় সেনাপতি ছিলেন কে?
উত্তর : সেনাপতি মালিক কাফুর।

প্রশ্ন : ২০ : আলাউদ্দীন খলজী কখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন?
উত্তর : ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ২১ : আলাউদ্দীন খলজী মৃত্যুবরণ করেন কখন?
উত্তর : ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ২২ : তুঘলক বংশের প্রথম শাসকের নাম কি?

উত্তর : গিয়াস উদ্দীন।

প্রশ্ন : ২৩ : গিয়াস উদ্দীন কখন ক্ষমতা লাভ করেন?

উত্তর : ১৩২০ খ্রিষ্টব্দে।

প্রশ্ন : ২৪ : গিয়াস উদ্দীনের উপাধি ছিল কি?

উত্তর : গাজি মালিক।

প্রশ্ন : ২৫ : ফিরোজ শাহ তুঘলক কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর : ১৩৫১ খ্রিষ্টব্দে।

প্রশ্ন : ২৬ : তৈমুর লং কখন ভারত আক্রমণ করেন?

উত্তর : ১৩৯৮ সালে।

প্রশ্ন : ২৭ : সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : খিজির খান।

প্রশ্ন : ২৮ : সৈয়দ বংশ কখন দিল্লীর শাসনক্ষমতায় বসে?

উত্তর : ১৪১৪ সালে।

প্রশ্ন : ২৯ : লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : বাহলূল লোদী।

প্রশ্ন : ৩০ : লোদী বংশের শেষ সুলতান কে?

উত্তর : ইবরাহীম লোদী।

প্রশ্ন : ৩১ : ইবরাহীম লোদী ক্ষমতা গ্রহণ করেন কত সালে?

উত্তর : ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৩২ : কোন সুলতানের হাতে দিল্লী সালতানাতের পতন হয়?

উত্তর : সম্রাট বাবরের হাতে ১৫২৬ সালে।

প্রশ্ন : ৩৩ : কোন যুদ্ধে দিল্লী সালতানাতের পতন হয়?

উত্তর : পানিপথের প্রথম যুদ্ধে।

প্রশ্ন : ৩৪ : পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কখন হয়?

উত্তর : ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ, ২১শে এপ্রিল।

প্রশ্ন : ৩৫ : পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

উত্তর : ইবরাহীম লোদী ও সম্রাট বাবরের মধ্যে।

প্রশ্ন : ৩৬ : বাবর কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে, ১৬ই ডিসেম্বর।

প্রশ্ন : ৩৭ : মোঘল সাম্রাজ্যের কত জন শাসক কত দিন পর্যন্ত ভারত শাসন করেন?

উত্তর : ১৩ জন শাসক, প্রায় ২৭৯ বছর।

প্রশ্ন : ৩৮ : বাবরের জৈষ্ঠ্য পুত্রের নাম কি?

উত্তর : হুমায়ূন।

প্রশ্ন : ৩৯ : হুমায়ূন কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর : ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৪০ : হুমায়ূন কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৪১ : আকবর কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে, ২৩শে নভেম্বর।

প্রশ্ন : ৪২ : সম্রাট আকবরের পুরো নাম কি?

উত্তর : জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর।

প্রশ্ন : ৪৩ : সম্রাট আকবর কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর : ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৪৪ : আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর : মাত্র ১৩ বছর বয়সে।

প্রশ্ন : ৪৫ : কার তত্ত্বাবধানে আকবর পালিত হন?

উত্তর : বৈরম খান।

প্রশ্ন : ৪৬ : সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত নতুন ধর্মমতের নাম কি?

উত্তর : দ্বীনে ইলাহী।

প্রশ্ন : ৪৭ : আকবরের ভ্রান্তিমূলক ধর্মমতের বিরুদ্ধে কে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন?

উত্তর : শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.।

প্রশ্ন : ৪৮ : আকবর সালামের পরিবর্তে কি চালু করেন?

উত্তর : আল্লাহু আকবার, আর জবাবে জাল্লা জালালুহু।

প্রশ্ন : ৪৯ : আকবর কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৫০ : মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৫১ : মুজাদ্দিদ রহ. গোটা শরী'আতকে কয়ভাগে বিভক্ত করেন?

উত্তর : তিন ভাগে।

প্রশ্ন : ৫২ : সেগুলো কি কি?

উত্তর : ইলম, আমল ও ইখলাস।

প্রশ্ন : ৫৩ : তিনি "হামাহ উসত"-এর স্থলে কি প্রচার করেন?

উত্তর : হামাহ আয উস্ত।

প্রশ্ন : ৫৪ : শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর মূল নাম কি?

উত্তর : আহমদ।

প্রশ্ন : ৫৫ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. প্রচলিত অন্ধত্ব থেকে বাঁচানোর জন্য কয়টি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন মনে করেন এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : ৩টি। যুক্তি দর্শন, তত্ত্ব দর্শন ও ইলম বির-রিওয়ায়াহ।

প্রশ্ন : ৫৬ : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর রাজনৈতিক কার্যক্রম কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?

উত্তর : দুই ভাগে। পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম।

প্রশ্ন : ৫৭ : কত সালে ইংল্যাণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়?

উত্তর : ১৬০০ সালে।

প্রশ্ন : ৫৮ : কখন ইংরেজরা প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন?

উত্তর : সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়।

প্রশ্ন : ৫৯ : জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরিত ইংরেজ দূতের নাম কি ছিল?

উত্তর : স্যার টমাস রো।

প্রশ্ন : ৬০ : ইংরেজদেরকে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ দেন কে এবং কত সনে?

উত্তর : সুবেদার শায়েস্তা খান, ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৬১ : সিরাজউদ্দৌলা কখন ক্ষমতা লাভ করেন?

উত্তর : ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৬২ : কখন পলাশীর যুদ্ধ হয়?

উত্তর : ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৬৩ : পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন কে?

উত্তর : রবার্ট ক্লাইভ।

প্রশ্ন : ৬৪ : কখন বক্সারের যুদ্ধ হয়?

উত্তর : ২২শে অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৬৫ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংগঠিত হয় কখন?

উত্তর : ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৬৬ : ফরায়েজী আন্দোলনের সংগঠক কে?

উত্তর : হাজী শরী'আতুল্লাহ।

প্রশ্ন : ৬৭ : ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা হয় কবে?

উত্তর : ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৬৮ : ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দেন কে ?

উত্তর : হাজী শরীয়তুল্লাহ।

প্রশ্ন : ৬৯ : হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যু হয় কবে?

উত্তর : ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৭০ : দুদু মিয়া কে?

উত্তর : হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র।

প্রশ্ন : ৭১ : দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম কি?

উত্তর : মোহাম্মদ মুহসিন।

প্রশ্ন : ৭২ : দুদু মিয়ার জন্ম কবে?

উত্তর : ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৭৩ : লাঠিয়াল বাহিনী কে গঠন করেন?

উত্তর : দুদু মিয়া।

প্রশ্ন : ৭৪ : তিতুমীর কে ছিলেন?

উত্তর : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক।

প্রশ্ন : ৭৫ : তিতুমীরের প্রকৃত নাম কি?

উত্তর : সৈয়দ নিসার আলী।

প্রশ্ন : ৭৬ : তিতুমীর শহীদ হন কখন?

উত্তর : ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৭৭ : সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয় কোথায়?

উত্তর : বঙ্গদেশের ব্যারাকপুরে।

প্রশ্ন : ৭৮ : সিপাহী বিদ্রোহ কখন হয়?

উত্তর : ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৭৯ : উপমহাদেশে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে আসে কখন?

উত্তর : সিপাহী বিদ্রোহের পর।

প্রশ্ন : ৮০ : কংগ্রেস কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৮১ : মুসলিম লীগ কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৮২ : খেলাফত আন্দোলনের সূচনা হয় কোন সালে?

উত্তর : ১৯২০ সালে।

প্রশ্ন : ৮৩ : শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর জন্ম হয় কত সালে?

উত্তর : ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে।

প্রশ্ন : ৮৪ : পিতার প্রবর্তিত কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি কয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : ৫টি। (ক) কুরআর প্রচার। (খ) ইলমে হাদীসের প্রচলন দান ও উন্নতি বিধান। (গ) বাতিলের খণ্ডন ও হকের প্রতি আহ্বান। (ঘ) গণজাগরণ সৃষ্টি। (ঙ) পিতার আদর্শে আদর্শবান কর্মীবাহিনী গঠন।

প্রশ্ন : ৮৫ : শী'আদের প্রতিরোধে তিনি কি গ্রন্থ রচনা করেন?

উত্তর : তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ।

প্রশ্ন : ৮৬ : কে ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করেন?

উত্তর : শাহ আব্দুল আযীয রহ.।

প্রশ্ন : ৮৭ : সৈয়দ আহমদ শহীদ জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?

উত্তর : অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

প্রশ্ন : ৮৮ : কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রশ্ন : ৮৯ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুসলমান শাহাদাৎ বরণ করেন?

উত্তর : ২ লাখ।

প্রশ্ন : ৯০ : আলেমদের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ৫১, ৫০০।

প্রশ্ন : ৯১ : দারুল উলূম দেওবন্দের গোড়াপত্তন করা হয় কখন?

উত্তর : ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩০শে মে।

প্রশ্ন : ৯২ : কোথায় দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করা হয়?

উত্তর : সাহারানপুর জেলার ঐতিহাসিক ছাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গনে ছোট্ট একটি ডালিম গাছের নিচে।

প্রশ্ন : ৯৩ : কে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ৬ জন মনীষী। কাসেম নানুতবী রহ. তাঁদের অন্যতম।

প্রশ্ন : ৯৪ : দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র কে?

উত্তর : মাওলানা মাহমূদুল হাসান।

প্রশ্ন : ৯৫ : উসূলে হাশতে গানাহ এর অর্থ কি?

উত্তর : অষ্ট মূলনীতি।

প্রশ্ন : ৯৬ : উসূলে হাশতে গানাহ এর রচয়িতা কে?

উত্তর : হযরত কাসেম নানুতবী রহ.।

প্রশ্ন : ৯৭ : শায়খুল হিন্দ রহ. কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৮৫১ সালে।

প্রশ্ন : ৯৮ : রেশমী রুমালরূপী পত্রটি কার বাড়িতে পাওয়া যায়?

উত্তর : শায়খ আবদুর রহীম-এর বাড়ি তল্লাশী করে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : ৯৯ : কখন পাওয়া যায়?

উত্তর : ১৯১৬ ইং ৯ই জুলাই।

প্রশ্ন : ১০০ : শায়খুল হিন্দ কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর : ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে।

প্রশ্ন : ১০১ : করাচীর খিলাফত কনফারেন্সে হযরত মাদানী রহ. কি ঘোষণা দিয়েছিলেন?

উত্তর : বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকরি করা সম্পূর্ণ হারাম।

প্রশ্ন : ১০২ : কত সালে হাফেজ্জী হুজুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে তৃতীয় স্থান লাভ করেন?

উত্তর : ১৯৮১ সালে।

প্রশ্ন : ১০৩ : কত সালে এবং কোথায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ নামে বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৮ সালে, শায়েস্তা খান হলে।

প্রশ্ন : ১০৪ : শী'আদের উপদল কয়টি?

উত্তর : ২২টি মতান্তরে ৩২টি।

প্রশ্ন : ১০৫ : 'ইযালাতুল খিফা'-এর লেখক কে?

উত্তর : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.।

প্রশ্ন : ১০৬ : কে শী'আদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ রচনা করেন?

উত্তর : শাহ আব্দুল আযীয রহ.।

প্রশ্ন : ১০৭ : মানসাবে ইমামত-এর লেখক কে?

উত্তর : হযরত শাহ ইসমাইল রহ.।

প্রশ্ন : ১০৮ : "স্বতীর্থ" নামক বইটি কে রচনা করেন এবং কখন তা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর : লেখক স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী এবং প্রকাশ করা হয় ১৮৭২ সালে।

প্রশ্ন : ১০৯ : মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে।

প্রশ্ন : ১১০ : মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কখন মারা যায়?

উত্তর : ১৯০৯ সালে।

প্রশ্ন : ১১১ : মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কখন নিজেকে পূর্ণ নবী দাবি করে?

উত্তর : ১৯০১ সালে।

প্রশ্ন : ১১২ : পাকিস্তানের কোন প্রধানমন্ত্রী কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যা লঘু অমুসলিম ঘোষণা করে?

উত্তর : জুলফিকার আলী ভুট্টো।

প্রশ্ন : ১১৩ : পাকিস্তানে কত সালে কায়িদানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়?

উত্তর : ১৯৪৭ সালে।

প্রশ্ন : ১১৪ : ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় কখন?

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট।

প্রশ্ন : ১১৫ : পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে কবে?

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট।

প্রশ্ন : ১১৬ : ভারত স্বাধীনতা লাভ করে কবে?

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট।

প্রশ্ন : ১১৭ : সৈয়দ আহমদ শহীদ কোথায় শাহাদাত বরণ করেন?

উত্তর : বালাকোটের ময়দানে।

প্রশ্ন : ১১৮ : কত সালে দ্বীনে-ইলাহী প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৮৮২ সালে।

প্রশ্ন : ১১৯ : শাহ আব্দুল আযীয কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ১৮২৮ ইং ৬ই মে।

প্রশ্ন : ১২০ : তাফসীরে ফাতহুর রহমানের রচয়িতা কে?

উত্তর : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.।

প্রশ্ন : ১২১ : কে শায়খুল হিন্দ খেতাবে ভূষিত হন?

উত্তর : মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.।

প্রশ্ন : ১২২ : কখন তাকে এ খেতাবে ভূষিত করা হয়?

উত্তর : ১৯২০ সালের ২০শে মার্চ।

প্রশ্ন : ১২৩ : কোথায় তাকে নির্বাসনে দেওয়া হয়?

উত্তর : মাল্টায়।

প্রশ্ন : ১২৪ : তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন?

উত্তর : কোলকাতার অদূরে নারিকেল বাড়িয়ায়।

সমাপ্ত

বেফাকুল মাদারিস-কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড-এর বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্বলিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর লাভে সহায়ক অনন্য গ্রন্থ

বিদেশী ও স্বদেশী

ফেরাকে বাতেলাহ

প্রশ্নোত্তর সংকলন

সংকলন ও সংগ্রহ

মাওলানা মুহাম্মদ রাশিদুল হক

মুহাদ্দিস, নড়াইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা

ডেমরা, ঢাকা

সম্পাদনায়

হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার পাঠক বন্ধু মার্কেট

১১, বাংলাবাজার ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা

মোবা : ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন : ৭১৬৫৪৭৭

বিদেশী ফেরাকে বাতেলাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্ন–১. বিদ'আতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : আভিধানিক অর্থ, বিদ'আত (البدعة) শব্দটি بدع ধাতুমূল হতে নির্গত। এর মূল অর্থ, পূর্ব নমুনাবিহীন সৃষ্টি করা। আল্লাহর গুণবাচক নাম بديع এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ভাষ্য বিভিন্ন হলেও সকল বক্তব্যের মূল অর্থ এক ও অভিন্ন।

(১) ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন :

اَلْبِدْعَةُ مَا اَحْدَثَ يُخَالِفُ كِتَابًا اَوْ سُنَّةً اَوْ اَثْرًا اَوْ اِجْمَاعًا

"বিদ'আত এমন বিষয় যা কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের আছর এবং ইজমায়ে উম্মতের তরীকার বিপরীতে আবিষ্কার করা হয়েছে।"

(২) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন :

اَلْبِدْعَةُ مَا اَحْدَثَ وَلَيْسَ لَهُ اَصْلٌ فِىْ الشَّرْعِ

"বিদ'আত এমন বিষয়, শরী'অতে যার কোনো ভিত্তি নেই।"

(ফাতহুল বারী : ১৩/২৫৩)

প্রশ্ন–২. বিদ'আতের শরঈ বিধান কী? আলোচনা কর।

উত্তর : বিদ'আত শরী'অতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। সর্বাবস্থায় তা পরিত্যাজ্য।

আল্লামা ইউসুফ লূধিয়ানবী রহ. اختلاف امت اور صراط مستقيم গ্রন্থে লিখেন– বিদ'আত দু'প্রকার।

(১) بدعت اعتقادى বা আকীদাগত বিদ'আত।

(২) بدعت عملى বা আমলী বিদ'আত।

✪ بدعت اعتقادى হচ্ছে এমন আকীদা বা মতবাদ পোষণ করা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন-এর আকীদাবিশ্বাসের পরিপন্থী। যথা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে عالم الغيب ও حاضر ناظر মনে করা, ঈসা আ. মৃত্যুবরণ করেছেন, নবুওয়াতের ধারা এখনো অব্যাহত আছে ইত্যাদি বিশ্বাস পোষণ করা।

✪ بدعت عملى হচ্ছে সাওয়াব লাভের আশায় দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে এমন কোনো আমল গ্রহণ করা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাফে সালেহীনের তরীকার পরিপন্থী। যেমন : মীলাদ, কিয়াম, ওরস, চল্লিশা, কবরের উপর ঘর নির্মাণ, কবরে সামিয়ান টানানো, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি।

✪ بدعت اعتقادى এর শর'ঈ বিধান : কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা যেসব আকীদা ও বিশ্বাস প্রমাণিত আছে, তার পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করলে তা হারাম ও কুফুরী হবে। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে خاتم النبيين বলে বিশ্বাস না করা অথবা তাকে حاضر ناظر ও عالم الغيب মনে করা, পীরকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা, কুরআনের কিছু অংশ এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা।

আর যেসব বিশ্বাস نص صريح বা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়, তবে তা اهل السنة والجماعة এর আকীদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নূরের তৈরি, সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি নন ইত্যাদি –এ ধরনের بدعت اعتقادى গোমরাহী, নাজায়েয। তবে কুফুরী নয়।

✪ بدعت عملى এর শর'ঈ বিধান : যেসব আমল نص صريح বা অকাট্য দলীলের বিপরীত তা হারাম ও না জায়েয। তবে কুফরী নয়। যেমন: কবর পাকা করা, ওরশ করা, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা, ফাতেহাখানী, কুলখানী, চল্লিশা ইত্যাদি করা।

আর যেসব بدعت عملى অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তবে তা اهل السنة والجماعة এর আমলের বিপরীত হয়, তা তা মাকরূহ। যেমন, মাযারে গিলাফ দেওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, জমহূর মুহাক্কিকীনের মতে بدعت حسنة ও بدعت سيئه নামে কোনো বিভাজন নেই। কোনো কোনো আলিমের বক্তব্য থেকে حسنه ও سيئه হিসেবে যে বিভক্তি অনুমিত হয়, সেটা আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ আধিভানিক অর্থে সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়কেই بدعت বলা হয়ে থাকে। চাই সেটা ভালো হোক কিংবা মন্দ। আর শরী'অতের পরিভাষায় যেটা بدعت তার সবটাই মন্দ। এখানে এমন কোনো বিষয় নেই যেটাকে حسنه বা ভালো বলা যাবে। এর দলীল হচ্ছে–

(১) বিদ'আতের নিন্দাবাদে যেসব نص বর্ণিত হয়েছে, সেখানে بدعت শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে:

شَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُـهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"সব নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন সৃষ্ট বিষয়। আর সব নতুন সৃষ্ট বিষয়ই হচ্ছে বিদ'আত।"

(২) সকল বিদ'আতই মন্দ ও নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী সালাফে সালেহীনের ইজমা রয়েছে। এতে কোনোরূপ বিভক্তি নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল, সকল বিদ'আতই سيئه বা মন্দ; بدعت حسنه বলতে কিছু নেই।

প্রশ্ন–৩. বিদ'আতীকে শরী'অতের দৃষ্টিতে কাফির বলা হবে, নাকি গোমরাহ বলা হবে?

উত্তর : বিদ'আতীকে সম্পূর্ণভাবে কাফের বলা যাবে কি-না, এর মধ্যে বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি বেদ'আতী শরী'অতের متواترات (যা বহু সংখ্যক লোকের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে) অথবা ضروريات دين কে (দ্বীনের ওই সমস্ত বিষয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অকাট্য ধারাবাহিকতার সাথে ছাবেত রয়েছে এবং যা দ্বীনে মুহাম্মদী ﷺ-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে সর্বসাধারণ ও জ্ঞানীদের জানা আছে) অস্বীকার করে, তা হলে তাকে কাফের বলা হবে। যেমন: কোনো ব্যক্তি তিন ওয়াক্ত নামায ফরয মনে করলে, সাহাবাদেরকে কাফের মনে করলে, সুন্নাতকে উপহাস করে, শী'আ ইছনা আশারিয়া (১২ ইমাম পন্থী) কর্তৃক তাহরীফে কুরআনের আকীদা পোষণ করলে, কাদিয়ানীদের অনুসারী খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করলে। এদেরকে কাফের বলা হবে। এমনিভাবে যে সমস্ত বিদ'আতীদের আকীদা শিরিকযুক্ত তাদেরকে মুশরিক বলা হবে। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আলিমুল গায়েব বিশ্বাস করা, কোনো পীর বা ওয়ালীকে স্বতন্ত্র ও স্বশক্তিতে দুনিয়াতে তাসাররুফ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন বলে বিশ্বাস রাখা। তারা ব্যতীত সাধারণ বিদ'আতীরা যারা ضروريات دين ও متواترات কে বিশ্বাস করে। কিন্তু سلف صالحين তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা করে। যেমন– মুতাযিলা, খারেজী ও রেজবী ফেরকা। তাদেরকে ভ্রান্ত তো বলা যাবে, কিন্তু কাফের বা মুশরিক বলা যাবে না। যেমন : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন :

ثُمَّ الْبِدْعَةُ وَهِيَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ بِمُكَفِّرٍ كَاَنْ يَعْتَقِدُ مَا يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ اَوْ بِمُفَسِّقٍ وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّهُ لاَ يُرَدُّ كُلُّ مُكَفِّرٍ بِدْعَةً لِاَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِيْ اَنَّ مُخَالِفِيْهِ مُبْتَدِعَةً وَقَدْ تُبَالِغُ فَتُكَفِّرُ مُخَالِفِيْهِ فَلَوْ اُخِذَ ذَالِكَ عَلَى

الْاِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيْرُ جَمِيْعِ الطَّوَائِفِ فَالْمُعْتَمَدُ اَنَّ الَّذِىْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ مَنْ اَنْكَرَ اَمْرًا مُتَوَاتِرًا مِنَ الشَّرْعِ مَعْلُوْمًا مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ وَكَذَا مَنْ اِعْتَقَدَ عَكْسَهُ (شرح نخبة الفكر صـ٧١)

প্রশ্ন–৪. আধুনিক কালের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না, তা ব্যবহার করা কি বিদ'আত বলে গণ্য হবে? যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা কর।

উত্তর : বিদ'আতের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল, যে সমস্ত নব উদ্ভাবিত বস্তু বা যন্ত্রপাতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল না বরং সেগুলো ইবাদত বা দীনের কোনো অংশ নয় এবং তাতে সওয়াবের প্রত্যাশাও করা হয় না। যথা– গাড়ি, মোবাইল, উড়োজাহাজ, মিসাইল, বোমা, পিস্তল ইত্যাদি যদিও শাব্দিক অর্থ হিসেবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তা বিদ'আতে শর'ঈর গণ্ডিতে পড়ে না কয়েকটি কারণে–

(ক) বিদ'আতে শরঈ তো সে সমস্ত নব আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত বস্তুকেই বলা হয়, যা শরী'অতের সদৃশ এবং সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়। আর নব উদ্ভাবিত কোনো যন্ত্রাপাতি দীনের কোনো অংশ নয় এবং তা দীন ও শরী'অতের উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত নয়। সুতরাং নব উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিদ'আতে শর'ঈ নয়।

(খ) তা ছাড়া বিদ'আতে শর'ঈ বলা হয় সে সমস্ত বস্তুকে, যার কোনো প্রমাণ বা ভিত্তি শরী'অতে নেই। যদি কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সাহাবাদের কথা, কাজে কিংবা অনুমোদনে স্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতেও যদি তার প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, তা হলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে না।

সুতরাং জীবনের স্বাচ্ছন্দ লাভের জন্য কিংবা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ যে সকল প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে, তা শাব্দিক অর্থে বিদ'আত হলেও بدعت شرعى বলে গণ্য হবে না। তবে এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যবহারের বৈধতা নির্ভর করবে তার ব্যবহার পদ্ধতি ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ওপর। যদি পদ্ধতি বা উদ্দেশ্য শরী'অত পরিপন্থী হয়, তা হলে তার ব্যবহার বৈধ নয়। অন্যথায় কোনো অসুবিধা নেই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাওয়াবেরও কারণ। যেমন: কেউ যদি ছিনতাই বা ডাকাতির উদ্দেশ্যে পিস্তল তৈরি করে, তা হলে তা অবৈধ ও নাজায়েয আর যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করে, তা হলে সাওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

মওদূদী মতবাদ

প্রশ্ন-৫. মওদূদী মতবাদ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সাহেব ১৩২১ হিজরী, মোতাবেক ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদ প্রদেশের আওরঙ্গাবাদ জেলায় আহমদ হাসান মওদূদীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট উর্দূ সাহিত্যিক, স্বাধীন কলামিষ্ট ও তুখোর রাজনীতিবিদ ছিলেন। অখণ্ড ভারতের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামকে নিয়ে তিনি একসময় জামাতে ইসলামী নামে এক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

একপর্যায়ে তিনি এ সংগঠনের মূলনীতিতে আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা, আম্বিয়ায়ে কিরাম, সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীন সম্বন্ধে এমন কিছু মন্তব্য সংযোজন করেন, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এজন্যই পরবর্তী সময়ে আহলে হক উলামায়ে কিরাম তার সঙ্গ বর্জন করেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী যেসব মন্তব্য তিনি করেছেন এগুলোকেই "মওদূদী মতবাদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন-৬. মওদূদী মতবাদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ কী কী? আলোচনা কর।

উত্তর : মওদূদী মতবাদের কতিপয় ভ্রান্ত আকীদা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

ইসলামী ইতিহাসে যত ভ্রান্ত মতবাদ রয়েছে, তন্মধ্যে অত্যন্ত জঘন্যতম মতবাদ হচ্ছে মওদূদী মতবাদ। ইসলামের আবরণে অত্যন্ত সুকৌশলে এ মতবাদ মানুষের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে চলছে। ইসলামের ইতিহাসে যত সব ভ্রান্ত মতবাদের বিকাশ ঘটেছে, ওইসব মতবাদের কিছু না কিছু অংশ এর মধ্যে রয়েছে।

এ কারণেই মওদূদী মতবাদের ভ্রান্ত আকীদার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। নিম্নে কয়েকটি ভ্রান্ত আকীদা তুলে ধরা হল।

(১) **আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** আল্লাহ তা'আলা জালেম। কেননা যে ক্ষেত্রে নর ও নারীর অবাধ মেলামেশা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ব্যভিচারের কারণে আল্লাহর নির্দেশ 'রজম' প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। (তাফহীমাত : ২/২৮১)

(২) **ফেরেশতাদের সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** ফেরেশতারা ওইসব মাখলূকের মতো যাদেরকে গ্রিক, ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিকরা দেব-দেবী স্থির করেছে। (তাফহীমাত)

(৩) **নবীগণ সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** অন্যদের কথা তো স্বতন্ত্র, প্রায়শঃই পয়গাম্বরগণও তাদের কুপ্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। (তাফহীমাত : ২/১৯৫)

(৪) **নবীজী সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের উর্ধ্বে নন এবং মানবীয় দুর্বলতা থেকেও মুক্ত নন। (তরজমানুল কুরআন : এপ্রিল-১৯৭৬)

(৫) **কুরআনুল কারীম সম্বন্ধে আকীদা :** "কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় "ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদত" এ শব্দ গুলোর যে মৌল অর্থে প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত, বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এর এক পৃষ্ঠা পর লিখেন- এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্প্রীটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে। (কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্‌তিলাহে : ৮-১০)

(৭) **হাদীস সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত সারা আ.-এর ঘটনা সম্বন্ধে বলেন, "এটা একটি মিথ্যা নাটক।" (রাসায়েল মাসায়েল : ৩/৩৬)

তিনি আরো লিখেছেন, "হাদীস তো কতিপয় মানুষ সূত্রে বর্ণিত হয়ে কতিপয় মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কাজেই এ সবের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাতে পারে না। বড়জোর ধারণা জন্মাতে পারে। (তাফহীমাত : ১/৩৫৬)

(৭) **উসূলে হাদীস সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** এ আধুনিক যুগে পূর্ব যুগের বাজে কথা কে শোনে? (তরজমানুল কুরআন ৪র্থ সংখ্যা : ১১১)

(৮) **সাহাবায়ে কিরাম সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি বলে জানবে না এবং তাদের অনুসরণ করবে না। (দস্তুরে জামাতে ইসলামী : ৭)

(৯) **দাড়ি সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** হাদীসে শুধু দাড়ি রাখার হুকুম আছে। সুতরাং পরিমাণ যাই হোক হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে।

(১০) **তাকলীদ সম্বন্ধে মওদূদী আকীদা :** আমার মতে দ্বীনী ইলমে ব্যুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ (মাযহাবের অনুসরণ) শুধু না-জায়েয ও গোনাহ্ নয় বরং এর চেয়েও জঘন্যতম। (রাসায়েল মাসায়েল : ১/২৪৪)

উপরোক্ত আকীদাসমূহ ছাড়াও তার আরো অনেক ভ্রান্ত আকীদা রয়েছে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হল।

প্রশ্ন-৭. সাহাবীগণের মিয়ারে হক হওয়া সম্পর্কে তাদের আকীদা কী ?

উত্তর : মওদুদী সাহেব ও তার অনুসারীদের আকীদা হচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক নন।

প্রশ্ন-৮. তাদের এ আকীদা-বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো কি কি?

উত্তর : মওদুদী সাহাবের লিখনীতে এর বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন : তিনি দস্তুরে জামাতে ইসলামী ৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

رسول خداکے علاوہ کسی کو معیار حق نہ سمجھو، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھو۔

মওদুদী সাহেব ও তার অনুসারীরা তাদের এ দাবির স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করে থাকে। যেমন :

১. কুরআন ও হাদীসে সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মিয়ারে হক হওয়ার কথা কুরআন ও হাদীসের কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

২. অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাযি. হতে এমন এমন মারাত্মক গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে. যা সাধারণ মানুষ থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। তা হলে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষ ও সাহাবায়ে কিরামের মাঝে পার্থক্য কোথায়? অবশ্য তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং দ্বীনের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁদেরকে মিয়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি মানা যায় না।

৩. সাহাবায়ে কিরামকে যদি সত্যের মাপকাঠি মানা হয় এবং ঈমান-আমল তথা সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে আদর্শ ও নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে তাঁদের সবকিছুই আমাদের জন্য অনুসরণ যোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে তাদের থেকে যেসব গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর কি হবে? সেগুলোরও কি অনুরসণ করতে হবে আমাদের ? নিশ্চয় সকলেই এর জবাবে বলবে মোটেই না। এর দ্বারা বুঝা যায়, যারা সাহাবায়ে কিরামের মিয়াতে হক হওয়ার দাবিদার, তারাও প্রকারান্তে তাঁদেরকে মিয়ারে হক হিসেবে গণ্য করছেন না।

৪. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একদল অপরদলকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। সুতরাং উভয় দলই মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীরা সত্যের মাপকাঠি কিভাবে হয়?

৫. সাহাবীগণ লড়াই করে একে অপরকে হত্যা করেছেন। সুতরাং হত্যাকারী কিভাবে মিয়ারে হক হবে ?

এসব বিষয়াদীর প্রতি চিন্তা করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত যে, সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই অত্যন্ত মার্যাদার অধিকারী, তবে তাঁরা মিয়ারে হক নন।

প্রশ্ন–৯. কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ কর যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. মিয়ারে হক ছিলেন।

উত্তর : কুরআনের বহু আয়াত এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীস দ্বারা একথাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন মিয়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি। নিম্নে মাত্র কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হল।

কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক হওয়ার প্রমাণ

(১) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ .... وَلَا الضَّالِّيْنَ

অর্থ : আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথ দেখাও! ওই সকল লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছে। তাদের পথ নয় যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট। (সূরা ফাতিহা)

উক্ত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, "منعم عليهم" তথা যাদেরকে তিনি নেয়ামত দান করেছেন, তাদের পথই হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম। অপর এক আয়াতে منعم عليهم দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এর বিবরণ দিতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে–

فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ـ (النساء -٦٩)

এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা শহীদ সিদ্দীক ও সালেহীনের পথ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাহাবীগণই ছিলেন এর প্রথম মিসদাক।

২. وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

উক্ত আয়াতে দুই শ্রেণীর সাহাবায়ে কিরামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : এক মুহাজিরীন দুই আনসার। এ উভয় শ্রেণী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর একথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, যাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন, তাঁরা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য মিয়ারে হক হবেন। যাতে সেপথে চলে সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

৩. فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ـ

অর্থ : তারা যদি তোমাদের তথা সাহাবাদের ঈমানের মতো ঈমান আনত, তা হলে তারা হেদায়াত পেয়ে যেত। (সূরা বাকারা)

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সহীহ ঈমান যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে, তার মিয়ার ও মাপকাঠি হল সাহাবায়ে কিরামের ঈমান। যে ঈমান তাঁদের ঈমানের মতো হবে, সে ঈমানই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈমান তাঁদের ঈমানের মতো হবে না, সে ঈমানই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সারকথা, উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে ঈমান তাদের ঈমানের মতো হবে, সেটাই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈমান তাঁদের ঈমানের মতো হবে না তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এতেও প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক।

হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক হওয়ার প্রমাণ

৪. রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন :

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً قِيْلَ مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ (رواه الترمذى ، مشكوة صـ٣٠)

"বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। কেবলমাত্র একটি দল ব্যতীত তারা সকলেই হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ! সেই নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি ? রাসূলে কারীম ﷺ উত্তর দিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যে তরীকা ও আদর্শের উপর আছি, এর উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাঁরাই হবে নাজাতপ্রাপ্ত দল। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান-আমল তথা দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক। তাদের তরীকাই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির সনদ।

৫. رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন : আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য। তাদের মধ্যে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াত পেয়ে যাবে।"

৬. وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ـ

"তোমরা আমার ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।"

উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরামের মাঝে প্রত্যেকেই মিয়ারে হক তথা সত্যের মাপকাঠি ছিলেন। সারকথা, উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীসের আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক। যারা তাঁদেরকে মিয়ারে হক মানবে না, তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

এনজিও (N.G.0)

প্রশ্ন-১০. এনজিও বলতে কি বুঝ? আমাদের দেশে দেশী-বিদেশী এনজিওর সংখ্যা কত এবং তাদের কর্মতৎপরতা কি? আলোচনা কর।

উত্তর : এনজিও হচ্ছে ইংরেজি বাক্য "নন গভর্মেন্ট অর্গানাইজশ"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে "বেসরকারী সাহায্য সংস্থা"। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী যেসব সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনে, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিংসা, অনুদান, ঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদেরকে এন.জি.ও বলা হয়। এ হিসেবে ইসলামিক, অনৈসলামিক সব সংস্থাকে এন.জি.ও বলা যায়। তবে বর্তমান পরিভাষায় এন.জি.ও বলে বিধর্মী ও খ্রিষ্টানদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সেসব প্রতিষ্ঠানকেই বুঝানো হয়। যারা বাহ্যিক সেবার মুখোশ পরে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও ইসলামী চিন্তা-চেতনা এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের পাঁয়তারায় লিপ্ত রয়েছে।

✪ বর্তমানে (২০০৩) বাংলাদেশে দেশী-বিদেশী রেজিস্ট্রেশনভুক্ত এন.জি.ও-র সংখ্যা ছয় সহস্রাধিক এবং রেজিস্ট্রেশনহীন এন.জি.ও-র সংখ্যা সাড়ে আটশত। (বাংলাদেশে ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া, এনজিও কাহিনী লাঞ্ছিত মহিলা : ১৯)

তবে বিগত ৩১/৫/০৫ সনের হিসাব অনুযায়ী নিবন্ধিত এন.জি.ও-র সংখ্যা ১৯৫৩টি আর নিবন্ধন ছাড়া প্রায় তিপ্পান্ন হাজার। (ইনকিলাব)

এন.জি.ও-দের কর্মতৎপরতা

✪ এনজিওদের কর্মকাণ্ড কেবল সেবার মধ্যেই সীমিত থাকবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের এনজিওগুলো কি তাই করছে? নিশ্চয় না। যদিও তারা বাহ্যত নিজেদেরকে দুস্থ মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে প্রকাশ করছে, কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য কি, তা বর্তমানে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। কর্জ প্রদানের নামে তারা গরীব দুঃখীদের নিকট থেকে চড়া মূল্যে সুদ উসুল করে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে ফেলছে। ফ্রি চিকিৎসা, খাদ্যবস্তু ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে অসহায় জনসাধরণকে নিজেদের আয়ত্তে এনে তাদের মূল্যবান ঈমান-আকীদা ধ্বংস করছে। তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকল্পে মহিলাদেরকে ব্যাপকহারে চাকরি দিয়ে পাশ্চত্যের নোংরা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে তুলছে বিভিন্নভাবে আর এর মাধ্যমে তারা মুসলমানবদের পারিবারিক অবকাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ দেশের সরলমনা মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারা খ্রিষ্টধর্মের উপর লেখা বিভিন্ন বই-পুস্তক বিনা মূল্যে

বিতরণ করে এর মাধ্যমে তারা এ পর্যন্ত বহু মানুষকে খ্রিষ্টান বানাতে সক্ষমও হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমানে এসব এন.জি.ও গোষ্ঠী আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে।

মোটকথা, বর্তমান এনজিওদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তারা এ দেশকে একটি খ্রিষ্টরাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন-১১. আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের নগ্ন হামলা ও অপতৎপরতার উপর একটি প্রতিবেদন পেশ কর।

উত্তর : সেবার ছদ্মাবরণে এনজিও চক্র আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নানাভাবে আঘাত হানছে। এরা সেবার মাধ্যমে অসহায় জনসাধারণকে নিজেদের আয়ত্তে এনে তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হেনে বক্তব্য দিয়ে চলছে এবং আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কিরামের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের থেকে দ্বীন শিখতে আগ্রহী না হয়।

এসব এনজিও চক্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য স্কুল স্থাপন করে মুসলিম শিশু-কিশোরদের অন্তরে খ্রিষ্টবাদের বীজ বপন করছে। যেন পরবর্তীসময়ে এরাই ইসলামের বিরোধিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ছাড়াও তারা সমান অধিকারের বুলি আওড়িয়ে মুসলিম নারীদেরকে পর্দার ভিতর থেকে বাইরে এনে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের বিভিন্ন প্রকল্পে মেয়েদেরকে চাকরির নামে তাদেরকে বাইসাইকেল, মটরসাইকেল ইত্যাদিতে চড়ে অফিসে আসা-যাওয়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। এসবের মাধ্যমে তারা সমাজে বেহায়াপনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং মুসলিম যুবক ও যুবতীদের অমূল্য সম্পদ চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এভাবে তারা আমাদের নৈতিক ও চারিত্রিক মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেওয়ার অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে।

এর পাশাপাশি বর্তমানে তারা আমাদের দেশের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছে। রাজনীতিতে তাদের অপতৎপরতার ফলে জাতীয় রাজনীতি আজ বিপর্যস্ত। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় আমাদের দেশের রাজনীতিতে তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারা তাদের বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে একটি বিশেষ পক্ষকে সমর্থন করে তাদের স্বপক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালায় এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভোটারদেরকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় পার্বত্য অঞ্চল থেকে

নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য ছিল মার্কিন এনজিও সংস্থা "ওয়ার্ল্ড ভিশন" এর কর্মকর্তা। এ ছাড়াও তারা বর্তমানে আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ব্যাপকভাবে অংশ নিচ্ছে।

এভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের অপতৎপরতার ফলে দেশের রাজনীতি ক্রমেই বিপর্যয়ের দিকে এগুচ্ছে। এতে দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

✪ এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার। ✪ বৃক্ষ রোপণ ৪কোটি।

✪ পরিবারের সংখ্যা ৪৫ লাখ। ✪ বিদ্যালয় এবং স্কুলের সংখ্যা ৩০ হাজার এবং ছাত্র-ছাত্রী ১০ লাখ। ✪ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৪৪ লাখ।

(বাংলাদেশ ধর্মান্তারের খোলা হাওয়া, এনজিও কাহিনী লাঞ্ছিত নারী : ১০)

কাদিয়ানী ধর্মমত

প্রশ্ন-১২. কাদিয়ানী ধর্মমত কি এবং কে কখন তা প্রতিষ্ঠা করে ? তাদেরকে কাদিয়ানী নামকরণের কী কারণ? তাদের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।

উত্তর :

ভূমিকা : ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীর হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাদেরই সার্বিক সহযোগিতায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামক এক ভণ্ড প্রতারক নিজেকে নবী বলে দাবি করে ইসলামের বহু মৌলিক আকীদার পরিপন্থী কিছু মনগড়া ভ্রান্ত আকীদার সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মমতের গোড়াপত্তন করেছিল। এ ধর্মমতকেই কাদিয়ানী ধর্মমত বলা হয়।

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকাল

বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানের অধিবাসী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৮০ সালে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি বিভিন্ন বিষয়ের ইলহাম নাযিল হয় বলে নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করে এক নতুন ধর্মের সূচনা করে।

অবশেষে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানা নামক স্থানে আনুষ্ঠানিকতার সাথে তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করার ঘোষণা দেয় এবং সে দিন তার হাতে চল্লিশ জন ভক্ত বাই'আত গ্রহণ করে। কাদিয়ানীদের ভাষায় এখান থেকেই আহমদী সিলসিলার ধারাবাহিকতা শুরু হয়। সুতরাং ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সালকেই কাদিয়ানী ধর্মমতের উদ্বোধনী দিবস বলা যেতে পারে।

✪ কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুরের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই তাকে তার

জন্মভূমি কাদিয়ানের দিকে লক্ষ্য করে কাদিয়ানী বলা হয় এবং যারা তার অনুসারী, তাদেরকে তাদের ধর্মীয় গুরু মির্যা কাদিয়ানীর নামে "কাদিয়ানী" বলে নামকরণ করা হয়।

✪ এ ধর্মমতের গোড়াপত্তনের পর থেকে নিয়ে মির্জা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীরা তার এ ভ্রান্ত ধর্মের প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকে। এর মাধ্যমে তারা অনেক সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। মির্জা কাদিয়ানী তার মৃত্যু পর্যন্ত তার ধর্মের প্রচারকার্য চালিয়ে যায়। তার মৃত্যুর পর তার অন্যতম সহযোগী হাকীম নুরুদ্দীন তার খলীফা নিযুক্ত হয়। সেও মৃত্যু পর্যন্ত একই কাজে নিয়োজিত থাকে। তখন পর্যন্ত এ ভারত উপমহাদেশের বাইরে এ ধর্মের তেমন প্রসার ঘটে নি। হাকীম নুরুদ্দীনের মৃত্যুর পর খিলাফত নিয়ে মির্জাপুত্র বশিরুদ্দীন মাহমূদ ও মৌলভী মুহাম্মদ আলীর মাঝে দ্বন্দ্ব হয়।

তবে পরিশেষে মির্জাপুত্র বশিরুদ্দীনই খলীফা নিযুক্ত হয়। সে দীর্ঘদিন এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। এ সময়ে সে ইহুদি খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারের বিরাট সুযোগ লাভ করে। সেসময়ই উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে এ ভ্রান্ত ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

মির্জা বশিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর পুনুরায় খিলাফত নিয়ে মির্জা নাসিরের ভাই মির্জা তাহের ও মির্জা রফী আহমেদের মাঝে দ্বন্দ্ব হয় এবং উভয়ের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। পরিশেষে মির্জা তাহেরই খলীফা নিযুক্ত হয় এবং এখনো পর্যন্ত তাঁর সহযোগীরা সমগ্র বিশ্বে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচার করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন–১৩. কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো কী কী? উল্লেখ কর।

উত্তর : কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসসমূহ

১. 'কাদিয়ান' [নামক স্থানটি] মক্কার মতো পবিত্র। (حقيقة النبوة ص ٠١)

২. মির্জা কাদিয়ানী মর্যাদার দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমতুল্য বরং মির্জা কাদিয়ানী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী। (نعوذبالله)

৩. কাফের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। (تشحيذ الاذهان ص ١٠)

৪. হযরত ঈসা আ. ইনতিকাল করেছেন। 'তিনি জীবিত আছেন' এ ধারণা করা সম্পূর্ণ কুফরী। সুতরাং কেয়ামতের পূর্বে তাঁর দুনিয়ায় পুনরায় আগমনের কথা চরম ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। (حقيقة الوحى)

৫. হযরত ঈসা আ. ও হযরত মাহদী আ.-কে পৃথক পৃথক ব্যক্তি বলে ধারণা করা নিছক ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মির্জা কাদিয়ানীই হচ্ছে প্রতিশ্রুত ঈসা ও মাহদী। (معاذ الله)

৬. জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন জিহাদ করা সম্পূর্ণ হারাম।
৭. নবীর উপর নাযিলকৃত কুরআন রহিত হয়ে গেছে।

خطبة الهاميه ص ٢٥، اعجاز احمدى،

৮. মির্জা কাদিয়ানী স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুগত দলে অংশগ্রহণকারীরা সাহাবা। এ সম্বন্ধে সে নিজেই লিখেছে-

صَارَ وُجُوْدِیْ وُجُوْدُهٗ فَمَنْ دَخَلَ فِیْ جَمَاعَتِیْ دَخَلَ فِیْ صَحَابَةِ سَیِّدِ خَیْرِ الْمُرْسَلِیْنَ وَمَنْ فَرَّقَ بَیْنِیْ وَبَیْنَ الْمُصْطَفٰی فَمَا عَرَفَنِیْ وَمَا رَاٰی

(خطبة الهاميه در خزائن : ٢٥٨-٢٥٦)

৯. মির্জা কাদিয়ানীর দাবিকৃত ওহি, শিক্ষা ও তা'লীমই মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। (খাযাইন : ১৪/৪০৫)
১০. মির্জা কাদিয়ানীর দাবিকৃত ইলহামসমূহ কুরআনের মতোই সুনিশ্চিত ও অলংঘনীয়। (হাকীকাতুল ওহী, খাযায়েন : ২২/২২০)
১১. মির্জা কাদিয়ানীকে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া ইসলাম ধর্ম অভিশপ্ত ও শয়তানী মতবাদ। (খাযাইন : ১১/৩০৬)
১২. মির্জা কাদিয়ানীর উপর ঈমান না আনলে কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে ও জাহান্নামে যেতে হবে। (তাযকিরাহ : ৩৩৬)
১৩. ঈসা আ.-এর জীবিত থাকার বিশ্বাস করা শিরকে আজীম বা মস্ত বড় শিরক। (জমীমা হাকীকাতুল ওহী, খাযায়েন : ৬৬)
১৪. মির্জা কাদিয়ানীই স্বয়ং প্রতিশ্রুত মাসীহ ও প্রতিশ্রুত মাহদী এবং কালের মুজাদ্দিদ। (খাযাইন : ১৯/৮৯)
১৫. জিহাদের বিধান রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তা হারাম। (খাযাইন : ১৭/৪৪৩)
১৬. কাদিয়ানের বাৎসরিক জলসা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত জিল্লী হজ্ব। (কাদিয়ানী মাযহাব : ৪৪৫)
১৭. দুনিয়াতে অমুসলিমদের নিপাতকারী কোনো প্রতিশ্রুত মাহদী আসবে না। (তাযইনায়ে ইবরত : ১১৪)
১৮. মির্জা সাহেবের বিবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণের মতো উম্মুল মুমিনীন। (কাদিয়ানী মাযহাব)
১৯. কাদিয়ান মক্কার মতো পবিত্র ভূমি এবং প্রতিচ্ছবি কিবলা।
২০. لا اله الا الله محمد الرسول الله রহিত হয়ে গেছে। এ কালেমা পড়ে বর্তমানে কেউ ঈমানদার হতে পারে না। (কালিমাতুল ফজল, এক গলতী কা উজালা)
২১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত কুরআন রহিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের লোকদের জীবনবিধান হবে গোলাম আহমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব "আল বুশরা"। (এক গলতী কা ইজালা)

প্রশ্ন–১৪. খতমে নবুয়ত বলতে কি বুঝ? এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আকীদা কী? তা উল্লেখ করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে তাদের ভ্রান্তি প্রমাণ কর।

উত্তর : জীন ও ইনসানের হেদায়াত ও তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণের যে ধারাবাহিকতা হযরত আদম আ. এর মাধ্যমে শুরু করেছিলেন, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে নবুওতের ওই ধারাবাহিকতাকে চিরদিনের জন্য সমাপ্ত করে দিয়েছেন। নবুয়্যতের ওই ধারবাহিকতা সমাপ্ত করে দেওয়াকেই "খতমে নবুওয়াত" বলা হয়।

✪ এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের আকীদা হচ্ছে, "নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে গেছে" এ কথা ঠিক নয় বরং নবী প্রেরণের এ ধারাবাহিকতা তাঁর পরেও জারি রয়েছে। সে হিসেবে মির্জা কাদিয়ানীও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নবী ও রাসূল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরে প্রেরিত হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে আকরাম ﷺ খাতামুল আম্বিয়া তথা সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পর আল্লাহর পক্ষ হতে আর কোনো নবী প্রেরিত হবে না। সুতরাং তাঁর পর অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ কুফরী।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে –

১. مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ

"মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের মধ্য হতে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী।" (সূরা আহযাব)

উক্ত আয়াতে خاتم النبين বলে পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ সমস্ত নবী ও রসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পর আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না।

কুরআনে কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

২. وَمَا اَرْسَلْنٰكَ إِلاَّكَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

"(হে নবী!) আমি আপনাকে সকল মানুষের কাছে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা সাবা)

৩. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রসূল (হিসেবে প্রেরিত হয়েছি)।" (সূরা সাবা)

উপরোক্ত দুটি আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবজাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত রসূল।

এ ধরনের বহু আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই কিয়ামত অবধির জন্য আল্লাহর মনোনীত সকলের রসূল। তিনিই সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই। অনুরূপভাবে প্রায় দুই শতাধিক হাদীস দ্বারাও এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

৪. إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضَعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ يَتَعَجَّبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

"আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদারহণ এরূপ, যেমনি কোনো ব্যক্তি একটি প্রাসাদ তৈরি করল এবং তাকে খুব সৌন্দর্যমণ্ডিত করল কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকজন ঘরটির চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে লাগল এবং (এর নির্মাণ কৌশল দেখে) বিস্মিত হতে লাগল এবং (সেই ঘরের মালিককে) বলতে লাগল : কেন আপনি এ ইটটি স্থাপন করেন নি ? (তা হলে নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে যেত) রসূলে আকরাম ﷺ বলেন : আমিই সেই সর্বশেষ ইট এবং আমিই হলাম সর্বশেষ নবী।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫. فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ .... وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ

"আমাকে সকল নবীগণের ওপর ছয়টি বিষয়ের দ্বারা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ...... তন্মধ্যে একটি হল, আমার দ্বারা নবী-রসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।"

৬. أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ

"আমি সর্বশেষ নবী ও তোমরা সর্বশেষ উম্মত।" (ইবনে মাজাহ)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রসূলে আকরাম ﷺ-ই সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পর আর কোনো নবী-রসূল নেই। সুতরাং কাদিয়ানীদের ইজরায়ে নবুয়্যত তথা নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার আকীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ইসলাম পরিপন্থী।

শী'আ মতবাদ

প্রশ্ন–১৫. শী'আ কারা? তাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর : শী'আ (شيعه) শব্দের আভিধানিক অর্থ– দল, অনুসারী, সমর্থক ও সাহায্যকারী। ইয়ামানের জনৈক ইহুদি আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার অনুসারীদেরকে শী'আ বলা হয়; যারা আহলে বাইতের ভালবাসার নামে সর্বপ্রথম মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল।

✪ হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতের শেষ দিকে ইহুদি বংশোদ্ভূত জনৈক আলেম আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি এবং ইসলামকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষ্যে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণের অভিনয় করে। এরপর প্রথমে সে নিজেকে একজন পাকা মুসলমান হিসেবে মানুষের সামনে প্রকাশ করে। এভাবে কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর শুরু করে সে তার মূল ষড়যন্ত্র।

এ ক্ষেত্রে সে মুসলমানদের কাছে অতি সম্মানের পাত্র আহলে বাইতের অন্যতম ব্যক্তি হযরত আলী রাযি. -এর নাম ব্যবহার করে। সে প্রথমে হযরত আলী রাযি. সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদার প্রচারণা চালায় এবং প্রচার করতে থাকে, হযরত আলী রাযি. যেহেতু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয় ও জামাতা, তাই খেলাফতের প্রথম উত্তরাধিকারী তিনিই। এর পাশাপাশি সে হযরত উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেতে শুরু করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালায়।

হযরত উসমান রাযি. তার সম্পর্কে জেনে ফেললে সে মদিনা ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে বসরায়, তারপর কুফায় এরপর সিরিয়ায় গমন করে। সর্বশেষে মিশরে গিয়ে সে নিজের অনুসারী একটি সংঘবদ্ধ দল গঠন করতে সক্ষম হয়। এদিকে সে প্রতিটি শহরেই তার ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ফলে তার চলে যাওয়ার পর উক্ত শহরে তার ষড়যন্ত্রের কার্যক্রম চালু থাকে। এভাবে অল্প দিনেই তার ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে পড়লে একসময় সে তার অনুগতদের নিয়ে মদিনায় চলে আসে।

সে সময় হযরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী রাযি. আর অপর ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মু'আবিয়া রাযি.। উক্ত সাবাই চক্র আপন ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে মুসলমানদের মাঝে তুমুল লড়াই বাঁধিয়ে দেয়। এ লড়াইয়ে শত শত সাহাবা ও তাবেঈন শাহাদাতবরণ করেন। এ সময় ইবনে সাবা ও তার অনুসারীরা বাহ্যত হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষ নিয়ে হযরত মু'আবিয়া রাযি. ও তার সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে

কুৎসা রটনায় অতি বাড়াবাড়ি শুরু করে এবং হযরত আলী রাযি.-এর বিপক্ষীয় সকল সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈকে কাফের ও মুরতাদ বলে সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করতে থাকে। হযরত আলী রাযি. তাদের এ হেন বাড়াবাড়িকে মোটেই প্রশ্রয় দেন নি বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে তারা হযরত আলী রাযি. থেকে আলাদা হয়ে আফ্রিকায় চলে যায় এবং তথাকার কিছু অঞ্চল নিয়ে খেলাফতে বনী ফাতেমী নামে একটি পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। কালক্রমে তাদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এরাই ইতিহাসে শী'আ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন–১৬. শী'আদের মৌলিক আকীদাগুলো কি কি? এ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ কর।

উত্তর : শী'আদের মৌলিক আকীদা এবং সে ক্ষেত্রে ইসালামী দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ :

১. **আকীদায়ে ইমামত :** তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর উম্মতের হেদায়াতের জন্য ইমামতের সিলসিলা জারী করে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বার জন ইমাম নির্ধারণ করেছেন। এ ইমামগণ নবীদের মতোই আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত।

তাঁরা সকলেই মানুষ ও মর্যাদার দিক দিয়ে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমান ও অন্যান্য নবীদের চেয়ে ঊর্ধ্বে। নবীদের মতো তাদের কাছেও ফেরেস্তা আসা-যাওয়া করে এবং তাঁদের প্রত্যেকেই আপন মৃত্যু সম্পর্কে অবগত ছিল। (معاذالله)

✪ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

ক. আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর পর উম্মতের হেদায়াতের জন্য অন্য কোনো নতুন নবী বা ইমামের মোটেও প্রয়োজন নেই।

খ. নবীগণ হলেন মানব জাতির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। কোনো মানুষ যত বড় আল্লাহ ওয়ালাই হোক না কেন, নবীগণের সমকক্ষ হতে পারবে না।

গ. মানবজাতির মধ্যে একমাত্র নবীগণই হলেন মাসুম বা নিষ্পাপ একমাত্র তাঁদের কাছেই ফেরেস্তা আসা-যাওয়া করত এবং তাদের উপরই কিতাব নাযিল হত।

ঘ. নবীগণ ছাড়া অন্য কেউই কোনো বস্তুকে হালাল বা হারাম করার অধিকার রাখে না। মানবজাতির মধ্যে কেউই আপন মৃত্যু সম্পর্কে অবগত নয়। এমনকি নবী-রসূলগণও নন।

২. আকীদায়ে তাহরীফে কুরআন

তাদের মতে বর্তমানে আমাদের কাছে যে কুরআন রয়েছে, তা সেই অবিকৃত কুরআন নয়, যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল হয়েছিল বরং এতে যথেষ্ট পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর যারা জবরদস্তি করে খেলাফতের অধিকারী হয়েছিল, তারা কুরআনের ওইসব আয়াতগুলোকে কুরআন থেকে সরিয়ে ফেলেছে, যেগুলোতে হযরত আলী ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণের ইমামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

✪ **ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :** কুরআনে কারীমকে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করে নিজেই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে এতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারো নেই। ঠিক যেভাবে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাযিল হয়েছিল, সেভাবেই এ কুরআন আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে।

৩. আকীদায়ে ইরতেদাদে শাইখাইন বা ইরতেদাদে সাহাবা

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীদের সামনে হযরত আলী রাযি.-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ওফাতের পর হযরত আবু বকর ও উমর রাযি.-সহ সকল সাহাবা (মাত্র কিছুসংখ্যক সাহাবা ব্যতীত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ লঙ্ঘন করে মুরতাদ হয়ে গেছে।

✪ **ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :** সকল সাহাবী মাহফুয ছিলেন। তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তারা ধন্য হয়েছেন। কুরআন মজীদে তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তারা ছিলেন উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমানদার। তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে কুফুরীর কল্পনা করা যেতে পারে? যারা তাদেরকে কাফের বলবে, তারাই কাফের বলে গণ্য হবে।

৪. আকীদায়ে তাকিয়্যাহ : তাকিয়্যাহ অর্থ হল, মিথ্যা বলা। ছোট-বড় যে কোনো সামস্যার জন্য কিংবা যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অন্তরে কোনো কথা লুকিয়ে রেখে তার বিপরীত প্রকাশ করা তাদের মতে শুধু জায়েযই নয় বরং অনেক সাওয়াবের কাজ। তাদের মতে তাদের ইমামগণও তাই তাকিয়্যাহর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

✪ **ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :** একান্ত অপারগতা ছাড়া মিথ্যা বলা মোটেই বৈধ নয় বরং জঘন্যতম কবীরা গুনাহ। কোনো দ্বীনদার বুযুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে "তিনি মিথ্যা বলেন" ধারণা রাখা নিতান্ত গোমরহী বৈ কিছু নয়।

৫. আকীদায়ে বাদা : "বাদা" অর্থ হল, ভুল হওয়া, ভবিষ্যতের কোনো বিষয় সম্পর্কে অজানা বা অস্পষ্ট থাকার কারণে আল্লাহর বাদা অর্থাৎ ভুল হতে পারে।

✪ **ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :** আল্লাহ তা'আলা হলেন আলিমুল গায়িব, বর্তমান ভবিষ্যত তাঁর কাছে সমান। তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। কোনোকিছুই তাঁর কাছে বিন্দু পরিমাণও অস্পষ্ট নয়। সুতরাং তাঁর থেকে ভুল হওয়ার কল্পনাই করা যায় না।

৬. আকীদায়ে মুত'আ : যে কোনো নারী-পুরুষ পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কোনো প্রকার স্বাক্ষী-প্রমাণ ব্যতীত কিছু নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। যাকে বলা হয়, মুত'আ বিয়ে। এরূপ মুত'আ শুধু হালালই নয় বরং নামায-রোযা ইত্যাদির মতো ইবাদতও বটে।

✪ **ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :** নেকাহে মুত'আ ইসলামের প্রথম দিকে জায়েয থাকলেও পরবর্তীকালে তা কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সম্পূর্ণ হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন শরী'অতসম্মত বিবাহ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ।

প্রশ্ন–১৭. শী'আদের আকীদাসমূহের ভ্রান্তি কুরআন-সুন্নাহের আলোকে প্রমাণ কর?

উত্তর : শী'আদের আকীদাগুলো ইসলামের মৌলিক আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং তা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের আকীদাসমূহের ভ্রান্তি প্রমাণ করা হল।

১. আকীদায়ে ইমামত : শী'আদের আকীদাসমূহের মাঝে অন্যতম আকীদা হল এ আকীদায়ে ইমামত। কুরআন-সুন্নাহর কোথাও এ আকীদার সামান্যতম বর্ণনা নেই। ইমাম সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্থাৎ "তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত মাছুম ও ওহীপ্রাপ্ত এবং যে কোনো বস্তুকে হালাল বা হারাম করার অধিকারপ্রাপ্ত" ইত্যাদি সবই কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

"ওই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে ? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে!"

২. আকীদায়ে তাহরীফে কুরআন : কুরআনে কারীম অবতীর্ণ করে এর হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر -٩)

"আমি এ উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর : ৯)

সুতরাং কুরআন বিকৃত হওয়ার আকীদা রাখার অর্থ হচ্ছে, মূলত আল্লাহর ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা কিংবা অক্ষমতার আকীদা রাখা, যা চরম ধৃষ্টতা ও নেহায়াত গোমরাহী মাত্র।

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে–

لاَ يَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

"এতে অর্থাৎ কুরআনে বাতিলের আগমন ঘটতে পারে না। না সামনের দিক থেকে আর না পিছন দিক থেকে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।" (সূরা হা-মীম সাজদা : ৪৬)

৩. **আকীদায়ে ইরতেদাদে শাইখাইন :** রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতৃক হযরত আলী রাযি.-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন আর এর উপর ভিত্তি করে "ইরাতেদাদে শাইখাইন"-এর আকীদাও সম্পূর্ণ বানোয়াট। কারণ, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ـ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও সর্বপ্রথম এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে ইহসানের সাথে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (সূরা তওবা : ১১০)

অন্য আয়াতে সকল সাহাবায়ে কেরামের সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার কথা ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا؛ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ـ

"এবং যারা ঈমান এনেছে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে তাঁরাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।" (সূরা আনফাল)

রসূলে আকরাম ﷺ সাহাবাদের ব্যাপারে অশালীন বাক্য উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন : لَاتَسَبُّوْا اَصْحَابِىْ

"আমার সাহাবীদেরকে তোমরা মন্দ বলো না।"

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ.

"আমার সাহাবাদের (কে অশালীন কথা বলার) ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাদেরকে (শত্রুতার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না।"

৩. **আকীদায়ে তাকীয়্যাহ :** তাকিয়্যাহ তথা মিথ্যাচার শরী'অতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ। একান্ত অপারগতা ছাড়া তা মোটেও বৈধ নয়। সুতরাং তা সাওয়াবের কাজ হওয়া তো দূরের কথা, শরী'অত এটিকে কবীরা গুনাহ ও মুনাফিকদের আলামত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثَةٌ اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ،

"মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক. যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। দুই. যখন সে ওয়াদা করে, পূরণ করে না। তিন. যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে।

৪. **আকীদায়ে বাদা :** কোনো বিষয় সম্পর্কে অজানা বা অস্পষ্ট থাকার কারণে আল্লাহর থেকে বাদা অর্থাৎ ভুল হতে পারে। এরূপ আকীদা কুরআনের অসংখ্য আয়াতের সঙ্গে পুরোপরি সাংঘর্ষিক। কুরআনে পাকে আল্লাহর তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا

"আর তিনি (আল্লাহ তা'আলা) জল-স্থলে যা কিছু আছে, সবকিছু জানেন। যে-কোনো পাতা ঝরে, তা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পরিপূর্ণ অবগত।"

৫. **আকীদায়ে মুতা'আ :** মুত'আ ইসলামের প্রথম দিকে জায়েয থাকলেও পরবর্তী সময় তা সর্বকালের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মুত'আকে সাওয়াবের কাজ মনে করা মস্তবড় অন্যায় ও কবীরা গুনাহ।

মুত'আর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে,

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

"রাসূলে আকরাম ﷺ খাইবারের যুদ্ধের দিন নেকাহে মুত'আ থেকে নিষেধ করে দিয়েছেন।"

স্বদেশী ফেরাকে বাতেলাহ

সুরেশ্বরী পীর ও তার আকীদা

নাম পরিচিতি : সুরেশ্বর হচ্ছে "সুর+ইশ্বর"-এর সন্ধিরূপ। তার ভক্তবৃন্দের মতে তিনি সুরকে খুব ভালবাসতেন। সুরের মুর্ছনায় পরমাত্মার মাঝে লীন হয়ে যেতেন। ফলে তার ভক্তবৃন্দরা তাকে সুরের ইশ্বর বা সুরেশ্বর নামে অভিহিত করেন। প্রকৃত নাম শাহ্ সূফী সৈয়দ আহমদ আলী। ডাক নাম হযরত সূফী সৈয়দ জান শরীফ। তবে তিনি সুরেশ্বরী পীর নামেই সমধিক পরিচিত। শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন সুরেশ্বর গ্রামে তার জন্ম। পিতার নাম শরীফ শাহ্ মেহেরুল্লাহ। জন্মতারিখ ২রা অগ্রহায়ণ ১২৬৩ বাং, মোতাবেক ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

আহমদ আলী থেকে সুরেশ্বরী পীর : তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। ১০ বছর বয়সে বাই'আত হন শাহসূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াহসীর হাতে। খেলাফত পান ১৭ বছর বয়সে। তাকে খেলাফত প্রদানকালে ওয়াহসী বলেন, হে বাবা জান শরীফ! আমি দেখছি, আরশে মু'আল্লায় আপনার নাম শাহ আহমদ আলী লেখা হয়েছে। আজ থেকে আপনাকে এ লকব প্রদান করা হল। আপনাকে কুতুবুল এরশাদের নেসবত দেওয়া হল। আপনার লেখায় যে আহমদী ভাব ও নূরী ধর্মের বিকাশ ঘটবে, তা আপনার আওলাদগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকবে। আপনি শেষ যামানায় হযরত ইমাম মেহেদী আ.-এর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অধিকারী ও সবিকাশী হবেন। (ছফীনায়ে ছফর–৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৯খ্রি.) বর্তমানে ৩৮৫/সি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা–১২১৭ তে "খানকায়ে সুরেশ্বরী" নামে তার ভক্তবৃন্দের এক জমজমাট আস্তানা গড়ে ওঠেছে। সেখান থেকে সুরেশ্বর নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের হয়ে থাকে।

সুরেশ্বরীর আকীদা ও তার জবাব

ভ্রান্ত আকীদা–১ : তথাকথিত এ পীর ও তার ভক্তবৃন্দের মতে গান-বাদ্য, সামা, তালি বাজানো, নাচ সবই জায়েয। প্রমাণস্বরূপ এরা একাধিক হাদীস উপস্থাপন করে থাকে। যেমন,

✪ হযরত রুবাইয়া বিনতে মু'আওয়িয রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বামীর ঘরে প্রবেশকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং আমার বিছানায় তিনি এমনভাবে বসলেন, যেমন তোমরা আমার সামনে বসেছ। তখন আমাদের বংশের ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল আর আবৃত্তি করছিল বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী পূর্বপুরুষদের বীরত্বগাঁথা। হাঠাৎ তাদের এক

শিশু বলে উঠল– 'আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রয়েছেন, যিনি ভবিষ্যতের খবর জানেন'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– এমন কথা বলো না বরং পূর্বে যে কথা বলছিলে, তা-ই বলতে থাক। –বুখারী : ২/৭৭৩

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লাহ আলী কারী রহ. বলেন– এখানে দফ দ্বারা মুতাকাদ্দেমীনের (প্রবীন উলামায়ে কিরামের) দফ উদ্দেশ্য। যাতে ঝাঁঝ ছিল না। আর যে দফে ঝাঁঝ রয়েছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ।

হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসে تغنيان দ্বারাও বাদ্যযন্ত্র বিহীন বা দফ (ঝাঁঝ বিহীন) বাজিয়ে রূপকার্থে গান গাওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। নতুবা বস্তুতঃ তা ছিল কবিতা আবৃত্তি। কেননা স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি.-ই মেয়ে দুটির ব্যাপারে وليستا مغنيتين তথা তারা গায়িকা ছিল না বলেছেন।

তা ছাড়া বুখারী শরীফে (৩/৭৭৫) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে لهو দ্বারা বাতিলপন্থীরা ব্যাপকভাবে সব ধরনের গান-বাদ্য উদ্দেশ্য নিলেও বস্তুত সেখানে বাদ্যযন্ত্র বিহীন আনন্দ ও বিনোদনমূলক কবিতা আবৃত্তি উদ্দেশ্য।

আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনে ইবনে মাজাহ শরীফে ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসখানা পেশ করতে পারি। তাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কি কনের সাথে ছোট ছোট মেয়ে প্রেরণ করেছ? কারণ, আনসাররা গজলপ্রিয় মানুষ। কাজেই এরা গিয়ে (গজল পাঠ করত) বলত–

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ – فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

"এসেছি, আমরা এসেছি; তিনি আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীতে অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে কেবল জায়েয কবিতা আবৃত্তি কিংবা সর্বোচ্চ দফ বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে গান-বাদ্যের বৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করার আদৌ অবকাশ নেই। বস্তুত এসব প্রমাণাদির ক্ষেত্রে বাতিলপন্থীরা জঘন্যতম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

এসব হারাম হওয়ার প্রমাণ : গান-বাদ্য হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের একাধিক প্রমাণ রয়েছে। যেমন,

১. কুরআনে কারীমের সূরায়ে লুকমানের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

এ আয়াতে কারীমায় لهو الحديث দ্বারা গানবাদ্য উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবী শাইবা, ইবনে আবিদ্দুনিয়া, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং হাকিম ও বাইহাকী রহ. বিশুদ্ধ সনদে আবুস সাহাবা এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন,

قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رض مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ قَالَ وَاللّٰهِ اَلْغِنَاءُ ـ

তদ্রুপ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ আয়াতে لهو الحديث এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, একজাতীয় ক্রীড়া-কৌতুক। (রূহুল মা'আনী- ১১/৬৭)

অন্যান্য মুফাসসিরগণও এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

২. সূরায়ে বানী ইসরাইলের ৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মুজাহিদ রহ. লিখেন, শয়তানের আওয়াজ দ্বারা গান-বাদ্য ও ক্রীড়া-কৌতুক উদ্দেশ্য। সুতরাং তা কখনও বৈধ হতে পারে না।

৩. সুরায়ে নাজম-এর ৫৯-৬১ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَاتَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ـ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু উবাইদী বলেন– হিমইয়ারীদের ভাষায় السمود অর্থ গান-বাদ্য। কথায় আছে, يا جارية! اسمدى لنا –হে খুকী, আমাদেরকে গান শোনাও! অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। তা ছাড়া সুফী সম্রাট শাইখ সোহরাওয়ার্দী রহ.-ও عوارف المعارف গ্রন্থে উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা গান-বাদ্যের নিষিদ্ধতা ও হারাম হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসভাণ্ডারেও রয়েছে প্রচুর প্রমাণ। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

(ক) সহীহ বুখারী–২/৮৩৮ পৃষ্ঠায় আবু মালেক-আবু আমের আশ'আরী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِىْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحُرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

(খ) রুহুল মা'আনী–১২/৬৭ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে সুনানের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءَ الْبَقْلَ

(গ) পূর্ব সূত্রেই হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَكَ بِغِنَاءٍ إِلاَّ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ شَيْطَانَيْنِ يَجْلِسَانِ عَلٰى مَنْكَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِاَعْقَابِهَا عَلٰى صَدْرِهِ حَتّٰى يَمْسِكَ

তা ছাড়া হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., আলী রাযি.-সহ অনেক প্রখ্যাত সাহাবায়ে কিরাম থেকেও এ প্রসঙ্গে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (বিস্তারিত বড় বড় কিতাবে দ্রষ্টব্য) সুতরাং পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, গান-বাদ্য হারাম। এতে বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যা প্রদানের কোনও সুযোগ নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-২ : সিজদায়ে তাহিয়্যা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করা জায়েয। অথচ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে যে কোনো প্রকার সিজদা করা হারাম। এখানে ইবাদত বা সম্মান প্রদর্শন যে কোনো উদ্দেশ্যে হোক, হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-৩ : তাদের মতে মাজারে গিলাফ পরানো, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল ইত্যাদি দেওয়া জায়েয। অথচ এসবের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে আদৌ কোনো সন্দেহ নেই বরং নিঃসন্দেহে হারাম।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তালীমুদ্দীন, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, রাহে সুন্নাত, আহসানুল ফাতওয়া-১ প্রভৃতি।)

ভ্রান্ত আকীদা-৪ : কবরের মাটি নরম, ভিজা স্যাতসেতে বা কবরে পানি থাকলে তাতে বিছানা কিংবা খাট দেওয়া কর্তব্য। নেক্কারদের কবরে খাট দেওয়াও দোষণীয় কিছু নয়। (ছফীনায়ে ছফর-৮৫)

অথচ কুরআন-সুন্নাহ এবং প্রবীণ আলিমদের থেকে এর যথার্থতার পক্ষে আদৌ কোনো প্রমাণ নেই।

ভ্রান্ত আকীদা-৫ : তাদের সবচেয়ে গুরুতর ভ্রান্তি হল, "পীরের হাতে বাই'আত না হলে কোনো ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয় না। আবার কামেল পীরের জন্য ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন নেই।" (নাউযুবিল্লাহ)

তাদের এ দুটি দাবিই চরম মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা। কারণ,

প্রথমত কোনোকিছু ফরয হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা (সরীহ নছ) থাকা আবশ্যক। কিন্তু এখানে তা নেই। অথচ এসব গোমরাহ ব্যক্তিরা অনায়েসেই বলে দিল, পীরের বাই'আত ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। তজ্জন্যে পীর ধরা আবশ্যক তথা ফরয।

দ্বিতীয়ত কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

আমরণ তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা হিজর : ১৯)

এ আয়াতে কারীমায় ইয়াকীন অর্থ 'মৃত্যু'। কেননা নবীগণ ও সাহাবায়ে কিরাম অপেক্ষা অধিক ইয়াকীন আদৌ কারও ছিল না; থাকতেও পারে না। তদুপরি মৃত্যু পর্যন্ত তাদের উপর শরী'অতের বিধি-নিষেধ এবং ইবাদত-বন্দেগী করার দায়িত্ব ছিল। তা ছাড়া সূরা মারইয়ামে–৩০ হযরত ঈসা আ. সম্পর্কেও এমনিই কথা ইরশাদ হয়েছে।

ফলকথা, যেখানে নবীগণ ও সাহাবাগণের মত ইয়াকীন-বিশ্বাস অর্জন করা কোনো উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়, তবুও তারা আমরণ শরী'আতের পরিপূর্ণ পাবন্দ ছিলেন, সেখানে সাধারণ এক উম্মতের পক্ষে শরী'আতের বিধান মুক্ত থাকা এবং ইবাদতের প্রয়োজন নেই বলা কতটা গোমরাহী হতে পারে? বাতিলপন্থী প্রতিপক্ষের মতানুসারে তো বলতে হয়, নবীগণ ও সাহাবাগণ কামেল হতে পারেন নি। তারা বুযুর্গির উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে নি। নতুবা ইবাদত-বন্দেগী করেছেন কেন ? অন্তত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও যদি কামেল মেনে নেন, তবুও প্রশ্ন থাকে, তিনি কেন ইবাদতের জন্য পা মোবারক ফোলাতে গেলেন?

এ প্রসঙ্গে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল– হুজুর! কেউ কেউ বলে, আমরা তো পৌঁছে গেছি। এখন আর আমাদের শরী'অতের অনুসরণের দরকার নেই। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, وصلوا ولكن الى سقر –হ্যাঁ, তারা পৌঁছে গেছে; তবে জাহান্নামে। বস্তুত এ দাবি মদ্যপান, চুরি, যেনা-ব্যভিচার অপেক্ষাও ঘৃণিত। কেননা এসব কবীরা গুনাহ বটে; কিন্তু কুফরী নয়। অথচ উক্ত মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। অবশ্য বাতিলপন্থীরা উক্ত আয়াতে কারীমার অপব্যাখ্যা করে বলে– এখানে ইয়াকীন অর্থ, 'পরিচিতি ও বিশ্বাস' অর্থাৎ তোমরা মারেফত লাভ বা পরিচিতি অর্জন করা পর্যন্ত ইবাদত কর; এরপর আর ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

তাদের এ অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনন্দিত তাফসীরে ইবনে কাসীর–২/৫৬০ সূরা হজর-এ বলা হয়েছে, তাদের এ আকীদা কুফর, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা। কেননা নিঃসন্দেহে নবীগণ এবং সাহাবাগণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আল্লাহ পাকের হক, সিফাত ও তাযীমের যোগ্যপাত্র হওয়ার মারিফাত তাদেরই সবচেয়ে বেশী ছিল। তদুপরি আমরণ তারাই ছিলেন সর্বাধিক ইবাদতকারী; সব সময় নেক কাজ করেছেন। বস্তুত এখানে ইয়াকীন অর্থ "মওত" ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুহুল মাআনী–৮/৮৭ পৃষ্ঠায়ও তদনুরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। মূলত এসব

বাতিলপন্থীরা বুঝে নি যে, এ আয়াতে প্রথমতঃ রাসূলে কারীম -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আপনি মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকুন'। ফলে তারা চরম মূর্খতা ও গোমরাহীর অতল গহবরে নিপতিত হয়েছে। মোটকথা, উপরিউক্ত প্রমাণাদি ছাড়া বহুবিধ দলীল-প্রমাণের আলোকে শরী'অত বর্জনকারী যে কোনো তরীকতপন্থীই দ্বীন হতে খারিজ।

ভ্রান্ত আকীদা-৬ : রাসূল আলেমুল গায়েব। তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান আছে। অথচ কেবল নবীজীকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং হাশর-নাশর প্রভৃতি বিষয়ে এমন কিছু জ্ঞান-ইলম প্রদান করা হয়েছে, যেগুলো অপর কোনো নবী-রাসূল বা ফিরিশতাকেও দেওয়া হয় নি। কিন্তু সে ইলম ও জ্ঞান আল্লাহ পাকের ইলমে মুহীত (সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী)-এর সামনে কিছুই নয়। পক্ষান্তরে বিদ'আতীদের মতাদর্শ হচ্ছে, পৃথিবীর শুরু থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্রাণুও নবীজির ইলমে আছে। এটি কত বড় ভ্রষ্টতা!

ভ্রান্ত আকীদা-৭ : তাদের আরেকটি আকীদা হচ্ছে, মরণের পর রূহ বা আত্মা যে দিনগুলোতে দু'আর জন্য আসে, তাকে বলে- তিজা, চাহারম, সপ্তমী ইত্যাদি। অথচ এসবের আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। নিতান্তই অলিক ও কল্পকথা। আবার কারও কারও মতে মৃতকে ছাওয়াব না বখশে দিলে তার রূহ তাকে অভিশাপ দেয় -একথাও ভিত্তিহীন। মোটকথা, সুরেশ্বরী পীরের একাধিক কুফরী আকীদা আজও তার ভক্তবৃন্দরা আকড়ে আছে।

এনায়েতপুরী পীর ও তার আকীদা

"এনায়েতপুরী" নামে খ্যাত পীর ছিলেন সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের সন্তান মাওলানা শাহ্‌ সূফী মুহাম্মাদ ইউনুস আলী। তিনি ১১/১২/ ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ২১শে কার্তিক ১২৯৩ সালে মাওলানা শাহ্‌ সূফী আব্দুল কারীমের ঔরশে সাবেক পাবনার চৌহালী থানাধীন এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ৫/৬/১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮/১১/১৩৫৮ বাং সনে। তিনি কলকাতার সৈয়দ ওয়াজেদ আলীর মুরীদ ও খলীফা। এনায়েতপুরীর ভক্তবৃন্দের মতে তাদের পীর ১৩০০ সালের মুজাদ্দিদ। নিম্নে তার ভ্রান্ত আকীদা- বিশ্বাসগুলো সংক্ষেপে পেশ করা হল।

(১) তার মতে বংশের সকলেই জন্মগত অলী। মৃত্যুর ক'দিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন, আমার বংশের তেফেল-শিশু বাচ্চাকে পেলেও তোমরা তাকে জন্মগত অলী মনে করবে।

(২) তাদের মতে আহাদ ও আহমদে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। অথচ এ আকীদা ঈমান পরিপন্থী। কেননা হকপন্থীদের মতে আল্লাহ-রাসূল ভিন্ন ভিন্ন দুই সত্তা; এক সত্তা নন। আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর রাসূল মাখলূক।

(৩) "একশত ত্রিশ ফরয" শিরোনামে মনগড়াভাবে লিখা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কুরছী জানা তথা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবেন আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ জানা থাকা ফরয। তদ্রুপ ৪ মাযহাব মানাও ফরয। অথচ কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়া কোনো কিছু ফরয সাব্যস্ত করা যায় না। এটা তাদের শরী'অত সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার প্রমাণ এবং শরী'অত বিকৃতির শামিল।

(৪) পীর ধরা বা পীরের অছীলা ধরা ফরয।

প্রমাণ হিসেবে তারা সূরা মায়িদার ৩৫ নং আয়াত এবং সূরা কাহাফের ১৭ নং আয়াত পেশ করে। অথচ তা কোনোভাবেই ফরয নয়; বড়জোর বাই'আতকে সুন্নত বলা যেতে পারে। কেননা সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে কেউ কেউ নবীজীর হাতে চুরি, যেনা-ব্যভিচার প্রভৃতি না করার বাই'আত গ্রহণ করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। অতএব তাদের এ দাবি শরী'অতের মধ্যে বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

(৫) তার ভক্তবৃন্দের মতে পীরের তাওয়াজ্জুহ মুরীদের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিতে পারে। তারা বলে, এনায়েতপুরী সাহেবের মধ্যে এ ক্ষমতা ছিল। তারা লিখেছে, এ শক্তিই সবচেয়ে বড় শক্তি। সব পীরই তা পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত তাওয়াজ্জুহ পীর সাহেব কাউকে দিলে আগুনের মতো মুহূর্তেই দিলের ময়লা জ্বালিয়ে পাক-ছাফ করে দেয়। তখন লতীফা আল্লাহর নামে দুলতে থাকে। বাস্তাবিকই এনায়েতপুরীর মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকলে তিনি দুনিয়ার সকলের দেল পাক-ছাফ করলেন না কেন? এরূপ ক্ষমতা নবীজীর মধ্য কি ছিল না? তা হলে কেন তিনি সকলকে হেদায়াত দিতে পারলেন না? (সূরায়ে কাসাস–৫৬-এ) আল্লাহ পাক বললেন, 'আপনি চাইলেই কাউকে হেদায়েত দিতে পারেন না বরং আল্লাহ পাক যাকে চান হেদায়েত করেন'?

(৬) সন্তান লাভ, ব্যবসায় আয়-উন্নতি, আশা পূরণ এবং ভালো-মন্দ ইত্যাদির ক্ষমতা পীর সাহেবের আছে। পীর সাহেব চাইলে এসব করতে পারেন।

অথচ এ আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী। কুরআনে কারীমে সূরা নিসা–৪৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, "আপনি বলে দিন, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এ জাতির কি হল যে, এরা বুঝতেই পারে না।" হাদীসে এসেছে, হে আল্লাহ! ভালো-মন্দ সবই তোমার (আল্লাহর) হাতে।

(৭) এনায়েতপুরীকে তার ভক্তবৃন্দরা প্রায় নবীর পর্যায়ে মনে করে। তাদের মতে এনায়েতপুরীকে যে পেয়েছে, সে জান্নাতী। (নাউযুবিল্লাহ)

(৮) তাদের মতে সামা (গান-বাদ্য) জায়েয।

(৯) তারা ওরস-এর পক্ষপাতি বরং এ নিয়ে বাড়াবাড়িও করে। পরিত্যাগ করলে নাকি পরবর্তী এক বছর চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আয়-উন্নতির সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়।

(১০) এনায়েতপুরীর ভাষ্য মতে এ তরীকায় মৌখিক বা উচ্চ স্বরে যিকির নেই।

এ সব দাবি ও মতাদর্শ নিশ্চিত কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য।

আটরশীর পীর ও তার আকীদা

"আটরশির পীর" বলতে ফরিদপুর শহরের নিকটস্থ বিশ্বজাকের মঞ্জিলের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সূফী হাশমত উল্লাহকে বুঝানো হয়। তিনি এনায়েতপুরী পীরের খলীফা। জামালপুর জেলার শেরপুর থানাধীন পাকুরিয়া গ্রামে শাহ আলীম উদ্দীনের ঔরশে তার জন্ম। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে নোয়াখালীর মাওলানা শরাফত আলীর কাছে আরবী ফার্সির প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন। এতটুকুই ছিল তার নিয়মিত লেখাপড়া। দশ বছর বয়স থেকে তিনি ত্রিশ বছর পর্যন্ত এনায়েতপুরী পীরের খেদমতে থাকেন।

এরপর কথিত পীরের নির্দেশেই ফরীদপুরে এসে "জাকের ক্যাম্প" নামে আস্তানা গড়ে তুলেন। কালক্রমে সেটি "জাকের মঞ্জিল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাসাওউফের উপর তার লেখা বেশ কিছু দুর্বোধ্য বই-পুস্তক রয়েছে। যেগুলো নিছক কল্পনানির্ভর অলিক কিছু বিষয়ের গ্রন্থনা মাত্র। কুরআন-হাদীসের সাথে সে সবের আদৌ কোনো সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বহু জাল হাদীসও সুচারুরূপে চয়ন করেছেন। আবার নানা ধরনের অপব্যাখ্যার সমাহারও ঘটিয়েছেন। যেমন, "তোমরা মরার আগে মর"। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত নয়। মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন, এটি সূফীদের কথা।

আটরশী পীরের বিভ্রান্তি

(১) ভলো-মন্দ পীরের হাতে। তিনি বলেন, এনায়েতপূরী রহ. সাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলে গেছেন, বাবা তোর ভালো-মন্দ উভয়ই আমার হাতে রইল। তোর কোনো চিন্তা নেই। অথচ এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পরিপন্থী। ইতঃপূর্বেও এনায়েতপুরীর আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বস্তুত এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করে। এরাও "সর্বেশ্বরবাদে" বিশ্বাসী বাতিল সম্প্রদায়।

(২) পীর মুক্তির ব্যব্যস্থা করে দিবে। তিনি বলেন– দুনিয়ায় থাকতে তোমরা যে যতটুকুই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হও না কেন, তোমাদের ছায়ের ছুলূক জীবিতকালে সম্পন্ন নাই হোক, তবুও ভয় নেই। মৃত্যুর পর দুই

পুণ্যাত্মা (রাসূল ও আপন পীর) তোমাকে প্রশিক্ষণ দিবেন, মা'রিফাতের তালীম দিবেন। ফলে সকলেই হাশরের মাঠে অলি-আল্লাহ হয়ে পুনরুত্থিত হবে। তাই বলা হয়, এ তরীকায় যিনি দাখিল হন, তিনি বঞ্চিত হন না। অথচ আদৌ কোনো পীর-মাশায়েখ তার মুরীদের পাপের বোঝা নিয়ে তাকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন না। এ কথা সুস্পষ্ট। কারণ, কুরআনে কারীমে সূরা আন'আম–১৬৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى

বস্তুত এ আকীদা খ্রিষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদার সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ এবং একটি কুফরী আকীদা। এ তাদের চরম মূর্খতা ও গোমরাহী। অবশ্য হক্কানী পীরের কথামতো চলতে পারলে, কিছু না কিছু ফায়দা অবশ্যই হয়। তা ছাড়া স্বয়ং নবী কারীম ﷺ তার বংশের লোকদের সম্বোধন করে বলেছেন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারব না। হে বনু আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা-----। হে ফাতেমা তুমি ------। (মুসলিম)

(৩) পীর সাহেব তার মুরীদকে এমনকি মুরীদের আত্মীয়-স্বজনকেও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। পীর যার দিকেই তাওয়াজ্জুহ দেন বা খেয়াল করেন, তাকেই তিনি কুওয়াতে এলাহিয়ার হেফাযতে রাখতে পারেন। এরূপ ক্ষমতা আল্লাহ পাক কামেল মুর্শিদকে দান করেন। অথচ এ ধ্যান-ধারণা সুস্পষ্ট কুরআন বিরোধী। কেননা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَكَاشِفَ لَـهُ اِلاَّ هُـوَ

যদি আল্লাহ তোমার অমঙ্গল চান, তবে তিনি ছাড়া তা দূরীভূত করার কেউ নেই। (ইউনুস-১০৭)

তা ছাড়া বাস্তবিকই যদি তাই হত, তা হলে আটরশীর মুরীদান পথে-ঘাটে নানা জায়গায় কেন দুর্ঘটনার শিকার হন? কেন তারা আততায়ীর হাতে নিহত হন? কেন তাদের বাড়ি ঘরে চুরি-ডাকাতি হয় ?

(৪) পরকালে নাজাত বা মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যকতা নেই। যে কোনো ধর্মের লোকই নিজ নিজ ধর্ম মতে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে পারে। তবেই কেবল পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে আলে ইমরানের–৮৫ নং আয়াতে ঘোষণা করছেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

আহমদ ও বাইহাকী শরীফের উদ্ধৃতিতে মিশকাত শরীফে এসেছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন :

لَوْكَانَ مُوْسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِىْ

(৫) চার মাযহাব ও ইমামদের সম্পর্কে নানা কটূক্তিও করে থাকে এ আটরশীরা। তাদের মতে ইমামগণের অনমনীয় নীতির কারণেই আজ ইসলামী আইনব্যবস্থায় অবক্ষয় এসেছে। তারা এর মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে ইসলামী আইনকে অনমনীয় ও বাস্তবতার সাথে সমাঞ্জস্যহীন শাস্ত্রে পরিণত করেছে। বস্তুত তাদের মতো ইমামগণ মনগড়া ব্যাখ্যাদাতা এবং সকল মাযহাবের ফিকহ্ শাস্ত্রকে অবাস্তব শাস্ত্র বলার মতো ধৃষ্টতা খুব কম বাতিলপন্থীরাই দেখিয়েছে।

(৬) ওরস নিয়ে বাড়াবাড়ি। এ প্রসঙ্গে এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে আটরশীর পীরের বক্তব্য ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মোটকথা, আটরশীর পীর ও তার ভক্তবৃন্দের মাঝে রয়েছে নানা ধরনের কুসংস্কার ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাস।

চন্দ্রপুরী পীর ও তার আকীদা

চন্দ্রপাড়া ফরিদপুর সদর থেকে অনতি দূরে একটি গ্রাম। সেখানের বাসিন্দা মৌলভী সাইয়িদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (মৃত : ১৯৮৪ খ্রি.) চন্দ্রপাড়া পীর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি এনায়েতপুরী পীরের শাগরেদ এবং দেওয়ানবাগী পীরের মুর্শিদ ও শ্বশুর। তার ভ্রান্ত আকীদা নিম্নরূপ।

) কোনো লোক যখন মাকামে ছুদূর, নাশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকিনের স্তর পেরিয়ে নফসীর মোকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তার কোন ইবাদত থাকে না। জযবার অবস্থায় ও কেউ ফানাফিল্লার প্রান্তসীমায় পৌঁছালে তারও ইবাদত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদত করলে কুফুরী হবে। তাসাওউফের বহু কিতাবে এ কথা বর্ণিত আছে। সুরেশ্বরী পীরের আকীদা প্রসঙ্গে এ নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। অবশ্য সুরেশ্বরী পীরও এতটা ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলেন নি যে, কামেল লোকের ইবাদত করা কুফরী। চন্দ্রপাড়া পীরের ভাষ্যমতে নবীগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সম্ভবত (নাউযুবিল্লাহ) বুযুর্গির উচ্চাসনে বা কামেল দরজায় পৌঁছান নি। নতুবা তারা কুফরী করেছেন। একথা কত বড় অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ভাবা যায় কি ?

(২) জিবরাঈল আ. এবং আল্লাহ তা'আলা এক ও অভিন্ন সত্তা।

অথচ ফিরিশতাগণ কেবল আল্লাহর মাখলূক ও দাস। কুরআনে কারীমে (সাফফাত–১৫০) ইরশাদ হচ্ছে,

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُوْنَ

অন্যত্র (যুখরুফ–১৯) ইরশাদ হচ্ছে,

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ اِنَاثًا

(৩) আল্লাহর ফিরিশতারা আল্লাহর নাফরমানি করে। অথচ কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, (সূরা তাহ্‌রীম-৬)

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

(৪) পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর্বাদে বিশ্বাসী। তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে কুরআনে কারীমের সূরা বাকারা–২৮ নং আয়াত পেশ করে বলে, ثم نحييكم এর অর্থ "পৃথিবীতে পুনারায় জন্ম লাভ করা"। অথচ হকপন্থীদের মতে ثم نحييكم এর অর্থ, হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। অধিকন্তু পুনর্জন্মবাদ বহু কারণে কুফরী।

বস্তুত চন্দ্রপুরীর পথভ্রষ্টতা ও কাফির হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। কেননা শরঈ উযর-আপত্তি ও সমস্যা ছাড়া ইবাদত ফরয না হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস নিঃসেন্দহে একটি কুফরী আকীদা। তা ছাড়া কোনো ফরয কাজকে কুফরী ঘোষণা দেওয়াও একটি কুফরী আকীদা। মোটকথা, তারা জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী রহ. বলেন, এসব ক্ষেত্রে ভিন্নতর ব্যাখ্যা করাও কুফরীর নামান্তর।

দেওয়ানবাগী পীর ও তার আকীদা

তিনি বি.বাড়িয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামের সৈয়দ আব্দুর রশীদ সরকারের পুত্র। নাম মাহ্‌বুব-এ-খোদা। জন্ম ২৭/৮/১৩৫৬ বাংলা মোতাবেক ১৪/১২/১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। প্রাথমিক পড়াশুনা করেন তালশহর কারিমিয়া আলিয়া মাদরাসায়। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে চাকরিও করেন। চন্দ্রপাড়ার পীর ছিলেন তার শ্বশুর ও মুর্শিদ। স্বয়ং তিনি এবং ভক্তবৃন্দ তাকে সূফী সম্রাট পরিচয় দেন। তিনি ঢাকার অদূরে দেওয়ানবাগে একটি এবং ১৪৭ আরামবাগে "বাবে রহমত" নামে আরেকটি দরবার স্থাপন করেন। "সূফী ফাউণ্ডেশন" নামে তার একটি সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখান থেকে ইতঃমধ্যে তার রচিত বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন : সূফী সম্রাটের যুগান্তকরী অবদান, আল্লাহ কোন পথে? মুক্তি কোন পথে? শান্তি কোন পথে? ওযীফা, সুলতানিয়া

খাবনামা প্রভৃতি। তা ছাড়া মাসিক আত্মার বাণী এবং সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ নামে দুটি পত্রিকাও বের হয়।

দেওয়ানবাগীর ভ্রান্ত চিন্তাধারা

(১) মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরুরি নয়। অথচ কুরআনে কারীমে (সূরা আলে ইমারান- ১৯) এসেছে :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অনত্র সূরায়ে আলে ইমরানে-৮৫ ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

তদ্রুপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَوْكَانَ مُوْسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ اِلاَّ اتِّبَاعِىْ

(২) তিনি জান্নাত-জাহান্নাম হাশর-নশর, মিযান-পুলসিরাত ইত্যাদি অস্বীকার করেন। তিনি এসব সম্পর্কে এমন বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন, হুর বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বুঝায়। জাহান্নাম বলে আত্মার চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাকে ইত্যাদি। এভাবে ঈমান-আকীদা সংশ্লিষ্ট বহু ব্যাপারে সে এমন এমন অলীক ব্যাখ্যা দিয়েছে, যেগুলো জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার কারার নামান্তর। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে মতে এ সবের ঈমান রাখার উপর সকলের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের জরুরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। আল্লামা সুবকী রহ. جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন, জরুরিয়াতে দ্বীন যার উপর ইজমা রয়েছে, তা অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফির। তবে দেখতে হবে, তাদের বক্তব্য সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ অস্বীকারমূলক মনগড়া ব্যাখ্যা, নাকি তাবীল বা ব্যাখ্যার শর্তানুসারে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা। তা হলে শরঈ নস মাফিক না হওয়ায় তারা কুফরীতে লিপ্ত হবে।

মাওলানা ইদ্রীস কান্দলবী রহ. বলেন, কোনো জরুরিয়াতে দ্বীনের সুবিদিত ও প্রসিদ্ধ অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যাও অস্বীকৃতির নামান্তর।

(৩) তিনি জন্মান্তর্বাদ বা পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) তিনি হজ্ব করেন নি। তার হজ্ব করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তার জনৈক ভক্ত স্বপ্নযোগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছে, তিনি বাবে রহমতে

এসে বলছেন, আমি স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ তার সাথে আছি এবং থাকি; কাবা ঘরও তার সামনে আছে। তিনি আমার মুহাম্মদী ইসলামী ধর্ম প্রচার করছেন। তার হজ্ব করার প্রয়োজন নেই। বস্তুত এখানে হজ্বকে অস্বীকার করা হয়েছে।

অথচ এটি ইসলামের পঞ্চম বুনিয়াদ ও স্তম্ভ। তা অস্বীকার করা সরাসরি কুফরী। এভাবে সে কুরআন-হাদীসের বহু অপব্যাখ্যা করেছে। যেমন, কুরআনে বর্ণিত হযরত আদম-হাওয়া আ.-এর নিষিদ্ধ ফল খাওয়া প্রসঙ্গে তার ধৃষ্টতা এতই জঘন্য যে, সে বলে- এ ফল দ্বারা যদি গন্দম উদ্দেশ্য হয়, তবে অর্থ হবে, গমের আকৃতির মতো নারীদের গোপন অঙ্গ আর আঙ্গির ফল উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে, যৌবনা নারীর বক্ষযুগল বা স্তনদ্বয়।

সুতরাং আদম-হাওয়ার ফল খাওয়ার অর্থ দাঁড়ায়, তাদের যৌনমিলন। জুমহূর উলামায়ে কিরামের পরিপন্থী এরূপ ব্যাখ্যাদাতাকে মুলহিদ ও যিন্দিক বলা হয়। অথচ তার এ জাতীয় অপব্যাখ্যার জুড়ি নেই। এতৎসত্ত্বেও তার দাবি হচ্ছে,

(১) সে ইসলাম প্রচারক। তার মতবাদের বাইরে সারা বিশ্বে প্রচলিত ইসলাম এজেদী ইসলাম; তা এজেদী চক্রান্তের ফসল।

(২) আল্লাহই তাকে নূরে মুহাম্মাদীর ধারক-বাহক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।
(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ-১২/৩/৯৯ শুক্রবার)

(৩) সে নাকি সমকালের মুজাদ্দিদ, মহান সংস্কারক ও শ্রেষ্ঠতর ওলিআল্লাহ। (আল্লাহ কোন পথে-১৩৭) ৩য় সংস্করণ, রাসূল সত্যি কি গীরব ছিলেন-১২)

তার এসব অলিক ও গাঁজাখোরী দাবি প্রমাণের জন্য তার ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন স্বপ্নের প্রলাপ বকেছেন। অথচ বিশুদ্ধ কথামতে স্বপ্ন কোনো দলীল নয়। অবশ্য কোনো কোনো অজ্ঞ লোক আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি.-এর আযানের বাক্য সম্পর্কিত স্বপ্ন দিয়ে আত্মপক্ষ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা জানেন না যে, এখানে নিছক স্বপ্নই নয় বরং সে আযান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত। নতুবা এর গ্রহণযোগতার কোনো কারণ নেই।

শেষকথা হল, যত স্বপ্নের প্রলাপই বকা হোক না কেন, এতে তার বুযুর্গি প্রমাণ হবে না; বুযুর্গি প্রমাণ হবে ঈমান-আকীদা ও সহীহ আমলের মাধ্যেমে। সুতরাং দেওয়ানবাগীর মতো যিন্দিক, মুলহিদ ও কুফরী আকীদা পোষণকারী লোক নিশ্চিত কখনই বুযুর্গ হতে পারে না।

রাজারবাগী পীর ও তার আকীদা

কথিত এ পীরের নাম দিল্লুর রহমান। ৫নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজাবাগ, ঢাকা- ১২১৭ মুহাম্মদীয়া জামিয়া শরীফ ও সুন্নতী জামে মসজিদ তার দরবার। তিনি নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানাধীন প্রভাকরী গ্রামের তাতী ও সুতা ব্যবসায়ী মরহুম মোখলেছুর রহমানের ৩য় পুত্র। তিনি লেখাপড়া করা কোনো আলেম নন; একজন কলেজশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র। অবশ্য তিনি দাবি করেনে, তাকে ইলমে লাদুনী দান করা হয়েছে এবং তিনি বাহ্রুল উলূম বা জ্ঞানের সাগর।

আরও দাবি করেন, তিনি সাধারণ কোনো পীর নন বরং গাউসুল আযম ও আমীরুল মুমিনিনীন ফিত তাসাওউফ তথা তাসাওউফ জগতের সার্বোচ্চ নেতা। তার মুরীদানের মতে বড় পীর আব্দুল কাদীর জিলানীর চেয়ে তার মাকাম ঊর্ধ্বে। তিনি কোনো পীর থেকে খেলাফত পান নি। তবে তিনি দাবি করেন, স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূল তাকে খেলাফত প্রদান করেছেন। তিনি নিজের বুযুর্গী যাহির করার জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করেছেন।

(১) নিজের নামের আগে-পিছে প্রায় ৫২টি উচ্চাঙ্গের বিশেষণ বা উপাধি জুড়ে দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত উম্মতের কাউকে এ ধরনের খেতাবের বিশাল বহর নিজ নামের সাথে যুক্ত করতে দেখা যায় নি। তার দাবি মতে এ সব খেতাব স্বপ্নযোগে কিছু স্বয়ং আল্লাহ, কিছু স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিছু তরীকতের ইমাম বা পীর-আউলিয়াগণ তাকে দিয়েছেন।

অথচ শরী'আতে স্বপ্ন কোনো হুজ্জত বা দলীল নয়। কাজেই স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত তার এসব খেতাব অবান্তর ও ভিত্তিহীন। তা ছাড়া স্বঘোষিত এসব খেতাবের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বহির্ভূত অনেক দাবিও এসে গেছে। যেমন, ইমামুস সিদ্দীকীন। অথচ এ সিদ্দীকীনের মধ্যে হযরত আবু বকর রাযি. ও রয়েছেন, যিনি মর্যাদায় সর্বসম্মতভাবে গোটা উম্মতের মধ্যে সকলের ঊর্ধ্বে। আর সাহাবা নন এমন ব্যক্তি, কখনও আদনা সাহাবার মর্যাদায়ও উপনীত হতে পারে না। কিন্তু অনায়েসেই দিল্লু সাহেব এমন স্বগোক্তি করতে পেরেছেন।

'আল-বাইয়িনাত' পত্রিকায় লেখা হয়েছে : হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন– আমি উরূয করতে করতে সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মাকাম অতিক্রম করলাম। (নাউযুবিল্লাহ)

বলা বাহুল্য যে, হযরত মুজাদ্দিদ রহ. এমন কথা বলেছেন কি না, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বস্তুত এ সব বুযুর্গানে দ্বীন সম্পর্কে এ জাতীয় বেশ কিছু মিথ্যে কথা অতি ভক্তির মাধ্যমে রটে গেছে, যার সত্যতা বেশ

সংশয়পূর্ণ। অবশ্য এ উক্তির দ্বারা রাজারবাগীর আকীদা পরিষ্কার বোঝা যায়। অধিকন্তু তার খেতাবে বেয়াদবীও রয়েছে। যেমন, তিনি নিজেকে "হাবীবুল্লাহ" দাবি করেছেন। অথচ হাবীবুল্লাহ কেবল রাসূলে কারীম ﷺ। এটি তার চরম বেয়াদবী। নতুবা তিনি রাসূলের সমমর্যাদায় পৌঁছে যান, যা কুফরী পর্যায়ভুক্ত। (নাউযুবিল্লাহ)

তদ্রুপ তার খেতাবে কুফরীও রয়েছে। যেমন, কাইয়ূমুয যামান। অথচ এটি আল্লাহর গুণ। উক্ত খেতাবের অর্থ হবে, যুগের ধারক ও রক্ষক। এ কথা শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অন্য কারও ব্যাপারে নয়। কারণ, মাখলূক কাইয়ূম হতে পারে না বরং আব্দুল কাইয়ূম বা কাইয়ূমের গোলাম হতে পারে। সুতরাং মানুষের জন্য এ খেতাব ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। তা ছাড়া এ সব যে তার চরম দাম্ভিকতা ও বাড়াবাড়ি, তা বলাই বাহুল্য।

(২) কথিত এ পীর আত্মপক্ষ প্রমাণে দ্বিতীয় পন্থা হিসেবে তার ভক্তবৃন্দের এবং নিজের নানা স্বপ্নের কথা উপস্থাপন করেন।

অথচ স্বতঃসিদ্ধ মতে স্বপ্ন কোনো হুজ্জাত নয়। অপরদিকে তিনি নিজস্ব মাসিকী আল-বাইয়িনাত সম্পর্কে অতিরঞ্জনের শিকার হয়েছেন। বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, নবীজী তাকে বলেছেন– তুমি বাইয়িনাত পড়! যারা এর বিরোধিতা করবে, তারা হালাক ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা ঈমানহারা হয়ে যাবে। অধিকন্তু রাজারবাগী তাদের বাইয়িনাত পত্রিকাকে "বাংলা ভাষায় কুরআন" বলার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছেন। কবরেও নাকি বাইয়িনাত পড়তে দেওয়া হবে! (জুলাই–১৯৯৯ খ্রি.)

অথচ কবরে পত্রিকা তো দূরের কথা কারও কুরআন পড়ার কথাও প্রমাণিত নয়। তবে হাদীসে পাকে মৃত্যুর পর কবরে নবীগণের নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে। তা ছাড়া প্রকৃত অর্থে আল-বাইয়িনাত কুরআন সমতুল্য হওয়া তো দূরের কথা রূপকার্থেও কুরআন সমতুল্য বলা বড় হাস্যকর। তা ছাড়া ওই পত্রিকাটিতে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরামের উপর যে-সব অকথ্য গালিগালাজ ছাপা হয়, তা কোনো শালীনতার আওতায় পড়ে না। অধিকন্তু গালিগালাজ করা ফাসেকী ও হারাম। হাদীসে পাকে এসেছে :

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ

"মুসলামানকে গালি দেওয়া ফাসেকী।"

কুরআনে কারীমেও (সূরা আনআম-১০৮) গালিগালাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু দিল্লু সাহেব এ ধরনের হাস্যকর, অবাস্তব অশ্লীল সব কাজকর্ম অনায়েসে করে থাকেন।

(৩) নিজের বুযুর্গানে দ্বীনের প্রশংসায় অতি উচ্চমাত্রায় বাড়িবাড়ি করেছেন, বলেছেন– জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। বুঝাতে চেয়েছেন, তার মধ্যেও বুযুর্গি রয়েছে। যেমন, মুজাদ্দিদ রহ. মাকতুবাত পাঠকালে কেউ নবী না হলেও তার নাম নবীর দফতরে থাকে। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহ. অনুমতিক্রমে চন্দ্র-সূরুজ উদিত হয়; অস্ত যায়। (নাউযুবিল্লাহ) বর্তমান কালের সেই মুজাদ্দিদ হলেন দিল্লু সাহেব। (বাইয়িনাত জুলাই, ১৯৯৯ ইং)

অথচ কেউ এ ধরনের খোদায়ী বিধানকে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করলে সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যায়। কোনো কোনো কট্টরপন্থী শী'আও হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেছিল। অর্থাৎ জগৎ পরিচালনার দায়িত্বভার আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী রাযি. উপর ন্যস্ত করেছেন। এভাবে তাঁকে শী'আরা দ্বিতীয় খালিক বানিয়ে ছেড়েছে। উম্মত সেসব কট্টরপন্থীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছে। তা ছাড়া এ দিল্লু সাহেব জুমহূর উলামায়ে কিরামের বরখেলাফ গর্হিত কিছু মাসায়ালাও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন, চারকল্লি টুপি পরা নবীজির খাস সুন্নাত। বিপদের সময় কনূতে নাযেলা পড়া জায়েয নয়। এতে নামায ফাসেদ হয়ে যায় প্রভৃতি। মোটকথা, দিল্লু সাহেব এবং তার ভক্তবৃন্দের মাঝে বহু গর্হিত ও হাস্যকর কর্মকাণ্ড এবং কুফরী আকীদা রয়েছে।

মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার আকীদা

মাইজভাণ্ডারী বলতে চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীকে বুঝায়। তিনি মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ ও খাইরুন্নেসার ঔরসে ১লা মাঘ ১২৩৩ বাংলা মোতাবেক ১৮২৬ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন। আর ইন্তেকাল করেন ১০ই মাঘ ১৩১৩ বাংলা, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ২৭শে জিলকদ ১৩২৩ হিজরী সোমবার। পরবর্তী সময়ে তার স্থলাভিষিক্ত হন তারই পৌত্র মাওলানা শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হুসাইন।

মাইজভাণ্ডারীর আকীদা-বিশ্বাস

(১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থাৎ যে কোনো ধর্মালম্বী লোকই স্বধর্মে থেকে মুরীদ হতে পারেন। মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। মাইজভাণ্ডার দরবার থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে বিবৃত ঘটনাই এর সমর্থন করে। তাদের ভাষ্যমতে বিভিন্ন মতবাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল এক। আত্মপক্ষ সমর্থনে তারা কুরআনে কারীমের সূরায়ে বাকারা-৬২ নং আয়াত পেশ করেন। এমনকি ইচ্ছেমতো ধর্ম গ্রহণের ব্যক্তিস্বাধীনতাও মানুষের আছে বলে মনে করেন।

(বেলায়েতে মুতলাকা, এপ্রিল-২০০১)

অথচ আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পূর্বেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্মালম্বী হওয়ার আবশ্যকতা বলাই বাহুল্য।

(২) বিশেষ পর্যায়ে শরী'আতের বিধান শিথিল হয়ে যায়। যেমন : বেলায়েতে মুতলাকা গ্রন্থে আছে, "শরী'অত নাছুস বা দৃশমান জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এ স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য।"

বেলায়েতে মুতলাকা, এপ্রিল ২০০১ ইং

মোটকথা, বিশেষ পর্যায়ে কামেল লোকদের জন্য নামায-রোযা ইত্যাদির হুকুম শিথিল হয়ে যায়। ফলে অনেক ভাণ্ডারীই বাতেনী নামাযের ধূয়া তুলে ফরয নামায ছেড়ে দেন। অধিকন্তু তাদের এ সব অলীক দাবির আলোকে শরী'অত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মতাদর্শও সুস্পষ্ট অনুমেয়। অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য শরী'অত; কামেল লোকদের জন্য নয়। কেননা শরী'আতের অনেক জরুরি বিষয়ও তরীকতে জরুরি নয়।

অথচ শরী'অত-তরীকত আদৌ কোনো ভিন্ন জিনিস নয় বরং তরীকাতের জন্য শরী'অত অপরিহার্য। এমনকি শরী'অত ছাড়া তরীকত অসম্ভব ব্যাপার। শরী'অত পালানের মাধমেই তারীকতের উচ্চস্তরে পৌঁছা যেতে পারে। এ ছাড়া তরীকত অর্জনের দাবি বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। আর ইবাদত-বন্দেগীর অপরিহার্যতা নিয়ে পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) তাদের ভাষ্য থেকে আরও বুঝা যায়, পীরের মধ্যে আল্লাহর সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাদের পীর আল্লাহর প্রকাশ বা অবতার। এমনকি স্বয়ং খোদা। আরও বুঝা যায়, আল্লাহ আহাদ আর মাইজভাণ্ডারী আহমদ। এখানে কেবল একটি মীমের পার্থক্য। নতুবা আল্লাহ ও মাইজভাণ্ডারীর মাঝে কোনও ফারাক নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

(৪) হায়াত-মউতের ব্যাপারে পীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আছে। যেমন : জনৈক মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে কথিত আছে, সে রোগের অতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে পড়লে দেখেতে পায়, আজরাইল তার বুকে চড়ে গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হয়েছে। তখন তার পীর ভাণ্ডারী সাহেব সেখানে হাজির হয়ে তার ছুরি ছিনিয়ে নেন এবং তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন।

(মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত, জুলাই-২০০২ খ্রি.)

বস্তুত এরা সর্বেশ্বেরবাদের আশ্রয় নিয়ে পীরকে খোদায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইতঃপূর্বেও বলেছি, এ ধরনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা কুফরী করছে। তাদেরকে কাফির বলাই যথার্থ।

(৫) ভাণ্ডারীদের মতে তাদের পীর পরকালে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করবেন। মৃত্যুযন্ত্রণা দূরীভূত করবেন। কবরে-হাশরে আরামের ব্যবস্থা করবেন। আমলে ত্রুটি থাকলে উদ্ধার করবেন। অথচ এ সব নিতান্তই অজ্ঞতা ও গোমরাহী। ইতঃপূর্বে আটরশীর আকীদা প্রসঙ্গে এগুলোর জবাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) তাদের মতে গান-বাদ্য জায়েয। এ প্রসঙ্গে পূর্বে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। মোটকথা, মাইজভাণ্ডারী ও তার ভক্তবৃন্দরা অবলীলায় নানা ধরনের গোমরাহী প্রসারিত করে যাচ্ছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

রেজবী বা রেজাখানী মতবাদ

রেজবী বা রেজখানী বলতে আহমদ রেজাখানা বেরেলবীর অনুসারীদেরকে বুঝায়। তিনি বেরেলবী নামেও পরিচিতি। ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে বেরেলীতে তার জন্ম হয়। প্রকৃত নাম মুহাম্মদ, ওরফে আহমদ রেজা আর স্বঘোষিত নাম আব্দুল মুস্তফা। কিন্তু তার ভক্ত-অনুচররা তাকে "আলা হযরত" নামে স্মরণ করে। পিতার নাম নাকী আলী। দাদার নাম রেজা আলী। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাইয়ের কাছে। রুক্ষ ও উগ্র মেজাজের এ লোকটির কলম ছিল খুবই ক্ষুরধার। গালি প্রদানে অত্যন্ত বে-পরোয়া ও পারঙ্গম। আজীবন নদোয়া ও দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে লেগেছিলেন। তাদেরকে কাফির ফাত্ওয়া দেওয়াই ছিল তার জীবনসাধনা। এতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এমনকি হযরত কাসিম নানুতবী রহ., রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. প্রমুখ মহান বুযুর্গ সম্পর্কে বিদ্বেষের আতিশয্যে বলেন- এরা এমন কাফির, যে তাদের কাফির হওয়াতে সন্দেহ করবে তারাও নিশ্চিত কাফির ও জাহান্নামী।

পারিবারিক স্বচ্ছলতা হেতু নিজস্ব বই-পুস্তক প্রকাশে তাকে ভাবতে হত না। মক্কা-মদিনা পর্যন্ত তার ধৃষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার লোকেরা উর্দূ জানত না। তথাপি সেখানকার লোকদেরকে তা পড়িয়ে নিজের মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করায় এবং পূর্বোক্ত মনীষীদের বিরুদ্ধে লিখিত জাল ফাত্ওয়ায় তাদেরকে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এরপর উর্দূ ভাষায় দেশব্যাপী প্রচার করে।

তত দিন পর্যন্ত এদশের উলামায়ে কিরাম তার ফাত্ওয়ায় কর্ণপাত করতেন না। কিন্তু ১৩২৫ হিজরীর এ ঘটনায় তারা ভাবনায় পড়ে যান এবং অনেক ফিৎনায় জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য রেজা খান দেশে ফেরার পর হারামাইনের উক্ত ফাত্ওয়ায় স্বাক্ষরকারী কতিপয় আলেম রেজাখানের প্রতারণার কথা জেনে যান। ফলে তারা বিভ্রান্তিকর ২৬টি ব্যাপারে দেওবন্দী ওলামায়ে কিরামের আকীদা জানার জন্য পত্র প্রেরণ করেন।

এর জবাব লিখে পাঠান হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.। উক্ত জবাবে হারামাইনের উলামায়ে কিরাম নিশ্চিত হন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামামতের আকীদা-বিশ্বাস তদনুরূপ। বিস্তারিত জানার জন্য اَلْمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدِ المعروف بالتصديقات لدفع التلبيسات। দেখা যেতে পারে। রোজা খানের লিখিত حسام الحرمين নামে খ্যাত উক্ত ফাত্ওয়া গ্রন্থের বিস্তারিত জবাবে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. اَلشِّهَابُ الثَّاقِبُ রচনা করেন। মুর্তজা হাসান সাহেবের اَلسَّحَابُ الْمِدْرَارُ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা এসেছে। কিন্তু রেজা খান ও তার অনুচরদের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা থেমে থাকে নি। এখনও রয়েছে।

দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের ব্যাপারে তার এসব আপত্তি এবং বাড়াবাড়ি সম্পর্কে عقائد علماء ديوبند কিতাবটিও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে স্ববিস্তর আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু কেন রেজা খান এসব করলেন, এর রহস্য আল্লাহ্ মালুম। তবে তার পেছনে ইংরেজদের যোগ-সাজশ ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। তার কারণ কয়েকটি।

(১) রেজা খানের শিক্ষক ছিল গেলাম কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের। আর কাদিয়ানী ছিল ইংরেজদের সেবাদাস ও তল্পিবাহক। সুতরাং দু'জনই এক পরিবারের হওয়ায় তাদের মধ্যে যোগসূত্র থাকাটাই স্বাভাবিক।

(২) ভারত বর্ষে ইংরেজ দখলদারিত্বের একপর্যায়ে শাহ আব্দুল আযীয রহ. ভারতকে "দারুল হরব" ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম একাত্বতা ঘোষণা করে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অথচ তথাকথিত রেজাখান সে সময় ভারতকে দারূল ইসলাম ফাত্ওয়া দেন। বলেন, আইম্মায়ে ছালাছার মতে আমাদের দেশ দারুল হরব নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, একদিকে ইংরেজ আধিপত্যবাদীদের চরম বিরোধী উলামায়ে কিরামকে তিনি কাফির আখ্যা দিয়েছেন, অপরদিকে ইংরেজ সরকার যখন মুসলমান ও দ্বীন-ইসলামের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়ার অব্যাহত চেষ্টা করছে। তখন তিনি স্বদেশকে দারুল ইসলাম বলছেন। এখানে কিভাবে যোগসূত্র নেই বলা যয়?

(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিন্দুস্তানে খেলাফত আন্দোলন চলাকালে সর্বস্তরের উলামায়ে কিরাম একশিবিরে এসে দাঁড়ান। অথচ তখন তিনি ইসলামের পবিত্র ভূমি রক্ষায় এগিয়ে আসেন নি বরং উলামায়ে কিরামকে গান্ধি ফিরকা নামে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৩৪০ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। কিন্তু তার মিশন থেমে থাকে নি। মৌলভী

নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, মৌলভী আমজাদ আলী আজমগড়ি প্রমুখ তার মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেন। আজও সে ধারা অব্যাহত। এ রেজভী গ্রুপের কাজ প্রধানত দুটি।

(ক) নবীগণ ও অলী-আল্লাহদের প্রতি অতি ভক্তি। (খ) এরা বিভিন্ন ধরনের রসম-রেওয়াজ ও বিদ'আত-কুসংস্কারগুলোকে যঈফ বা দুর্বল, এমনকি জাল-মওজু হাদীসের আশ্রয় নিয়ে জায়েয সাব্যস্ত করে। অধিকন্তু প্রতিপক্ষ উলামায়ে কিরামকে কথায় কথায় গালিগালাজ করে; কাফির বলে। তার এ লাগামহীনতার কারণে তাকে "তাকফীর পার্টি" বললেও অত্যুক্তি হবে না।

আমাদের দেশের রেজভী নামে পরিচিত গ্রুপটির অবস্থাও তাই। আহমদ রেজাখানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তারাও মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ওহাবী-সুন্নীর বিবেধ সৃষ্টি করে, আমাদের হক্কানী উলামায়ে কিরামকে কথায় কথায় কাফির বলে। এামনকি তাদের ভাষ্যমতে ওহাবী সম্প্রদায় ও তাবলীগ জামাতের সঙ্গে উঠা-বসা খাওয়া-দাওয়াত, লেন-দেন, আচার-অনুষ্ঠান, বিয়ে-শাদী, সমাজে থাকা, তাদেরকে সাহায্য করা, সালাম দেওয়া, সম্মান করা, মুসাফাহা করা, তাদের পিছনে নামায পড়া, তাদের সাথে সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কোনো আচার-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া শক্ত গুনাহ; কুফরী। এমনকি যেসব সুন্নী মুসলমান না বুঝে তাবলীগ জামাতভুক্ত হয়েছেন, তাদের জন্য তাবলীগ জামাত ছেড়ে তওবা করা ফরয।

(বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের ইহিতাস– মাওঃ আকবর আলী)

তাদের মতে ওহাবী তাবলীগীদের আকীদা নিম্নরূপ

(১) আল্লাহ মিথ্য বলেছেন। (ফাত্ওয়ায়ে রশীদ আহমদ গঙ্গুহী।)

(২) নবীজীর ইলম থেকে শয়তানের ইলম বেশি। (বারাহিনে কাতিয়া)

অথচ এসব অভিযোগ কেবল অলীক-ভিত্তীহীনই নয় বরং হকপন্থী উলামায়ে কিরামের প্রতি তার বিদ্বেষ, তার গোমরাহী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রকারীদের ও এজেন্ট এবং তল্পিবাহক হওয়ার বহিঃপ্রকাশও বটে।

বে-শরা পীর-ফকীর ও তাদের আকীদা

যেসব লোক নিজেদেরকে পীর-ফকীর-দরবেশ বলে দাবি করে, অথচ নামায পড়ে না, নাচ-গান করে, তারী-গাঁজা-মদ ইত্যাদি সেবন করে, পর্দার বিধান মানে না, যিকিরের আসর নামে নারী-পুরুষ অবাধে মাখামাখি ও যৌনাচারে লিপ্ত, কেউ কেউ মাথায় জট রাখে, উলঙ্গ থাকে, রংবেরংয়ের ছিঁড়েফাঁড়া শত তালিযুক্ত কাপড় পড়ে কিম্ভূৎকিমাকার হয়ে থাকে ইত্যাদি। এ ধরনের বাতিল

পন্থায় যারা নিজের বুযুর্গি যাহির করতে চায়, বে-শরা পীর বলতে তাদেরকেই বুঝায়। এদের মধ্যে শরী'অত বিরোধী আকীদা-বিশ্বাসের অন্ত নেই।

সেগুলোর কয়েকটি আকীদা নিম্নরূপ :

(১) শরী'অত ও মারিফাত এক নয়। শরী'অত যাহেরী বিধি-বিধান আর মারিফাত বাতেনী বিধি-বিধান। শরী'অতে যা নাজায়েয, মারেফাতে তা জায়েয। তাদের দাবি মতে তারা বাতেনী শরী'অতের উপর আমল করে।

জবাব : এরা দুটি শরী'অত দাঁড় করালেও কুরআন-হাদীসে এর কোনো প্রমাণ নেই। অধিকন্তু শরী'অত থেকে তরীকত পৃথক করে নিলে প্রকারান্তরে শরী'অতকে রহিত করা হয়। এ জাতীয় লোকদেরকে যিন্দিক ও মুলহিদ বলা হয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম কুরতুবী রহ. এর প্রদত্ত ব্যাখ্যায় তাই ফুটে উঠে।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, কুরতবী : ১১/২৮–২৯ ও ফাতহুল বারী : ১/২৬৭)

(২) এদের কেউ কেউ বাতেনী নামাযের প্রবক্তা। অথচ এটা ইসলাম বিরোধী সম্পূর্ণ কুফরী কথা। এ জাতীয় আকীদায় বিশ্বাসী লোক যিন্দিক ও কাফির। কারণ, শরী'অতে শারীরিক নামাযের কথা আছে; কালবী নামায নয়। রাসূল ﷺ শারীরিক নামাযই দেখিয়ে গেছেন। এ জগতে রাসূল ﷺ অপেক্ষা ঊর্ধ্বে আর কে আছে?

(৩) কলব ঠিক তো সব ঠিক। তাদের অনেকেই বলে, "মনের পর্দা বড় পর্দা, বাইরের পর্দা উঠিয়ে দে।" আরও বলে, কলব ঠিক থাকলে, ইয়াকীন অর্জন হয়ে গেলে আর যাহেরী ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন নেই।

জবাব : ইতঃপূর্বে সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারী পীরের আকীদা প্রসঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের আকীদাও এমনই ছিল।

(৪) কুরআনের ৩০ পারা যাহির আর ১০ পারা বাতিন। এ বাতেনী ১০ পারা বাতেনী পীর-ফকীরের সীনায় সীনায় চলে আসছে। কেউ কেউ বলে, মিরাজে রাসূলে কারীম ﷺ ৯০ হাজার কালাম লাভ করেছিলেন। তার ৩০ হাজার কালাম পেয়েছে আলেমরা আর ৬০ হাজার আছে এসব সূফী-ফকীরদের কাছে। তারা এসব সীনা বা-সীনা পেয়েছে।

জবাব : ফকীররা এসব ইলম কিভাবে পেল? কে কাকে কখন কিভাবে শিক্ষা দিল? এর সনদ কি? সনদ ছাড়া দ্বীনের কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তারা কখনও সনদ পেশ করতে পারবে না। অথচ ইবনে মুবারক রহ.(মুসলিম– ভূমিকায়) বলেন,

اَلْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ لَوْلاَ الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَاشَاءَ

বস্তুত এ চিন্তাধারা শী'আদের থেকে উদ্ভূত। মুনাফিক ধূর্ত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা'র সফল চাতুর্য। সে তাদের মধ্যে প্রচার করেছিল, নবীজী আহলে বাইত বিশেষত হযরত আলী রাযি. বেশ কিছু গোপন তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা অপর কেউ জানে না। এরই সুবাদে সে নিজের মনগড়া তথ্যাবলি বাজারজাত করে। ফলে ধ্বংস হয়ে যায় উম্মতের বিরাট এক জনগোষ্ঠী। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاأُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (انعام)

বিদায় হজ্বের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে নবীজী বলেছেন,

اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟

তিনবার একই প্রশ্নের জবাবে সমবেত সাহাবাগণ একবাক্যে বললেন, হ্যাঁ! এরপর নবীজি বললেন,

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ!

(৫) যিকিরের আসর নামে তারা পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে। অবাধে নারী-পুরুষে ঢলাঢলি করে। বস্তুত এটি পর্দাকে অস্বীকার করার নামান্তর।
অথচ কুরআনে কারীমে সূরায়ে নূর ৩১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

কাজেই গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষে তাদের এ অবাধ মেলামেশা-ঢলাঢলি সুস্পষ্ট হারাম।

৬) তাদের মতে যে কোন পুরুষ যে কোনো নারীকে ভোগ করতে পারে। এদের কেউ কেউ অবাধ যৌনমিলনকে সিদ্ধি লাভের সহায়ক মনে করে। তাদের মতে পঞ্চরস তথা মলমূত্র, বীর্য, ঋতুর রক্ত ও শ্লেষ্মাই শক্তির আধার। নারী মিলনের পর নিঃসৃত বীর্য সেবনকে তারা রতি সেবন বলে। কেউ কেউ 'লাল সাধন' এবং 'গুটি সাধন'ও বলে। পরস্ত্রী মিলনে তাদের কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করে না। অধিকন্তু বলে অসন্তোষ প্রকাশ না করা আত্মশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ! আরও বলে, নারী বহতা নদীর মতো। ময়লা-আবর্জনা পড়লে নদী যেমন নাপাক হয় না, তদ্রুপ নারীর যোনীতে পরপুরুষের বীর্য-স্খলনে যোনী

নাপাক হয় না। এমনকি তাদের মতে নারীরা গঙ্গাস্বরূপ। তাদের মিলন প্রত্যাশী পুরুষ স্নানপ্রার্থী তীর্থ যাত্রীর মতো। আর গঙ্গা স্নানে তথা যৌনমিলনে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

তদ্রুপ নারী-পুরুষ মিলে নাচ-গান করলে কামরিপু দমন হয়। যেমনি পরস্ত্রী মিলনে হিংসা রিপু দমন হয়। অবাধ যৌনাচারে স্খলিত বীর্য ময়দায় মিলিয়ে রুটি বানিয়ে খায়। এর নাম দিয়েছে প্রেমভাজা। (নাউযুবিল্লাহ)

বস্তুত এসব কথা বলে তারা যেনার বৈধতা দিতে চেয়েছে। অথচ সবই সুস্পষ্ট কুরআন বিরোধী এবং সর্বজনবিদিত হারাম। এ আকীদা রাখা কুফরী।

(৭) তাদের মতে নাচ-গান জায়েয।

অথচ এ ধরনের হারাম কাজ বৈধ মনে করা কুফরী। পূর্বেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

(৮) তাদের মতে খাঁজা খাওয়া জায়েয। কেবল তাই নয়। হায়েয-নেফাস, মলমূত্র-বীর্য ইত্যাদি খেলে তাদের মতে রিপু দমন হয়।

অথচ কুরআনের অকাট্য নছ দ্বারা এসব হারাম বলে প্রামাণিত। সূরা মায়েদা–৯০ আয়াতেও তাই বিবৃত হয়েছে।

(৯) তাদের মতে পীর ফকীরের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ যিনি মুর্শিদ তিনিই খোদা। তাদের গান-কবিতায় এ সবের অহরহ ব্যবহার দেখা যায়।

অথচ এ ধরনের আকীদা নিশ্চিত শিরিক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা কারও সত্তায় মিশ্রিত বা প্রবিষ্ট হয় না। অবশ্য খ্রিষ্টানদের মতে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.) এর সত্ত্বায়, হিন্দুদের মতে ইশ্বর মানুষপ্রাণী সব কিছুর মধ্যেই প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এ সব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদা। পূর্বেও এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(১০) এমনকি তারা পীর-ফকীরকে খোদার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। যেমন : তারা বলে, খোদার ধন রাসূলকে দিয়া খোদা গেলেন খালি হইয়া; রাসূলের ধন খাজাকে দিয়া, রাসূল গেলেন খালি হইয়া, ইত্যাদি।

অথচ এগুলো যে কুফরী আকীদা, তার প্রমাণ পেশ করার অপেক্ষা রাখে না। এ ছাড়াও এরা পীর বা পীরের কবরে সিজদা দেওয়া, মেয়েদের থেকে খেদমত নেওয়া, যিকিরের নামে মেয়ে নিয়ে ঢলাঢলি করাসহ বহু কুফরী আকীদা ও কাজে অভ্যস্ত।

সমাপ্ত

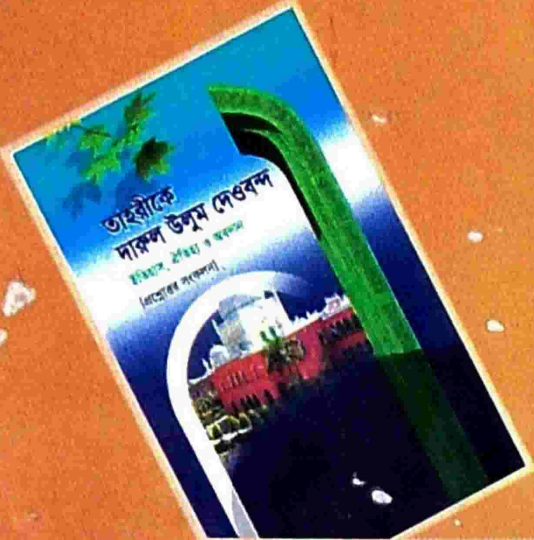

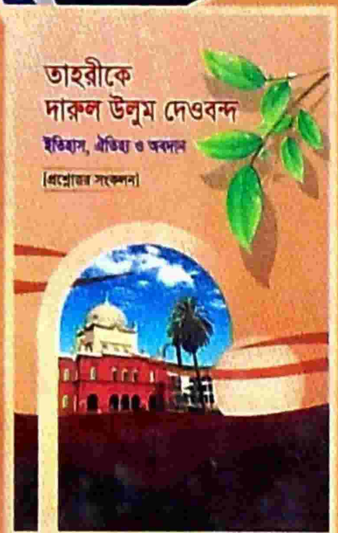

আল-কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www. alkawsar.org